দেবতারা কবে পৃথিবীতে এসেছিলেন

মানুষের লুপ্ত ইতিহাস সন্ধানে—
দানিকেন তত্ত্বের আলোকে পুরাণ বিশ্লেষণ

নিরঞ্জন সিংহ

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শ্রদ্ধেয় শ্রীঅজিত দত্ত,

দানিকেন রিসার্চ সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার সভাপতি মহাশয়কে-

কৃতজ্ঞতা ও ভূমিকা

দানিকেন তত্ত্বের আলোকে ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত বিশ্লেষণ করে রচিত আমার প্রথম গ্রন্থ 'রামায়ণ মহাভারতের দেব-গন্ধর্বরা কি ভিন-গ্রহবাসী ?'[১] প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবান্ধব, পাঠকসমাজ ও বিদগ্ধ সমালোচকরা যেভাবে আমাকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাতে আমি মুগ্ধ। সকলকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আমাদের প্রধান লক্ষ হল মানব-ইতিহাসের লুপ্ত-অধ্যায়গুলিকে আবিষ্কার করা। বর্তমান গ্রন্থ রচনাকালে তাই আমাকে যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসু ও আরো বেশী সতর্ক হতে হয়েছে। আমার প্রথম গ্রন্থে বহু তথ্যের সাহায্যে একথা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি যে ভারতীয় দেবতা ও দেবজনরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নত ভিনগ্রহবাসী নভশ্চর। বর্তমান গ্রন্থে প্রমান করতে চেয়েছি যে ভিনগ্রহবাসী নভশ্চর দেবতারা কোন এক সময়ে পৃথিবীর একটি বিশেষ ভূখণ্ডে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। তারপর বিশেষ একটি কারণে তাঁরা সেই মূল উপনিবেশ ছেড়ে ছড়িয়ে পড়েছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। পৃথিবীর বিস্ময়কর প্রাচীন সভ্যতাগুলি গড়ে তুলেছিলেন তাঁরাই। ভারতীয় দেবতাদের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করতে পারলেই পৃথিবীর প্রাচীন মানব-ইতিহাস আবিষ্কার করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি। এ গ্রন্থ সেই ইতিহাস উদ্ধারের ইতিহাস।

দেবতারা যে ভিনগ্রহবাসী নভশ্চর এ কথা আজ প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন পৃথিবীর বহু বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান-লেখক ও বিদ্বজ্জন। এরিখ ফন দানিকেনের নাম তো আজ বিশ্ববিখ্যাত। এছাড়া রয়েছেন রাশিয়ার এম আগরেস্ট, আলেকজাণ্ডার কজ্রাভভ, ইটালীর পিটার কলোসিমো, আমেরিকার যোশেফ ব্লুমরিখ, ফ্রান্সের রবার্ট চ্যারুক্স, অস্ট্রেলীয়ার অ্যানড্রু টমাস ও আরো বহুদেশের বহু লেখক। ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ বাংলা ভাষাতেই এই তত্ত্ব নিয়ে কাজ হয়েছে। শ্রদ্ধেয় অজিত দত্ত মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রমে ও বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে একের পর এক দানিকেনের গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করে বাঙালী পাঠক-লেখকের চিন্তাধারার মধ্যে আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছেন। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র সমূহগুলিকে ভিন্নদৃষ্টিকোন থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছি মুখ্যতঃ এই অনুদিত গ্রন্থগুলি থেকেই। একাজে আরো অনেকে এগিয়ে এসেছেন। বাংলাভাষায় আমাদের কাজ সম্পর্কে পাঠকরা

১। এখন থেকে এই গ্রন্থটিকে আমার প্রথম গ্রন্থ বলে উল্লেখ করব।

যেমন আগ্রহী, বিদগ্ধ সমালোচকরাও তেমনি আশাবাদী। এটা খুবই সুখের বিষয়। একটি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে দানিকেনের বাংলায় অনূদিত 'প্রমান' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সমালোচক মন্তব্য করেছেন, 'কিছু কিছু বাঙ্গালী লেখক দানিকেন তত্ত্ব অনুযায়ী ভারতীয় মহাকাব্যের বিশ্লেষণ করেছেন এবং করছেন। বাংলা ভাষায় দানিকেন-আন্দোলন চিন্তাশীল রচনার ক্ষেত্রে যে নতুন বাতায়ন খুলে দিয়েছে, তাতে ভাবনার ক্ষেত্রে আলো-বাতাসের সম্ভাবনা জাগছে

এই প্রসঙ্গে পাঠকদের জানাই, ভারতের মধ্যে প্রথম এই পশ্চিমবাংলায় গুণী ও বিদগ্ধজনরা মিলে গড়ে তুলেছেন 'দানিকেন রিসার্চ সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া', যার ঠিকানা পোস্ট বক্স ৬৬০২, কলকাতা-৬৯। যেকোন আগ্রহী পাঠক এই সোসাইটির সভ্য হতে পারেন।

বর্তমান গ্রন্থের কিছু কিছু নির্বাচিত অংশ 'পরিবর্তন' পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য পত্রিকার প্রাক্তন সংযুক্ত সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীধীরেন দেবনাথের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ শ্রীচণ্ডী সেনগুপ্ত ও শ্রী তপোব্রত ভট্টাচার্যের কাছে যাঁরা বহু প্রয়োজনীয় গ্রন্থ জোগাড় করে দিয়েছেন। টোডা পুরোহিত ও টোডাদের বাড়ির ছবি তুলে এনে দিয়েছেন অধ্যাপক কৃপানন্দ রুদ্র, কৃতজ্ঞ আমি তাঁর কাছে। বইটির প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে তরুণ প্রকাশক বন্ধু শ্রীসহদেব সাহা আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া এ গ্রন্থ রচনাকালে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাঁরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের, সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

এ গ্রন্থও তুলে দিচ্ছি পাঠক সাধারণের হাতে। তাঁদের কৌতূহল কিছুটা নিরসন করতে পারলেই আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

কোন এক সুদূর অতীতকালে একদল ভিনগ্রহবাসী নভশ্চরেরা তাঁদের উন্নত মহাকাশযানে করে আমাদের পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন। তখন পৃথিবীতে বহু কোটি বৎসরের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে উদ্ভব হয়েছে নরাকার বানরের। এই বুদ্ধিহীন নর-বানরদের কৃত্রিম পরিব্যক্তি বা আরটিফিসিয়াল মিউটেশানের মাধ্যমে বুদ্ধিমান মানুষে (Homo Sapiens) পরিবর্তিত করেছিলেন তাঁরা।…

এই অভিনব মতবাদটি আজ সারা বিশ্বের বিদগ্ধ মানুষের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। এই মতবাদের প্রবক্তা হচ্ছেন এরিক ফন দানিকেন। নামটি আজ বহু বিতর্কিত অথচ বিশ্ববিখ্যাত। দানিকেনের জন্ম ১৯৩৫ সালের ১৪ এপ্রিল, সুইজারল্যাণ্ডের ৎসোফিঙ্গন-এ। ১৯৬৮ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ Chariots of the Gods'? প্রথমে প্রকাশিত হল জার্মাণ ভাষায়, তার পরবর্তী বছরে হল এর ইংরেজি অনুবাদ; তারও পরবর্তী বছরে বেরুলো এর বাংলা অনুবাদ 'দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ?' এই নামে।

এই একখানি গ্রন্থ দ্রুত প্রচারের ফলে সারা পৃথিবীতে বিতর্কের ঝড় তুলল।

পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব তথা মানুষের জন্ম রহস্য ব্যাখ্যাত হচ্ছে বিবর্তনবাদের মাধ্যমে। উনবিংশ শতাব্দীতে চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) এই বিবর্তনবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছিলেন বুদ্ধিমান মানুষের জন্মকথা। এই বিবর্তনবাদকে বহু ঝড়ঝাপ্টা সহ্য করতে হয়েছে। নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে এই তত্ত্ব পরিমার্জিত ও সংশোধিত হয়েছে বটে তবে পরিত্যক্ত তো হয়ইনি বরং তার ভিত্তি আজও যথেষ্ট শক্ত। এই তত্ত্ব বলে, বহু কোটি বছর ধরে এককোষী জীব বর্তমানের জটিল মানবে পরিবর্তিত হয়েছে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে আজ একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে অজৈব পদার্থ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে জৈবপদার্থের—যার সাহায্যে জন্মলাভ করেছে প্রাণ।

তবু লক্ষ করা যায় যে, এই বিবর্তনবাদের মধ্যেও যেন কিছু কিছু যুক্তির ও প্রমাণের ফাঁক রয়ে গেছে। বানর থেকেই যে বুদ্ধিমান মানুষ জন্ম নিয়েছে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তেমন কোন জোরালো প্রমাণ কিন্তু বিবর্তনবাদীদের হাতে নেই। আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ বলে কথিত ক্রো-ম্যাগনন মানুষেরা, তাদের পূর্ববর্তী নিয়ানডারথালদের বিবর্তিত রূপ বলে অনেক বৈজ্ঞানিকই মনে করেন না। এই

ক্রো-ম্যাগননরা যেন নিয়ানডারথালদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানব গোষ্ঠি। এরা বিরাট মগজ ও উন্নত বুদ্ধি নিয়ে হঠাৎই যেন পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে এরকম হঠাৎ কিছুতো ঘটে না। তাহলে মানুষের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে এরকম হল কেন? বিবর্তনবাদীরা সঠিক যুক্তি ও তথ্য তুলে ধরতে পারলেন না এ প্রশ্নের জবাবে। তাঁরা বললেন এগুলো হল 'মিসিং লিঙ্ক'। এক্ষুণি এর আর কোন ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

দানিকেন ঠিক এই মোক্ষম জায়গাটিতে আঘাত হানলেন তাঁর মতবাতকে খাড়া করার জন্য। অবশ্য দানিকেনের পূর্বেও বহু বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদীদের এই দুর্বল জায়গাটিতে আঘাত দিয়েছেন সত্য; কিন্তু তাঁরা বিকল্প কোন জোরালো তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হননি। পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপক লোরেন আইসলী লিখেছেন, লক্ষ লক্ষ বৎসরের পুরনো পশু জীবনের খোলস ছেড়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসেছে নুষ। কিন্তু তার বিবর্তনের ধারায় একটা ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। যেদিক থেকেই দেখি, সেদিক থেকেই মনে হয়, মানুষের মাস্তিষ্কের একটা দ্রুত উন্নতি হয়েছিল কোন এক সময়ে, আর সেদিন থেকেই সে তার চিরকালের জ্ঞাতিভাইদের ছেড়ে মাথা দাঁড়িয়েছিল পৃথক সত্তায়।

দানিকেন বললেন, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে যে ক্রমবিকাশ ঘটেছে তারই মাঝে মানুষের বুদ্ধির উদয় হয়েছে যেন রাতারাতি, হঠাৎ। বনমানুষ থাকতে থাকতেই, যাকে মানব সংস্কৃতি বলি, আমাদের পূর্বপুরুষরা তার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন আশ্চর্য-রকম তাড়াতাড়ি। কিন্তু সে ঘটনাকে সম্ভব করতে বুদ্ধির আমদানীও হয়েছিল নিশ্চয়ই হঠাৎ। স্বাভাবিক বিবর্তনের পথ বেয়ে বনমানুষে এসে পোঁছতে জীবের লেগেছে লক্ষ লক্ষ বছর, কিন্তু তার পরেই সেই নরাকার বানরের উন্নতি ঘটতে লাগলো বিদ্যুৎগতিতে। তাই দানিকেন প্রশ্ন তুললেন, 'কিন্তু আদিম মানুষ তার সম্প্রদায়ের ভেতর কবে চালু করেছিল নৈতিক মান, সেই কথাটাই আমার প্রধান জিজ্ঞাসা। কর্তব্য, প্রেম, প্রীতি, সৌহার্দ ইত্যাদি হৃদয়বৃত্তি কিসের প্রভাবে আদিম মানুষ শিখেছিল? কে সঞ্চার করলো তার মনে ভক্তিভাব? যৌনমিলনে লজ্জা সে কেন পেলে? কে ঢোকালো তার মনে লজ্জা? বর্বর পশু হঠাৎ কেন তার দেহে আবরিত করলো তারই বা ভালো ব্যাখ্যা কোথায়? শুনি হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনেই নাকি প্রয়োজন হয়েছিল দেহাবরণের। আরো শুনি নরাকার পশুদের নাকি শখ হয়েছিল গয়না পরার। এ ব্যাখ্যা সত্যি হলে, অরণ্যচর গরিলা, ওরাং ওটাং শিম্পাজীরাও ধীরে ধীরে কাপড় পরতে শুরু করতো, গয়না পরত। পশুজীবন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন সে শুরু করল মৃতদেহ কবর দিতে?'

দানিকেনের প্রশ্ন, 'কবে কেমন করে আর কেনই বা মানুষ বুদ্ধিমান হল?'

শুধু তাই নয়, পৃথিবীর প্রাচীন যুগের গ্রন্থকাররা বাস করতেন ভিন্ন দেশে, তাদের সভ্যতা, কৃষ্টি ও ধর্ম ছিল ভিন্ন। সে যুগে নাকি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাতায়াত করা খুব সহজ ছিল না, তবু বাইবেল, মহাভারত, রামায়ণ, গিলগামেশের কাব্য, এস্কিমোদের গ্রন্থ, রেড-ইনডিয়ান, স্ক্যানডানেভিয়ান, তিব্বত-এর প্রাচীন গ্রন্থসমূহে ও অন্যান্য বহু সূত্র থেকে উড়ন্ত দেবতা ও তাদের বিমানের খবর পাওয়া যায়। কি করে সম্ভব হল এ রকম ব্যাপার ?

পৃথিবীর বিস্ময়কর সভ্যতাগুলির মধ্যে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম মিল রয়েছে। কেন ?

বিস্ময়কর পুরাবস্তুগুলি যেমন মিশরের ও মায়াদের পিরামিড, ইস্টার দ্বীপের বিশাল বিশাল অদ্ভুত মানবমূর্তি, টিয়াহুয়ানকার বিশাল সূর্যতোরণ, পেরুর নাজকার বিস্তৃত সমতলভূমি জুড়ে অদ্ভুত সব চিহ্ন এসব কারা কি উদ্দেশ্যে তৈরি করেছিল তার তো কোন সঠিক ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারেননি।

আরো আছে। ১৯৫৯ সালে ডঃ চৌ মিঙ্‌চেন গোবি মরুভূমিতে পাওয়া একটা বেলে পাথরের উপর আবিষ্কার করেছেন খাঁজকাটা জুতোর ছাপ। এই বেলে পাথরের উপরেই পাওয়া গেছে ডাইনোসরদের পায়ের ছাপ। ডাইনোসররা তো পৃথিবীতে বাস করত কয়েক কোটি বছর আগে। তখন তো মানুষের জন্মই হয়নি এই পৃথিবীতে। তাহলে মানুষ ও ডাইনোসরের পায়ের ছাপ একই বেলে পাথরের স্তরে থাকে কি করে ?

আমেরিকার গ্রেনরোজের কাছে পালুকসি নদীর বুকে পাওয়া গেছে একই স্তরে ডাইনোসর ও মানুষের পায়ের ছাপ।

ফ্রানসের অধ্যাপক ডেনিস সাউরাট দক্ষিণ আমেরিকার টিয়াহুয়ানকার ক্যালেনডারে আঁকা জীবজন্তুর ছবির মধ্যে টেকসোডন নামে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর ছবি অবিষ্কার করেছেন। বহু লক্ষ বছর আগে টেকসোডনের অস্তিত্ব ছিল পৃথিবীতে। প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া সে ছবি কে আঁকল ?

আমেরিকার লেখক ও প্রত্নতাত্ত্বিক এ হাইআট ভেরিল পানামায় পাওয়া চীনা মাটির জিনিসপত্রের গায়ে উড়ন্ত টিকটিকির আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতে এই টিকটিকিটা দেখতে টেরাডাকটিল এর মতো। এই প্রাণীটিও প্রাগৈতিহাসিক যুগের। মানুষের আবির্ভাবের বহু বহু বছর আগে যারা পৃথিবীতে বাস করত।

১৯২৪ সালে ডোহেনি বৈজ্ঞানিক অভিযানের ফলে উত্তর আরিজোনার হাভা সুপাই গিরিখাতে একটি শিলাচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এই শিলাচিত্রে আঁকা আছে প্রাগৈতিহাসিক টিরানোসারাসের ছবি। এই প্রাণীর বাস ছিল পৃথিবীতে মানুষ আবির্ভাবের বহু বহু বছর আগে।

এইসব অব্যাখ্যাত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে দানিকেন হাজির করেছেন তাঁর এই অভিনব তত্ত্ব।

দানিকেন কলকাতার এক সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়

বলেছিলেন, 'আমার প্রথম বইটা যখন বেরিয়েছিল—চ্যারিয়টস অভ দি গডস—তখন খৃস্টানরা আমাকে গালাগালি করেছিলেন, বিজ্ঞানীরা আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ যাবৎ আমি পাঁচখানা বই লিখেছি—চ্যারিয়টস অভ দি গডস, রিটার্ন টু দি স্টার্স, গোল্ড অভ দি গডস, ইন সার্চ অভ এনসেনট গডস এবং মিরাকলস অভ দি গডস। সারা পৃথিবীতে আমি দু'শরও বেশি বক্তৃতা দিয়েছি। এখন অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। লোকে আর আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে না। আমেরিকার হান্টসভিলে ন্যাশনাল এ্যারোনটিকস অ্যানড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেসনের সিস্টেমস লে-আউট ব্রাঞ্চের চীফ যোসেফ ব্লুমরিখ। তাঁর কাজ হচ্ছে রকেট, মহাকাশযান, স্কাইল্যাব ইত্যাদির ডিজাইন করা। তিনিও প্রথমে আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার 'চ্যারিয়টস অভ দি গডস' পড়ে পরে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। এজেকিয়েলের বর্ণনা অনুযায়ী বাইবেলের সেই মহাকাশযানের একটি ডিজাইনও করেছিলেন তিনি এবং দেখেছিলেন ঐ রকম মহাকাশযান সম্পূর্ণ সম্ভব। কিন্তু তা তৈরি করার মতো জ্ঞান এখনও আমরা অর্জন করতে পারিনি। ব্লুমরিখ আমার কথা সমর্থন করে একটি বইও লিখেছেন—দি স্পেসশিপস অভ এজেকিয়েল। বইটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন অজিত দত্ত। নাম দিয়েছেন—'তখন স্বর্গ খুলিয়া গেল।'

একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন। তা হচ্ছে—দানিকেনের গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার আগেই কিন্তু এ ধরনের চিন্তাভাবনার শুরু হয়েছিল। রুশ পদার্থবিদ ম্যাটেস্ট আগরেস্ট একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে এ ধরনের চিন্তাধারার সূত্রপাত করেন। এছাড়া বহু বিজ্ঞানীও বিচ্ছিন্নভাবে ভিনগ্রহবাসী নভশ্চরদের পৃথিবীতে নেমে আসার সম্ভাবনার কথা বলেছেন। তাই দানিকেন এ ধরনের চিন্তাধারার পথিকৃৎ নন। কিন্তু দানিকেন যেভাবে এই চিন্তাধারাকে সুষ্ঠুভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে তাঁর পাঠকশ্রেণীর হাতে তুলে দিয়েছেন তা বিস্ময়কর। দানিকেনের জন্যেই আজ ভিনগ্রহবাসী নভশ্চরদের পৃথিবীতে নেমে আসার প্রশ্নটি নিয়ে এত আলোচনা ও সমালোচনার ঝড় বয়ে চলেছে।

দানিকেনের অনুসন্ধিৎসাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। তাঁর তত্ত্বের স্বপক্ষে প্রমাণ জোগাড়ের জন্য তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন সারা পৃথিবী। এ কাজে তাঁর হাতে-খড়ি উনিশ বয়সে। কয়েকটা ক্যুনিফর্ম লিপির পাঠোদ্ধারের জন্য ১৯৫৪ সালে ছুটে গিয়েছিলেন সুদূর মিশরে।

তিনি বলেছেন, 'পৌরাণিক দেবতারা আকাশে বিচরণশীল হইলেও কখনই মানব সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। প্রায়শঃই তাঁহারা উর্দ্ধলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীতে আগমন করিতেন এবং মানবার্তি হরণ করিতেন। বৈদিক দেবতার কল্পনা এই প্রকার নহে। তাঁহারা কখনই মানুষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন নাই। তাঁহারা সম্পূর্ণ নির্ব্যক্তিক-উদাসীন-নির্বিশেষ।'

অর্থাৎ বৈদিক দেবতাদের উদ্দেশ্যে মানুষ যজ্ঞ করেছে কিন্তু দেবতারা নির্বিকার থেকেছেন। এর কারণ কিন্তু খুবই স্পষ্ট। বৈদিক দেবতারা অতীন্দ্রিয়—ভৌত দেবতা। মানুষ যখন দিবি আরোহন করে দেবতা হয়ে যজ্ঞভাগী হয়েছেন তখন তাঁর পক্ষে স্বর্গ থেকে নেমে এসে মানুষের আপনজন হয়ে ওঠা আর কি সম্ভব? আসলে বৈদিক দেবতারা রক্তমাংসের মানুষ নন। কিন্তু পৌরাণিক দেবতারা রক্তমাংসের মানুষ। তাই কথায় কথায় তাঁরা বিমানে করে আকাশ থেকে নেমে আসেন, মানুষের দুঃখ মোচন করেন।

বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতাদের সম্বন্ধে বিশদ তথ্য পাওয়া যায় পুরাণে। সুতরাং দেবতত্ত্ব বুঝতে হলে পুরাণের সাহায্য অপরিহার্য। বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে।

'যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজঃ।
ন চেৎ পুরাণং সংবিদ্যান্নৈব স স্যাদ্বিচক্ষণঃ॥
ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি॥' (১৯।২০০)

অর্থাৎ, যাঁর পুরাণের জ্ঞান নেই অথচ যিনি সাঙ্গোপনিষদ চতুর্বেদ জানেন তিনি বিচক্ষণ নন। ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদজ্ঞান সম্পূর্ণ বা বর্ধিত করিতে হয় নচেৎ এরূপ অল্পজ্ঞ ব্যক্তি থেকে বেদ ভীত হন যে ইনি আমাকে প্রহার করবেন।

পুরাণ থেকে বৈদিক দেবতা ইন্দ্র সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়। ইলাবৃতবর্ষের সম্রাটদের সাধারণ উপাধি হচ্ছে ইন্দ্র। এই ইলাবৃতবর্ষেরই নাম স্বর্গ। ইন্দ্র তাই বহু। যাঁরা ইলাবৃতবর্ষের সম্রাট হয়েছেন তাঁরাই ইন্দ্র নামে পরিচিত হয়েছেন। বৃত্র সংহারকারী ইন্দ্রের সময় দেবসভ্যতা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। বলি অসুর হয়েও ইন্দ্র হয়েছিলেন।

অর্থাৎ পুরাণ থেকে আমরা পরিষ্কার ভাবে জানতে পারি যে দিবি আরোহিত ইন্দ্র ভৌত দেবতা হওয়ার আগে রক্তমাংসের মানুষই ছিলেন। তিনি ছিলেন দেব-সম্রাট, স্বর্গের অধিপতি। আর এই দেবগণ ছিলেন মানুষ। এই স্বর্গ কোথায় সে সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করছি।

মনে রাখা দরকার যে পৃথিবীতে যে দেবতা ও দেবজনেরা নেমে এসেছিলেন তাঁদের নেতার উপাধি ছিল মনু। এই মনু ইন্দ্রের প্রতিভূ হিসেবে পৃথিবী শাসন

করতে শুরু করেন। মনুর অধীনে উপনিবেশ স্থাপনকারী দেবতাদের নতুন পরিচয় হল মানব বলে। অর্থাৎ স্বর্গের মানুষরা পরিচিত ছিলেন দেবতা বলে মর্ত বা পৃথিবীতে এসে তাঁরা পরিচিত হলেন মানব বলে। কেন? না তাঁরা মনুর পুত্র তাই মানব। আসলে দেবতারা আমাদেরই মত রক্তমাংসের মানুষ, তবে তাঁরা আমাদের থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন ইত্যাদিতে ছিলেন ঢের ঢের বেশী উন্নত।

স্বর্গের দেবতারা যে মানুষ এ সম্পর্কে আমাদের দেশের পণ্ডিতরা কোন দ্বিধাই পোষণ করেন না। এ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। বর্তমান যুগের সব থেকে শক্তিশালী সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় সমরেশ বসু কৃষ্ণ পুত্র শাম্বকে ঐতিহাসিক চরিত্র বলেছেন। তিনি স্বর্গের দেবতাদের মানুষ বলেই ধরে নিয়েছেন তাঁর সাম্প্রতিক সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস 'শাম্ব'তে।

পূর্বসূরাদের সঙ্গে এতদূর অবধি আমাদের কোনই বিরোধ নেই। বিরোধ বাধছে একটি প্রশ্নে—স্বর্গ কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলছি স্বর্গের অবস্থান এ পৃথিবীতে নয়। স্বর্গ অন্য কোন গ্রহ। সে গ্রহের অবস্থান হয়তো আমাদের সৌর-লোকেই নয়। শ্রদ্ধেয় সমরেশ বসু পরিবর্তন পত্রিকায় (১৮।২।৮১) একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'স্বর্গ মহাশূন্যে বা অন্য গ্রহে—এ ধারণা সত্য নয়। অনেকে, হয়তো দানিকেনের লেখার কথা তুলবেন। আমি ওসব পড়িনি। তবে স্বর্গ কোথায় মোটামুটি তার স্থানও গিরীন্দ্রশেখর বসু নির্ণয় করেছেন। তার প্রমাণ অনুযায়ী হিমালয়ের ওপারে পূর্ব তুর্কীস্থান হচ্ছে স্বর্গ।'

পূর্ব তুর্কীস্থান স্বর্গ এমন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ কিন্তু এখনো পাওয়া যায় নি। এ একটি অনুমান। যাইহোক স্বর্গ যে ভিন্নগ্রহে সে কথা জানার জন্য তো দানিকেনের গ্রন্থ পড়ারও প্রয়োজন নেই। আমাদের পুরাণ কাররা আধুনিক মানুষের মহাকাশ জয় ও দানিকেন তত্ত্বের জন্মের বহু হাজার বছর আগেই এ কথা স্পষ্ট করে বলে গেছেন। তাঁরা ভূলোক থেকে সত্যলোক পর্যন্ত সাতটি লোক ও পনেরোটি গ্রহের কথা বলেছেন; বর্ণনা করেছেন সেখানকার অধিবাসীদের কথা। যাহোক এ সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করব।

দেহধারী ইন্দ্র সম্পর্কে শ্রীগিরীন্দ্র শেখর বসু ও শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র তাঁদের গ্রন্থের প্রচুর মূল্যবান সূত্রের উল্লেখ করেছেন। আমরা এখানে সম্রাট ইন্দ্রের একটি পূর্ণরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

ইন্দ্র কুণ্ডপায়ের প্রপৌত্র শৃঙ্গবৃষের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল সম্ভবতঃ ভদ্রা। অদিতিকেও ইন্দ্র জননী বলা হয়েছে। ইন্দ্র প্রতিভাবান ও বলশালী। তরুণ বয়স থেকেই তিনি দেব সমাজে প্রিয় নেতা রূপে পরিচিত। তিনি বহু বিষয়ে জ্ঞানী ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রিয়দর্শন, তাঁর চোখদুটি ছিল

দানিকেনের এই অদম্য কৌতূহলের কথা বলতে গিয়ে ভিলহেলম রুগার্সডর্ফ 'নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন' গ্রন্থে দানিকেন পরিচিতিতে লিখেছেন,
গ্রীষ্মকালে সোভিয়েত পত্রিকা 'স্পুৎনিক'-এ পড়লেন ব্লাচেসলাভ সাইৎসেবের দুটি প্রবন্ধ, 'হিমালয়ে মহাকাশযান' আর 'মহাকাশযানে দেবদূত'। অমনি মসকো যাবার টিকিট কেটে বসলেন, প্রবন্ধ পড়া শেষ হতে না হতেই। তারপর সেখানে গিয়ে স্টারনবারগ ইনসটিট্যুটের বিজ্ঞান একাডেমির অধ্যক্ষ শকলোভসকির কাছ থেকে তাঁর শত প্রশ্নের জবাব আদায় করে নিয়ে ঘরে ফিরলেন। এমনি তাঁর কৌতূহল।'

ভারতে এসেছেন তিনি দুবার। তাঁর উদ্দেশ্যের কথা তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি,

বাইবেলের ইজেকিয়ল বর্ণিত মহাকাশযানের পরিচালক ইজেকিয়লকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল কয়েকবার। দানিকেন এই মন্দিরটি কোথায় তা খুঁজতে শুরু করলেন। জেরুজালেমের কোন মন্দিরের সঙ্গে বাইবেলে বর্ণিত মন্দির মেলে না। দানিকেনের এক পাঠক এ ব্যাপারে দানিকেনকে সাহায্য করলেন। 'পার্বত্য নানা উপত্যকায় আমি মন্দিরের খোঁজ করতে লাগলুম। ইতিমধ্যে আমার এক জার্মান পাঠক, কারল মায়ারের একখানা চিঠি পেলুম। তিনি লিখেছেন—কাশ্মীর উপত্যকার শ্রীনগরে অনেক মন্দির আছে। আশ্চর্যের কথা, তাদের একটার নাম 'ইহুদি মন্দির'। সে মন্দিরে চারটে তোরণও আছে, সামনে একটা উঠোনও, এছাড়া ইহুদি মন্দিরে আর যা যা থাকার কথা সবই আছে। আমার পাঠক দয়া করে মার্তণ্ডের কাছে, শ্রীনগর থেকে তিরিশ কিলোমিটার তফাতে সে মন্দিরের জমির নকশাও পাঠিয়েছিলেন তাঁর চিঠির ভিতরে। ভাল করে দেখে বুঝলুম, সে মানচিত্রে বস্তু আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে দানিকেন ঠিক করলেন কাশ্মীরে গিয়ে সরজমিনে পরীক্ষা করে 'দেখবেন। তিনি কাশ্মীর গিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। এ পরীক্ষার ফলাফল অবশ্য বিতর্কিত। সে যাইহোক, দানিকেন তাঁর সিদ্ধান্তের প্রমাণ খুঁজতে হামেশা ছুটোছুটি করেছেন এরোপ্লেন ধরতে ; এই ঠিক যেমন আমরা ছুটোছুটি করি ট্রাম-বাস ধরতে।'

আমেরিকায় 'এনসিয়েনট অ্যাসট্রোনট সোসাটি' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'এঁরা প্রতি বৎসর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক আলোচনা সভার আয়োজন করে থাকেন। এই সভাগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে দানিকেনতত্ত্বের অনুকূলে আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে যথার্থ মূল্যায়ন

কথা। এঁদের ষষ্ঠ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে পশ্চিম জার্মানির মিউনিখে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে কুড়িজন বক্তা ও সদস্যরূপে আরও প্রায় চারশো জন যোগদান করেন। এই সভায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীদিলীপকুমার কাঞ্জিলাল। এই সম্মেলনের শেষদিনে দানিকেন তাঁর সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগারের প্রসঙ্গে বলেন যে এই গ্রন্থাগারে ৩১.০০০ গ্রন্থ ও গবেষণা পত্রিকা এবং ৮০,০০০-এর কাছাকাছি চিঠিপত্র ও সংবাদপত্র সংগ্রহ আছে।

দানিকেন তত্ত্বের ভক্তের সংখ্যা যেমন বহু তেমনি রূঢ় সমালোচকেরও অভাব নেই। এমনকি আমাদের বাংলাদেশের এক পণ্ডিত সমালোচক বিশ্বাস করেন যে দানিকেন তত্ত্বের প্রচার যত বেশী হবে মানুষ তত বেশী নাস্তিক হয়ে পড়বে। তিনি দানিকেনের মূল গ্রন্থের প্রকাশক ও বাঙলা ভাষায় অনুদিত গ্রন্থের প্রকাশককে নাস্তিক সম্প্রদায় ভুক্ত আখ্যা দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। ভক্তি নিশ্চয় ভাল কথা; কিন্তু অতিভক্তি নিশ্চয় প্রশংসনীয় নয়। সুখের বিষয় এ ধরণের সমালোচকের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

দানিকেন সত্যিই কি নাস্তিক? তিনি কি মানুষের ঈশ্বর-ভক্তির উপর আঘাত হেনেছেন?

কলকাতায় সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে দানিকেন বলেছিলেন, 'বরং আমার তত্ত্ব ঈশ্বরকে আরও মহীয়ান করেছে। ঈশ্বরকে ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতার বেড়াজালে আবদ্ধ রাখার প্রয়াস পৃথিবীর কয়েকটি ধর্মমতে যে এখনো বর্তমান তাকে আমি কোনমতেই মানতে পারছি না। নিজে খৃস্টান হলেও হিন্দুধর্মের ব্রহ্ম সম্পর্কিত ধারণাকে আমি বেশি বৈজ্ঞানিক বলে মনে করি।'

অনেকে বলেন অন্য কোন গ্রহে মানুষের মত বুদ্ধিমান প্রাণী থাকতে পারে না।

সৌরমণ্ডলের কোন গ্রহে মানুষের মত উন্নত জীব না থাকলেও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোন গ্রহে মানুষের মত উন্নত জীবের অস্তিত্ব নেই একথা জোর দিয়ে বলা বোধহয় এখুনি সম্ভব নয়। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখিয়েছেন যে আমাদের ছায়াপথেই এককোটি কুড়ি লক্ষ গ্রহে মানুষের মত উন্নত জীবের অস্তিত্ব থাকার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

আরেকটি বিরুদ্ধ মতবাদ হচ্ছে সৌরমণ্ডলের বাইরে কোন গ্রহে মানুষের মত বুদ্ধিমান প্রাণী থাকলেও তারা মহাকাশের কোটি কোটি কিলোমিটার পেরিয়ে কখনই পৃথিবীতে এসে পৌঁছুতে পারে না।

মানুষ মহাকাশ যাত্রার সবে হাতেখড়ি দিয়েছে। এখুনি তার পক্ষে এরকম একটা কথা বলা হয়তো কিছুটা ছোট মুখে বড় কথা বলার মত। ইজেকিয়েলের

বর্ণিত মহাকাশযান প্রযুক্তিগত দিক থেকে সম্ভব, কিন্তু ওই ধরনের মহাকাশযান তৈরির কলা-কৌশল এখনো আমরা রপ্ত করতে পারিনি একথা স্বীকার করেছেন নাসার (NASA) যন্ত্রবিদ যোশেফ ব্লুমরিখ। তাহলে ?

দেবতারা এসে কৃত্রিম পরিব্যক্তি বা আরটিফিসিয়াল মিউটেশানের মাধ্যমে বানর-মানুষদের উন্নত বুদ্ধিমান মানুষে পরিবর্তিত করেছিল—দানিকেনের এই যুক্তির বিরুদ্ধেও বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছে। কেউ বলেন ট্রানসপ্লানট পদ্ধতিতে কোন বানর মানুষের খুলিতে মগজ বসিয়ে দিলেই যে তার সন্তান-সন্ততিরা বংশানুক্রমিক ভাবে উন্নত মগজের অধিকারী হবে এমন কোন প্রমাণ নেই।

এ প্রশ্নেরও এখুনি শেষ উত্তর দেওয়ার সময় আসেনি। মাইক্রোবায়োলজী বিজ্ঞানের নবীনতম শাখা। মগজ বপনের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় জেনেটিক্যাল কোডের পরিবর্তন সাধন করতে পারলে সেই ধারা বংশানুক্রমে চলতে পারে কি না তা এখুনি বলা সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে গবেষণা ও পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন আছে।

দেবতারা নর-বানরদের খুলিতে উন্নত মগজ বপন করেছিলেন নাকি জেনেটিক্যাল কোডের পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন, অথবা সহজ পন্থা মৈথুনের সাহায্যে আদিম মানব গোষ্ঠিকে উন্নত মানুষে পরিবর্তিত করেছিলেন, তা অবশ্যই ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। মনে রাখা দরকার আমরা যে উন্নত মগজের কথা বলি তার মাত্র এক দশমাংশ কাজ করে অর্থাৎ active। বাকি অংশ dormant বা নিষ্ক্রিয়। সেই dormant অংশকে যোগারা যৌগিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে active করে তোলেন ও অতিমানবে বা মহামানবে পরিণত হন। এক্ষেত্রে উন্নত মগজ বপন বা জেনেটিক্যাল কোডের পরিবর্তনের তো কোন প্রয়োজন পড়ে না। সুতরাং এ বিষয়টি নিয়ে আরো গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি।

দানিকেন তত্ত্বের বিরুদ্ধে আরো একটি মুখ্য যুক্তি হল—দানিকেনের সিদ্ধান্তগুলি বিজ্ঞান সম্মত নয়।

তা হয়তো ঠিক। সে কথা দানিকেন নিজেও বারবার স্বীকার করেছেন। কিন্তু একথাও সত্যি যে আগে জন্ম হয় কল্পনার তারপর সেই কল্পনা বৈজ্ঞানিক সত্যের আগুনে পুড়ে তত্ত্ব হয়ে ওঠে। তবে দানিকেনের কল্পনা অযৌক্তিক নয়। তার মধ্যে নিশ্চয় কোন সত্য লুকিয়ে আছে।

দানিকেনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার সমালোচনা হচ্ছে এই বলে যে দানিকেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা না করে নিজের তত্ত্বের স্বপক্ষে কাজে লাগাবার জন্য বহু পুরাবস্তুকে তিনি নিজের কল্পনা মত ব্যাখ্যা করেছেন।

এই সমালোচনার মধ্যে কিছুটা সত্যি আছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দানিকেন নিজেই

এইসব ত্রুটির কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু এই ত্রুটির জন্য দানিকেনের প্রকল্প বা হাইপোথিসিসকে উৎখাত করা যায় না।

মানুষের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের কাজ বা দায়িত্ব একা দানিকেনের নয়। এ কাজের দায়িত্ব প্রতিটি দেশের সভ্য মানুষের। প্রত্যেক দেশের বিজ্ঞানী, গবেষক ও লেখক সম্প্রদায় যদি তাঁদের নিজেদের দেশের অতীত অন্ধকারের উপর আলোকপাত করান নতুন উদ্যম গ্রহণ করেন তাহলে হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই মানুষের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব হবে। সম্ভব হবে ইতিহাসের হাজার হাজার অমীমাংসিত ধাঁধার উত্তর দেওয়া। কাজটা অবশ্যই সহজ নয়। এ ধরনের কাজে প্রয়োজন সংস্কারমুক্ত মন, গভীর অনুসন্ধিৎসা ও পরমত-সহিষ্ণুতা।

দানিকেন প্রচুর পরিশ্রমে বহু অজানা তথ্য তুলে ধরেছেন তাঁর পাঠকদের সামনে তাঁর ছ'খানা বই-এর মাধ্যমে (বইগুলির বাংলা অনুবাদ করেছেন অজিত দত্ত)। কিন্তু তবু দানিকেন দেবতা তথা তাঁদের বংশধর মানুষদের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করতে পারেননি বলেই আমাদের বিশ্বাস। বিচ্ছিন্ন ঘটনা যত চমকপ্রদই হোক না কেন সেগুলিকে ধারাবাহিক ও কালানুক্রমিকভাবে সাজাতে না পারলে তা কখনই ইতিহাসের মর্যাদা পায় না। আমাদের মতে দানিকেনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এইখানে।

মানুষের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করতে হলে চাই প্রচুর তথ্য। দানিকেন সেরকম তথ্যের সন্ধান পাননি অথবা সে সব তথ্য থেকে প্রয়োজনীয় মালমশলা উদ্ধার করতে পারেননি। আমাদের সৌভাগ্য যে এরকম তথ্যের সম্ভার রয়েছে একমাত্র ভারতবর্ষে। এইসব তথ্য বিশ্লেষণ করে মানুষের লুপ্ত ইতিহাস আবিষ্কার সম্ভব বলেই আমরা মনে করি। ভারতীয় দেব-গন্ধর্বরা যে বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, স্থাপত্যকলা, রাজনীতি ও দর্শন ইত্যাদিতে আধুনিককালের সভ্য মানুষদের থেকেও ঢের উন্নত ছিলেন সে কথা বলেছি আমার প্রথম গ্রন্থে।

দানিকেন যাদুঘরে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেই সভার সভানেত্রী ভারতের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়। ডঃ চট্টোপাধ্যায় বিশ্বাস করেন যে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের বিভিন্ন ঘটনাবলীর পিছনে বাস্তব বিজ্ঞান কাজ করছে। রামায়ন, মহাভারত, বেদ বেদান্ত এবং অন্যান্য প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের অলৌকিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব বলেও তিনি মনে করেন।

সম্প্রতি এক বাংলা সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয় থেকে জানতে পারছি: ভারতের পরমাণু বিস্ফোরণের প্রথম পরীক্ষার যিনি কৃতী ও গুণী নায়ক, রাজস্থানের মরুভূমিতে পোখরান নামক স্থানে যিনি সেই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন বর্তমান ভারতীয়

প্রতিরক্ষার বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা সেই রাজা রামান্না তাঁর একাধিক বিবৃতিতে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, রকেট, গ্রহ পর্যটন, এবং আণবিক শক্তির প্রয়োগ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির সব তথ্য ঋগ্বেদে আছে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ভারতীয় দেব-গন্ধর্বরা উন্নত ভিনগ্রহবাসী। তাঁরা কোন এক সময়ে পৃথিবীতে নেমে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন একটি ভূখণ্ডে। সেই ভূখণ্ডটি আজ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত। এই ভূখণ্ডটি থেকেই তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন সারা পৃথিবীতে এবং এরাই পরবর্তীকালে গড়ে তুলেছিলেন পৃথিবীর বিস্ময়কর সভ্যতাগুলি। এই সব ঘটনার কালানুক্রমিক ইতিহাস আমরা একে একে আলোচনা করব।

দেবতাদের পরিচয়

দেবতা তথা মানুষের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস লিখতে গেলে তাঁদের পরিচয় একটু মোটামুটিভাবে জেনে নেওয়া বোধ হয় ভালো। বহুকাল থেকেই পণ্ডিতেরা দেবতাদের আসল পরিচয় কি তা জানতে সচেষ্ট হয়েছেন। আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তাভাবনা অনেক সময় সহজ সত্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তাকে অলৌকিক ভূমিতে উন্নীত করে। আমরা সেইসব গভীর তত্ত্বানুসন্ধানের পথ পরিক্রমা না করে সহজ ভাবে সহজ সত্যকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। সেই সত্যে পৌঁছুতে হলে আমাদের খুবই সাবধানে এগুতে হবে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আর দেবতা যে এক নয় এ কথাটা মনে রাখতে হবে। আমার প্রথম গ্রন্থে একথা স্পষ্ট করে বলেছিলাম, 'দেবতারা ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কামনা-বাসনার অতীত নন। তারাও জন্ম-মৃত্যুর অধীন। এর প্রমাণ পাই আমরা রামায়ণ মহাভারতের পাতায় পাতায়। প্রজাপতি ব্রহ্মার জীবৎকাল যত দীর্ঘই হোক না কেন, তারও শেষ আছে। ইন্দ্র তো চোদ্দটা। সুতরাং দেবতারা ঈশ্বর নন। দেবতারা আমাদের মতই রক্তমাংসের মানুষ। তবে তারা আমাদের থেকেও যথেষ্ট উন্নত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণ চরিত্র' যারা পড়েছেন তারাই লক্ষ করে থাকবেন যে বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তিসহকারে দেখিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ একজন বুদ্ধিমান মানুষের বেশী আর কিছুই নন। বুদ্ধির স্বল্পতা ও জ্ঞানের অনুন্নতির জন্যই পার্থিব মানুষ কোটি কোটি ঈশ্বরে বিশ্বাসী। কিন্তু তাতো হতে পারে না। ঈশ্বর এক। তিনি অক্ষয়, অব্যয়। তিনি জন্মরহিত, অমর, নিত্য ও শাশ্বত।

'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥'

[কঠ উপনিষদ ১।২।১৮]

এই পরমাত্মা বা ঈশ্বরকেই জানতে চেষ্টা করেছেন দেবতারা। এই পরমব্রহ্মের সন্ধানেই ছুটে বেড়াচ্ছে মানুষ। অর্থাৎ যে বিশ্ব নিয়ন্তা পরমব্রহ্ম দেবতাদের ঈশ্বর, তিনিই মানুষের ও ঈশ্বর।'

তাই দেবতারা কখনই ঈশ্বর হতে পারেনা। তাহলে তাঁরা কারা? কি তাঁদের আসল পরিচয়? কেউ বলেছেন তাঁরা ভৌতিক জগতের শক্তিসমূহ, যেমন আকাশের সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি। আবার কারো মতে দেবতারা শরীরধারী উন্নত মানব সম্প্রদায়। যাস্ক বলেন দেব শব্দটির একাধিক অর্থ আছে। যিনি দান করেন তিনি দেব। যিনি দীপ্ত হন বা দ্যোতিত হন তিনি দেবতা এবং যিনি দ্যুস্থানে অর্থাৎ আকাশে থাকেন তিনিও দেবতা।

'দেবো দানাদ্ বা দীপনাদ্ বা দ্যোতমদ্ বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা।' [যাস্ক ৭।১৫]

শঙ্করাচার্য দেবতাদের সম্বন্ধে আরো স্পষ্ট কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'দেবতাদিগের মধ্যে সামর্থ্যের সম্ভাবনা আছে, কেন না মন্ত্র, অর্থবাদ, ইতিহাস, পুরাণ থেকে জানা যায় যে তাঁহারা শরীরধারী।'

দেবতা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করতে হলে প্রথমেই বৈদিক দেবতা দিয়ে শুরু করতে হয়। শ্রদ্ধেয় রাজ্যেশ্বর মিত্র তাঁর 'স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা' গ্রন্থে বৈদিক দেবতাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, 'আসলে দেবতারা হচ্ছেন একটি নরগোষ্ঠী, যাঁরা বৈদিক সংহিতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন।'

দেবতাদের নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়তে বাধ্য হই। কোন সময় মনে হয় দেবতারা বুঝি ভৌতিক জগতের শক্তিসমূহের প্রতিভূ, আবার কোন সময় মনে হয় তাঁরা রক্তমাংসের দেহধারী উন্নত জীব। কেন এই ধরণের বিভ্রান্তি ঘটে তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা লক্ষ করি যে বেদের সূত্রগুলির মধ্যেই এই বিভ্রান্তির বীজ লুকিয়ে রয়েছে। সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা যেন ইচ্ছে করেই এইরকম ব্যাপার ঘটিয়েছেন।

জ্ঞানগর্ভ কোন দার্শনিক আলোচনার মধ্যে না গিয়েও সহজ সরলভাবে মানব মনের গূঢ় রহস্য অনুধাবন করে আমরা এই রহস্যের যবনিকার উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

সভ্যতার প্রথম দিনই বেদ সৃষ্টি হয়েছিল একথা ঠিক নয়। বেদ সৃষ্টি হওয়ার বহু কাল আগে থেকেই একটি মানব সভ্যতা ধীরে ধীরে উন্নত হয়ে উঠছিল এ কথা আমররা ধরে নিতে পারি। এই সভ্যতার উষা লগ্নে আদিম মানব নিশ্চয় প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে নিজেদের থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী ভেবে উচ্চাসনে বসিয়ে পূজো দিতে শুরু করেছিল। এক একটি প্রাকৃতিক শক্তির পিছনে স্বীকৃত হয়েছিল এক একটি দেবতা। আকাশের নক্ষত্র সূর্য তাই হয়েছিলেন সূর্যদেব।

বহুকাল পরে মানুষ আরো উন্নত হল। প্রকৃতির রহস্য সে বুঝতে শিখল। তখন বোঝা গেল সূর্য আলো দেয়, জীবন বাঁচিয়ে রাখে ঠিকই কিন্তু সে একটি নক্ষত্র বই আর কিছু নয়। একটি নক্ষত্র কখনই ঈশ্বর হতে পারে না। তবে এই নক্ষত্র সেই পরমশক্তিমানের একটি বিভূতি। তখন সব প্রাকৃতিক বা ভৌতিক দেবতা সমূহ হয়ে দাঁড়ালেন পরমেশ্বরের বিভূতি। উচ্চতর মানসিক ব্যাপ্তির ফলে মানুষ আর ভৌতিক বা প্রাকৃতিক শক্তি উপাশক হয়ে থাকতে পারল না। তাদের প্রসারিত মনের চাহিদা পূরণের জন্য তারা এক পরমপুরুষের সন্ধান করল। সৃষ্টির প্রতিটি জিনিসের সঙ্গে সেই রহস্যময় করুণাধন পুরুষের যে একটি সম্পর্ক রয়েছে তা তারা অনুভব করল। তখন রহস্যবাদী ভাবকেরা (mystic) নিমগ্ন হলেন আত্মজ্ঞান ও বিশ্বজ্ঞান চর্চায়। আবিষ্কার করলেন তাঁরা জীব, মানুষ ও জড়ের অন্তর্নিহিত সত্তা ও শক্তিকে। মানুষ একদিন একথাও অনুভব করল যে সেও উন্নত হতে পারে ঈশ্বরের পর্যায়ে। পরমেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেও পরমেশ্বর হতে পারে। তাই সে এই অমোঘ বাণী উচ্চারণ করার শক্তি খুঁজে পেল—'সোহম্' অর্থাৎ আমিই সেই। এই-ভাবেই হয়তো মানুষ দেবতা হয়ে ওঠার সাহস অর্জন করেছিল।

ঋগ্বেদের দেবতাদের মধ্যে সবথেকে বেশী সূক্ত আছে ইন্দ্রের নামে। তাই ইন্দ্রকে নিয়ে আলোচনা করলে হয়তো দেবতত্ত্ব অনেকটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। যাস্কের মতে ইনি অন্তরীক্ষ স্থানের দেবতা। বেদে আমরা এঁর তিনটি রূপ দেখতে পাই।

(১) তিনি বৃত্রকে নিহত করে মেঘ থেকে বারিবর্ষণের পথ সুগম করে দেন।

(২) তিনি দেব-অবিশ্বাসী মানুষদের দুর্গ সমন্বিত আবাসগুলি ধ্বংস করে তাদের বিনাশ করেন।

(৩) তিনি বিষ্ণুকে সংরক্ষিত বা বিশ্বস্থিতির জন্য বহু প্রয়োজনীয় কাজ করেন। তিনি পৃথিবীকে দৃঢ় করেন, পর্বতদের সংহত করেন, অন্তরীক্ষ তৈরী করেন ও দ্যুলোক স্তম্ভিত করেন।

দুর্দমনীয় যোদ্ধারূপেই ইন্দ্র পরিকল্পিত। অগ্নি ও পূষা তাঁর ভাই। মরুৎগণ তাঁর সাহায্যকারী। বজ্র তাঁর অস্ত্র। ত্বষ্টা তাঁর জন্য বজ্র তৈরী করেছেন। সে বজ্র লৌহ বা প্রস্তর নির্মিত। দুটি হরিৎবর্ণ অশ্বচালিত সোনার রথে তিনি পরিভ্রমণ করেন। সোমরস তাঁর প্রিয় পানীয়।

শ্রদ্ধেয় রাজ্যেশ্বর মিত্র তাঁর 'স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা' গ্রন্থে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় জুড়ে ইন্দ্রের পরিচয় দিয়েছেন। সেখানে ইন্দ্রকে আমরা এক পরাক্রমশালী যোদ্ধা ও বীর রাজা হিসেবেই দেখতে পাই।

ইন্দ্রকে ভৌত দেবতা ও রক্তমাংসের বীর রাজা হিসেবে দেখতে পাই। কেন এরকম ঘটে ?

শ্রীগিরীন্দ্র শেখর বসু তাঁর 'পুরাণ-প্রবেশ' গ্রন্থে এর একটি মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'বিভিন্ন দেবতা যেমন মনুষ্যরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হন সেইরূপ উত্তম মনুষ্যও প্রতিলোম ক্রিয়ায় দেবতায় পরিণত হন। বেদেও এরূপ ব্যাপারের ভূরিভূরি উদাহরণ আছে। এই প্রতিলোম ব্যাপারে একটি আশ্চর্য সূত্র দেখা যায়। প্রথমে উত্তম মনুষ্য মনুষ্যরূপেই পূজা পান, তৎপরে তিনি দেবতা হন ও তৎপরে আকাশে জ্যোতিষ্করূপে কল্পিত হন। ইন্দ্র প্রথমে মনুষ্য ছিলেন, পরে দেবতা হইলেন ও তৎপরে সূর্য হইলেন। এই সূত্র না মানিলে 'ঋগবেদের সমস্ত ইন্দ্রবিষয়ক সূক্তের সরল অথ পাওয়া যাইবে না। পৃথিবী হইতে আকাশে উন্নীত হইলে পর মনুষ্য, দেবতা ও জ্যোতিষ্কের গুণাবলি পরস্পর মিশিয়া যায়। মনুষ্য, দেবতা ও সূর্য এই ত্রিবিধরূপেই ইন্দ্রের কীর্তিকলাপ 'ঋগবেদে' বর্ণিত হইয়াছে।'

এই তত্ত্বকে বসু মহাশয় বলেছেন দিবি আরোহণ তত্ত্ব।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণও সেই কথা বলেন, 'পুণ্যবলে যাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহারাই পুণ্যাবসানে গ্রহ আশ্রয় করিয়া তারকারূপে বিরাজ করেন। শুক্ল বলিয়া ইঁহাদিগকে তারকা বলা হয়।'

যাহোক ইন্দ্রকে যেভাবেই কল্পনা করা হোক না কেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ইন্দ্র একজন দেহধারী মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন দেবতাদের রাজা। স্বর্গ ছিল তার রাজধানী। মহত্বে ও গরামায় একদিন তিনি দিবি আরোহণ করলেন এবং ভৌত দেবতা হিসেবে যজ্ঞভাগী হলেন। এরপর দেহধারী ইন্দ্র ও ভৌত দেবতা ইন্দ্রের পরিচয় আর কার্যকলাপ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। বৈদিক যুগের বহু দেবতা সম্পর্কেই এই একই কথা বলা চলে।

এবার যদি আমরা পৌরাণিক দেবতাদের দিকে তাকাই তাহলে বৈদিক দেবতাদের থেকে একটা স্পষ্ট পার্থক্য আমাদের নজরে আসবে। বৈদিক দেবতারা তা তিনি ভৌত অথবা দিবি আরোহিত যিনিই হোন না কেন, মানুষের একান্ত আপনজন কখনই নন। এইসব দেবতারা যেন নৈর্ব্যক্তিক। অথচ পৌরাণিক দেবতারা মানুষের অতি প্রিয়জন মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার জন্য সবসময় তাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। মানুষকে দেখা দিয়েছেন। মানুষের কন্যাদের ভালবেসে বিয়ে থাওয়া করে ঘর সংসারও করেছেন অনেকে। পৌরাণিক দেবতারা দেহধারী ও আকাশচারী। বৈদিক দেবতাদের থেকে তাঁরা অনেক বেশী প্রাণবন্ত ও মানবিক গুণের অধিকারী। পৌরাণিক দেবতারা বৈদিক দেবতাদের থেকে ভিন্নতর। বৈদিক দেবতারা বিবর্তিত হয়ে পৌরাণিক দেবতায় পরিণত হন নি একথা পণ্ডিতরা বলে থাকেন। ডক্টর অশোক চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'পুরাণ পরিচয়' গ্রন্থে বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতাদের মধ্যে যে পার্থক্য তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

দীর্ঘায়ত। শ্মশ্রুগুম্ফ সমন্বিত ছিল তাঁর মুখমণ্ডল। কেশ ছিল স্বর্ণাভ। দৃঢ় গ্রীবামূল ও সুগঠিত বিশাল বাহুদ্বয়ের অধিকারী ছিলেন তিনি। এক এক সময়ে এক এক ধরণের বর্ম পরতেন, মস্তকে শোভা পেত তাঁর সুদৃশ্য শিরস্ত্রাণ। উগ্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন ইন্দ্র। তাঁর বর্ম তৈরী হত জাম্বনদ স্বর্ন থেকে। মরুদ্‌গন ছিলেন ইন্দ্রের অনুচর। এঁদের সংখ্যা ছিল উনপঞ্চাশ। খুব সম্ভবতঃ ইন্দ্রের সেনাবাহিনী আদিতে ছিল সাতজন নায়কের অধীনে। এই সেনা নায়কগণের সাধারণ উপাধি ছিল মরুৎ। এই মরুৎগণ ছিলেন অশ্বারোহী এবং উষ্ণীষ ও বর্মধারী। পরে হয়তো ইন্দ্রের সৈন্যগণের এক এক বিভাগ সাতভাগে বিভক্ত করা হয় ও এক একজন মরুতের অধীনে দিয়ে দেওয়া হয়। তাই মরুৎগণের সংখ্যা দাঁড়ায় উনপঞ্চাশে। এই মরুৎগণ ছিলেন অসুর সম্প্রদায়ভুক্ত। বায়ু পুরাণে ইন্দ্র বলছেন, 'এই মরুদ্‌গণ অসুর দলভুক্ত হইলেও দেবসম্মত দেবভূত হইয়া যজ্ঞভাগভোজী হইবেন।' বিষ্ণু পুরাণ থেকে জানা যায় যে মরুৎগণ দিতি ও কশ্যপের সন্তান।

এই ইন্দ্রের কিছুকাল আগে থেকে স্বর্গরাজ্যে দেবতাদের তেমন জোর ছিল না। তখন হিরণ্যকশিপু স্বর্গরাজ্যের অধিকর্তা হন। এই হিরণ্যকশিপুর কন্যা ও মহর্ষি ত্বষ্টার পুত্র হচ্ছে বৃত্র। বৃত্র খুবই পরাক্রমশালী অসুর ছিলেন। তিনি ইন্দ্রকে আঠারোবার যুদ্ধে পরাজিত করেন ও নিজেই ইন্দ্র হয়ে বসেন। 'ঋগ্বেদের ১।৩২।১৪ সূক্ত থেকে জানা যায় যে ইন্দ্র বৃত্রের নিকট পরাজিত হয়ে নদনদী অতিক্রম করে পালিয়েছিলেন। ত্বষ্টা ইন্দ্রকে বজ্র তৈরী করে দেন এবং সেই বজ্রের সাহায্যে ইন্দ্র বৃত্রকে নিহত করেন। পুরাণে ত্বষ্টা নামের বিভিন্ন ব্যক্তির উল্লেখ আছে। বজ্র নির্মাণকারী ত্বষ্টা বৃত্রের পিতা ছিলেন না, ইনি অন্য ত্বষ্টা।

বৃত্র বিজয়ের পরে দেবসভ্যতা চরম উন্নতি লাভ করে। এর পর ইন্দ্ররা আটযুগ ধরে স্বর্গে রাজত্ব করেন। বৃত্রের মৃত্যুর পর মহাপরাক্রান্ত অসুর শক্তি হীনবল হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে এঁরা বারবার স্বর্গরাজ্য অধিকার করার চেষ্টা করেন, তবে সফল হন না।

ইন্দ্র যে দেহধারী রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। 'ঋক সূক্ত থেকে আমরা জানতে পারি, 'সহ শ্রুত ইন্দ্রোনম দেব উর্দ্ধ্বো ভবন্মনুষে দস্মতমঃ।' (ঋ ২।২০।৬) অর্থাৎ সেই বিশ্রুত ইন্দ্র নামক দেবতা উর্দ্ধে অবস্থান করেন এবং তিনি মনুষ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর।

আমাদের পৌরাণিক দেবতাদের মত দেহধারী রক্তমাংসের দেবতাদের কাহিনী যে ছড়িয়ে রয়েছে সারা পৃথিবীতে। বিবর্তনবাদীরা সভ্য মানুষের যে ইতিহাস তুলে ধরেন দেখা যায় দেব-ইতিহাস তার থেকেও প্রাচীন। কেন এরকম ধাঁধার সৃষ্টি হল তা ভেবে দেখার প্রয়োজন নেই কি?

অমৃতস্য পুত্রা

সারা পৃথিবীর পুরাকথা ও লৌকিক গাথাতে ছড়িয়ে রয়েছে দেহধারী ও আকাশচারী দেবতাদের কথা। এই দেবতাদের কাহিনী যেমনি উজ্জ্বল তেমনি বর্ণাঢ্য। তাই এই সব দেব-কাহিনী প্রাচীন মানুষের স্মৃতিকে এমন গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল যে হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হলেও সে স্মৃতি এতটুকু ম্লান হয়নি। এইসব দেবতারা রূপে-গুণে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে, শৌর্যে-বীর্যে জ্ঞান বিজ্ঞানে সব কিছুতেই ছিলেন আমাদের থেকে বহু বহুগুণ উন্নত। এই দেবতারাই মানুষকে দান করেছিলেন নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি। পার্থিব মানুষের উন্নতিই যেন ছিল তাঁদের কার্য্য।

আজ বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে এসে আমরা মহাকাশ-বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি করেছি। স্বভাবতই আজ মানুষের মনে প্রশ্ন উঠেছে এই আকাশচারী দেবতাদের আসল পরিচয় কি? তাঁরা যে অলৌকিক কোন সত্তা নন, বরং আমাদের মতই দেহধারী মানুষ সে বিষয়ে আজ পণ্ডিতরা প্রায় একমত। এখন প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে এই দেহধারী দেবতারা কি আমাদের পৃথিবীর মানুষ? নাকি তাঁরা অন্য কোন গ্রহ থেকে পৃথিবীতে নেমে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন? আমার প্রথম গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি এ গ্রন্থে আরো বিশদ আলোচনা করব।

বিবর্তনবাদীরা বলে থাকেন আধুনিক সভ্য মানুষের পূর্ব পুরুষ হচ্ছে ক্রো-ম্যাগনন মানুষ। এদের আবির্ভাবকাল ৩৫,০০০ খ্রীঃ পূঃ থেকে ২০,০০০ খ্রীঃ পূঃ। এরপর প্রায় ৮,০০০ খ্রীঃ পূঃ অথবা ১০,০০০ বছর আগে মানুষ প্রথম শিকার জীবন ছেড়ে খাদ্য উৎপাদনে মন দিল। গম, যব, শজীর চাষ শিখল। পশুপালন শিখেছিল সে এর আগেই। এর প্রায় চার হাজার বছর পরে পৃথিবীর বুকে আবির্ভাব ঘটল কয়েকটি বিস্ময়কর সভ্যতার—সুমের, মিশর, সিন্ধু, চীন, মায়া ইত্যাদি। সব থেকে মজার ব্যাপার হল এই যে, যদিও এইসব সভ্যতাগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিল তবু এইসব সভ্যতার মধ্যে বহু ব্যাপারে একটা অদ্ভুত মিল লক্ষ্য করা যায়। মনে হয় এইসব সভ্যতাগুলি যেন একই আদিম উৎস থেকে জন্মলাভ করেছিল, তারপর বিশেষ কোন কারণে এরা ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে।

তাই যদি হয়, তাহলে ধরে নিতে হয় যে আট থেকে দশ হাজার বছর আগে জন্মলাভ করেছিল এক আদি মানব সভ্যতা। এই সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ধর্ম, দর্শন, ইত্যাদিতে আধুনিক সভ্য মানুষদের থেকেও ঢের বেশী উন্নত ছিল। এইখানেই বিবর্তনবাদীদের সঙ্গে লাগে বিরোধ। বিবর্তনবাদীরা বলেন আট থেকে

দশ হাজার বছর আগে যে মানব সভ্যতার জন্ম হয়েছিল তা ছিল কেবলমাত্র কৃষি-ভিত্তিক। উন্নত ধরণের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ সেই কালে কখনই সম্ভব হয় নি।

এই সমস্যার দুটি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া যেতে পারে :—

(এক) পৃথিবীতে সভ্য ও উন্নত মানুষের ইতিহাস শুরু হয়েছিল বহু প্রাচীন-কালে। সম্ভবতঃ সেই ক্রো্ম্যাগনন মানুষদের কালেই—যা বিবর্তনবাদীরা ঠিক সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে যুক্তিসঙ্গতভাবে উপস্থাপিত করতে পারে নি। অথবা

(দুই) ধরে নিতে হয় যে। ানুষের পূর্বপুরুষ তথা দেবতাদের সভ্যতা উন্নতিলাভ করেছিল অন্য গ্রহে। আট থেকে দশ হাজার বছর আগে এই উন্নত মানব গোষ্ঠী পৃথিবীতে নেমে এসে কোন একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন এবং কোন বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে ছ'হাজার বছর আগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলেন।

প্রথম উত্তরের কোন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ এখনো জোগাড় করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু দ্বিতীয় উত্তরের প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও রয়েছে বহু পরোক্ষ প্রমাণ। দানিকেন তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে এ ধরণের বহু পরোক্ষ প্রমাণ দাখিল করেছেন। আমার প্রথম গ্রন্থেও বহু পরোক্ষ প্রমাণ উল্লেখ করেছি।

ভারতীয় দেবতা ও দেবজনদের ধারাবাহিক লিখিত ইতিহাস রয়েছে, কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে যা এসে পৌঁছেছে আমাদের হাতে। এই ইতিহাস সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারলেই আমরা পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের বিস্ময়কর সভ্যতা সৃষ্টি-কারী মানুষদের সঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষ দেবতাদের সঠিক সম্পর্কটাও খুঁজে বের করতে পারব বলেই আমরা মনে করি। তখন একথা পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে সারা পৃথিবীর মানুষ আমরা একই রক্তসূত্রে বাঁধা। অবস্থা, পরিবেশ ও প্রচেষ্টার তারতম্যের জন্যে আজ আমরা সবাই ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্র বলে পরিচিত হলেও আমরা একই পূর্বপুরুষদের বংশধর। বহু বহু কাল অতীতের অন্ধকার আমাদের আসল পরিচয় কুয়াশাচ্ছন্ন করে রেখেছে। সেই অন্ধকার কুয়াশা ভেদ করে আমরা আত্মপরিচয় খুঁজে পেতে চাই। এ কাজ বড় কঠিন। আংশিক বা বিচ্ছিন্ন চমকপ্রদ ঘটনা উল্লেখ করে পাঠককে হয়তো সাময়িকভাবে মোহাবিষ্ট করা যায়, কিন্তু মানুষের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করা যায় না। সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পুরাকাহিনী, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে কঠিন পরিশ্রমে ধাপে ধাপে গড়ে তুলতে হবে মানুষের প্রাচীন লুপ্ত ইতিহাস। এ কাজে আমি কতখানি সফল হব তা বলতে পারি না, তবে কিভাবে ও কোন পথে সেই লুপ্ত ইতিহাস

উদ্ধার করা সম্ভব তার পথ নির্দেশ করতে পারব বলে মনে করি। পরবর্তীকালে সত্যিকারের গবেষকরা এই পথে গভীরভাবে গবেষণা করে এক বিজ্ঞান সম্মত মানব ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। তখন সারা পৃথিবীর মানুষ একসঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে পারবে যে আমরা সবাই মানুষ—আমরা অমৃতের পুত্র। একই দেববংশের রক্ত বয়ে চলেছে আমাদের প্রত্যেকের ধমনীতে। এ ভাবনা আজ অনেক দেশেই দানা বেঁধে উঠছে। তবে ভারতীয় হিসেবে আমাদের দায় যে অনেক বেশী, এ সত্য প্রমাণ করতে হবে আমাদেরই।

অ্যানড্রু টমাস তাঁর 'আমরাই কি প্রথম'? গ্রন্থে বলেছেন, 'নক্ষত্রলোকের জীবরাই হয়তো পৃথিবীর প্রথম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, সূর্যসম্রাটরূপে সেই সাম্রাজ্য শাসন করতে থাকে এবং শেষে একদিন তাদের পার্থিব উত্তরাধিকারীদের হাতে সূর্যবংশের উত্তরাধিকার দান করে যায়। এই সম্ভাবনার অনুমোদন পাওয়া যায়, মিশর, ভারত, চীন, গ্রীস, মেক্সিকো এবং পেরুর পুরাকাহিনীতে। এতে দেখা যায় যে একসময়ে দেবতারা পৃথিবীর মানুষকে শাসন করতো।'

টমাস আরো লিখেছেন, 'এই বিশ্বাস আজও ভারতে অতিমাত্রায় বর্তমান। এই বিশ্বাস ভারতীয়দের মধ্যে যে কত দৃঢ় তার নিবিড় পরিচয় আমি পেয়েছিলাম। ভারতে আসার পর ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে দেবতাদের মতো সম্মান দেখায়। তারা বলেছিলো, এমনও তো হতে পারে যে আপনি কোন অপার্থিব প্রাণী অস্ট্রেলীয় নাগরিকের ছদ্মবেশে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।'

এর একটি বিশেষ কারণ আছে বলে আমরা মনে করি। মিশর, সুমের, গ্রীস বা মায়া সভ্যতা থেকে ভারতীয় সভ্যতার চরিত্র একটু পৃথক। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও খনন কার্যের আগে মিশর বা ইরাকের লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষদের সভ্যতা সম্পর্কে কিছুই প্রায় জানত না। অর্থাৎ প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার কোন নাড়ীর যোগ ছিল না। বহু পুরাকালেই তা ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলে। কিন্তু ভারতীয়েরা সেই সুদূর অতীতের সভ্যতার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে এই বিংশ শতাব্দীর মহাকাশ-বিজ্ঞানের চূড়ান্ত উন্নতির পর্যায় পর্যন্ত। এই প্রাচীন ঐতিহ্য রক্তে রক্তে বহন করে চলেছে সারা ভারতের মানুষ। বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারতের ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত নয় কোন বর্তমান ভারতবাসী। এ বড় আশ্চর্য কথা। একটি মহান প্রাচীন সভ্যতার ধারাবাহিক স্রোত বয়ে চলেছে শুধু আমাদেরই মধ্যে।

A. L. Basham তাঁর 'The wonder that was India' গ্রন্থে এই কথাই বলেছেন, "the earliest European to visit India found a culture fully concious of its own antiquity.'

দেবতাদের ইতিহাস শুরু করার আগে দেখা যাক সত্যি সত্যিই দেবতারা ভিন-গ্রহবাসী নভশ্চর ছিলেন কি না?

দেব-গন্ধর্বরা কি ভিন্ন গ্রহবাসী নভশ্চর

দেবতারা যে রক্তমাংসের শরীরধারী মানুষ তাতে কোন সন্দেহ নেই। দানিকেন তাঁর তত্ত্ব প্রচারের বহু পূর্বেই ভারতীয় মনীষীরা স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন—দেবতারা শুধু রক্তমাংসের মানুষই নন, তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও মহাকাশ বিদ্যাতেও যথেষ্ট উন্নত ছিলেন, আমরা সে সব বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ বুঝতে পারি না বলে পুরাণ ও মহাকাব্যগুলির ঘটনা বিশ্বাস করে উঠতে পারি না, তাই সে সব কাহিনী আমাদের কাছে অলীক বলে মনে হয়। পুরাণ বিশ্লেষণ করলেই আমরা দেখতে পাব পৌরাণিক দেবগন্ধর্বরা ভিনগ্রহবাসী। অন্য এক সৌরমণ্ডল থেকে তাঁরা এসেছিলেন আমাদের সৌরমণ্ডলে। তারপর এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য। তাঁরা নিজেদের সৌর-মণ্ডলের গ্রহগুলির নামে নতুন করে নামকরণ করেছিলেন আমাদের সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলির। সেই কারণে আমরা আসল ঘটনাগুলো উদ্ধার করতে পারি না, বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। ইংরেজরা আমেরিকায় গিয়ে উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার বহু জায়গার নাম রেখেছিল ইংল্যাণ্ডের জায়গার নামে। চাঁদে বসবাস করার বহু আগেই তো আমরা সেখানে পার্থিব নাম লাগাতে শুরু করে দিয়েছি। আসলে এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। বিদেশ বিভূঁয়ে গেলেও সে পরিচিত জায়গা, নদনদী পাহাড় পর্বতের ভিতরেই বাস করতে চায়। নামকরণের সুযোগ থাকলেই তা করে ফেলে।

মানুষ মহাকাশ জয়ের আগে কখনো ভাবতে সাহস করেনি যে দেবতারা অন্য গ্রহ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসতে পারে। দেবতা ও মানুষ এই গ্রহেই জন্মলাভ করেছে ও উন্নত হয়ে উঠেছে—এই ছিল ধারণা। সুতরাং পুরাণে যে অন্য একটি সৌরমণ্ডল ও তার বাইরের গ্রহলোকের স্পষ্ট বর্ণনা দেওয়া রয়েছে তা অনেকে কল্পনায়ও আনতে পারে না। পৌরাণিক সপ্তলোক ও সপ্তদ্বীপা ভূমণ্ডল যে আমাদেরই সৌরমণ্ডল ও পৃথিবী—এ কথা ভেবেই সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। আজ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষ মহাকাশ যাত্রায় হাতেখড়ি দিয়েছে। সে চাঁদে পা রেখেছে, রোবট চালিত মহাকাশযান পাঠিয়েছে মঙ্গলে, শুক্রে, এমন কি সৌরমণ্ডলের বাইরে। তাই আজ মানুষের অতীতকে অন্য কোন গ্রহলোকে খোঁজার সাহস জন্মেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পুরনো ধ্যান ধারণাকে একটু যাচাই করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে বৈকি।

পৌরাণিক সপ্তলোকের বিবরণ দিতে গিয়ে কূর্ম পুরাণ বলেছেন, 'সূত কহিলেন, 'হে দ্বিজোত্তমগণ! অতঃপর সংক্ষেপেই ত্রিভুবনের পরিমাণ বর্ণনা করিব ; সুবিস্তৃত-রূপে বলিবার সাধ্য নাই। (প্রকৃতি-প্রসূত) অণ্ড হইতেই ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপলোক ও সত্যলোক উৎপন্ন হইয়াছে।'

ভূর্লোক হচ্ছে পৃথিবী। বিষ্ণু পুরাণ বলছেন, 'সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণ যতদূর আলোকিত হয়, সমুদ্র, নদী ও পর্বত সমবেত ততদূর স্থান পৃথিবী বলিয়া কথিত। পৃথিবীর বিস্তার ও পরিমণ্ডল যে পরিমাণ ভুবর্লোকেরা বিস্তার ও পরিমণ্ডলও সেই পরিমাণ।' আবার কূর্ম পুরাণ বলছেন, 'সূর্য্যের বিস্তৃত পরিমণ্ডল হইতে ভূর্লোক যত পরিমাণ ভাস্করমণ্ডল হইতে ভুবর্লোকও তত পরিমাণ দূরে অবস্থিত।'

এ থেকে অনুমান করা যায়। যে ভূর্লোক ও ভুবর্লোক একই আকারের গ্রহ এবং এদের কক্ষপথও খুবই কাছাকাছি ; কিংবা এক। কারণ সূর্য থেকে ভূর্লোকের দূরত্ব পুরাণে দেওয়া আছে। অন্যান্য গ্রহের দূরত্ব দেওয়া আছে কিন্তু ভুবর্লোকের দূরত্ব দেওয়া নেই। এই থেকে এবং কূর্ম পুরাণের উক্তি থেকে একথাই মনে হয় যে ভূর্লোক ভুবর্লোক একই কক্ষ পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে থাকে। এ রকম অবস্থা জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী সম্ভব কিনা তা আমরা বলতে পারছি না। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

পৌরাণিক সপ্তলোক
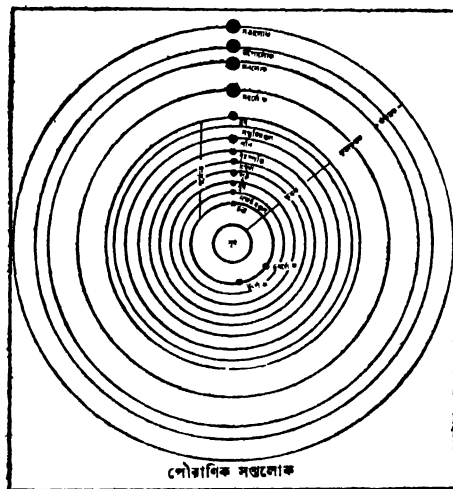
চাঁদের কক্ষপথ খুব সম্ভবত ভূর্লোকের কক্ষপথের খুবই কাছাকাছি। কারণ বিষ্ণুপুরাণ মতে সূর্য থেকে চন্দ্রের দূরত্ব ও সূর্য থেকে ভূমণ্ডলের দূরত্ব একই। 'ভূমি হইতে লক্ষ যোজন ঊর্ধ্বে সূর্যমণ্ডল। দিবাকরেরও লক্ষ যোজন ঊর্ধ্বে চন্দ্রমণ্ডল স্থিত।'

ভূর্লোক ও ভুবর্লোকের পরেই হচ্ছে স্বর্লোক। ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক নিয়ে হচ্ছে ত্রিলোক। পুরাণের বর্ণনা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে এই ত্রিলোক হচ্ছে একটি সৌরমণ্ডলের অন্তর্গত। এই ত্রিলোককে বলা হয় কৃতক। কৃতক অর্থে যা প্রতি কল্পে অর্থাৎ ৪৩২ কোটি বছরে সৃষ্টি হয়। স্বর্লোকের অন্তর্গত গ্রহ হচ্ছে : চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডল, বুধ শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ধ্রুব।

এরপরে হচ্ছে মহর্লোক। এই মহর্লোকের আর এক নাম কৃতাকৃতক—অর্থাৎ কল্পান্তে যা একেবারে ধ্বংস হয় না শুধু জ্ঞানশূন্য হয়। এখানে ভৃগু প্রভৃতি কল্পবাসিগণ বাস করেন। এই মহর্লোক হচ্ছে সৌরমণ্ডলের বাইরের কোন প্রান্তীয় গ্রহ। কল্পান্তে কৃতক অর্থাৎ সৌরমণ্ডল তার গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে ধ্বংস হলেও কৃতাকৃতক ধ্বংস হয় না শুধু জ্ঞানশূন্য হয়। অর্থাৎ মহর্লোক ধ্বংস হয় না বটে, তবে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করে।

মহর্লোকের পর হচ্ছে জনলোক। এখানে বাস করেন অমলচিত্ত বিখ্যাত সনন্দনাদি ব্রহ্মার পুত্রগণ।

জনলোকের পর তপলোক। এখামে দাহবর্জিত বৈরাজ নামক দেবগণ বাস করেন।
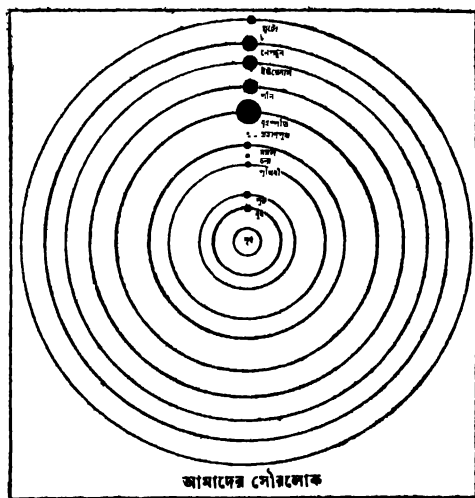
আমাদের সৌরলোক

তপোলোকের পর হচ্ছে সত্যলোক, যার অপর নাম হচ্ছে ব্রহ্মলোক বা বৈকুণ্ঠ-লোক। এখানে বাস করেন পুনর্মৃত্যুশূন্য বা অমরগণ।

জন, তপ, ও সত্যলোককে বলা হয় অকৃতক। অর্থাৎ প্রতি কল্পে এদের সৃষ্টি হয় না। এগুলি অন্য সৌরমণ্ডলের গ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক।

এখন পৌরাণিক সপ্তলোকের সঙ্গে আমাদের সৌরমণ্ডলের তুলনামূলক বিচার

করে দেখা যেতে পারে। এর থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে পৌরাণিক সপ্তলোক আমাদের এই সৌরমণ্ডল কখনই নয়।

পৌরাণিক সপ্তলোকে ভূর্লোক বা পৃথিবীর সংস্থান হচ্ছে সূর্যের সব থেকে কাছে; কিন্তু আমাদের সৌরমণ্ডলে বুধ গ্রহই সূর্যের নিকটে।

পৌরাণিক চন্দ্র 'গ্রহ' কিন্তু আমাদের চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ।

ভুবর্লোক, নক্ষত্রমণ্ডল, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ধ্রুব, মহর্লোক, জনলোক, তপলোক, সত্যলোকের কোন স্থান নেই আমাদের সৌরমণ্ডলে। তাছাড়া আমাদের সৌরমণ্ডলে সূর্য ও গ্রহগুলির মধ্যে যে দূরত্ব পৌরাণিক সপ্তলোকের সূর্য ও গ্রহগুলির মধ্যেকার দূরত্ব তার থেকে ঢের কম। পৌরাণিক সপ্তলোক ও আমাদের সৌরমণ্ডল যে এক নয়, এগুলি কি তারই ইঙ্গিত বহন করে না?

পৌরাণিক সপ্তলোকের সঙ্গে যেমন কোন মিল নেই আমাদের সৌরমণ্ডলের তেমনি আমাদের পৃথিবীর সঙ্গেও কোন মিল নেই পৌরাণিক ভুবর্লোক বা ভূমণ্ডল তথা পৃথিবীর সঙ্গে। কূর্মপুরাণ মতে ভূমণ্ডলের স্থলভাগ ও জলভাগ হচ্ছে এইরকম:

সূর্য থেকে গ্রহের দূরত্ব		আমাদের সৌরমণ্ডলের হিসাব (প্রায়)	পৌরাণিক সপ্তলোকের হিসাব (প্রায়)
	ভূর্লোক বা পৃথিবীর দূরত্ব	৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল	৯ লক্ষ মাইল
	ভুবর্লোকের „	কিছু নেই	হিসেব দেওয়া নেই
স্বর্লোক	চন্দ্রের „	৯ কোটি ৬ লক্ষ মাইল	৯ লক্ষ মাইল
	নক্ষত্রমণ্ডলের „	কিছু নেই	১৮ „ „
	বুধের „	৩ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল	৩৬ „ „
	শুক্রের „	৬ „ ৭০ „ „	৫৪ „ „
	মঙ্গলের „	১৪ „ ১৬ „ „	৭২ „ „
	বৃহস্পতির „	৪৮ „ ৩৬ „ „	৯০ „ „
	শনির „	৮৮ „ ৬১ „ „	১ কোটি ৮ লক্ষ মাইল
	সপ্তর্ষিমণ্ডলের „	কিছু নেই	১ „ ১৭ „ „
	ধ্রুবর „	„	১ „ ২৬ „ „
	মহর্লোকের „	„	১০ „ ২৬ „ „
	জনলোকের „	„	২৮ „ ২৬ „ „
	তপলোকের „	„	১০০ „ ২৬ „ „
	সত্যলোকের „	„	১৩৬ „ ২৬ „ „

পৌরাণিক যোজনকে মাইলে পরিবর্তিত করা হয়েছে এইভাবে : কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র গ্রন্থের দেশমানের সূত্র অনুসারে ৪ গোরুত বা ক্রোশে এক যোজন।

চন্দ্রিকা মতে এক ক্রোশ=৪০০০ গজ বা $\frac{৪০০০}{১৭৬০}$=২.২৭ মাইল। অর্থাৎ ১ যোজন =৪ ক্রোশ=৪ × ২.২৭=প্রায় ৯ মাইল।

জম্বুদ্বীপ প্রধানোঽয়ং প্লক্ষঃ শাল্মলিরেব চ।
কুশঃ ক্রৌঞ্চশ্চ শাকশ্চ পুষ্করশ্চৈব সপ্তম॥
এতে সপ্ত মহাদ্বীপাঃ সমুদ্রৈঃ সপ্তভির্বৃতাঃ।
দ্বীপাদ্ দ্বীপো মহামুক্তঃ সাগরাচ্চাপি সাগরঃ॥
ক্ষারোদেক্ষুরসোদশ্চ সুরোদশ্চ ঘৃতোদকঃ।
দধ্যোদঃ ক্ষীর সলিলঃ স্বাদুদশ্চোতি সাগরাঃ॥'

'অর্থাৎ ভূলোকে জম্বুদ্বীপই প্রধান। অনন্তর যথাক্রমে প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ শাক ও সপ্তম পুষ্কর নামক দ্বীপ। এই সাতটি মহাদ্বীপ সপ্ত সাগরে পরিবৃত। এক দ্বীপ হইতে পরবর্তী দ্বীপ এক সাগর হইতে পরবর্তী সাগর বৃহৎ। সপ্ত সাগরের নাম যথাক্রমে ক্ষারোদক (লবণ), ইক্ষুরসোদক, সুরোদক, ঘৃতোদক, দধ্যোদক, ক্ষীরোদক এবং স্বাদুদক।'

পৌরাণিক সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর মানচিত্র

ভূলোক বা ভূমণ্ডলের কেন্দ্রে হচ্ছে জম্বুদ্বীপ। এর চারিদিকে লবণ সমুদ্র। এই লবণ সমুদ্রকে ঘিরে রয়েছে প্লক্ষদ্বীপ। প্লক্ষদ্বীপকে বেষ্টন করে রয়েছে ইক্ষু-সমুদ্র। ইক্ষু সমুদ্রকে ঘিরে রয়েছে শাল্মলিদ্বীপ। শাল্মলিদ্বীপকে আবৃত করে রয়েছে সুরা-সমুদ্র। সুরা-সমুদ্রের চারপাশ ঘিরে রয়েছে কুশদ্বীপ। কুশদ্বীপকে বেষ্টন করে

রয়েছে ঘৃত-সমুদ্র। ঘৃত-সমুদ্রের চারপাশে রয়েছে ক্রৌঞ্চদ্বীপ। ক্রৌঞ্চদ্বীপকে ঘিরে রয়েছে দধি-সমুদ্র। দধি-সমুদ্র ঘিরে শাকদ্বীপ, শাকদ্বীপ ঘিরে ক্ষীরোদ-সমুদ্র। ক্ষীরোদ-সমুদ্রকে ঘিরে রয়েছে পুষ্করদ্বীপ আর পুষ্করদ্বীপকে বেষ্টন করে রয়েছে স্বাদু-সমুদ্র। এই হচ্ছে ভূমণ্ডল বা পৌরাণিক পৃথিবী।

এ এক বিচিত্র গ্রহের, বিচিত্র মানচিত্র। আমাদের পৃথিবীর কোন যুগের মানচিত্রের সঙ্গেই তো এর কোন মিল নেই। এমনকি বিশ কোটি বছর আগে পৃথিবীর যেরকম চেহারা ছিল বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন তার সঙ্গেও তো কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না পৌরাণিক পৃথিবীর। পুরাণকাররা বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন প্রতিটি দ্বীপের, বলেছেন সেখানকার অধিবাসীদের কথা। পুরাণ যদি ইতিহাস হয়, তাহলে পুরাণকাররা কোন এক কাল্পনিক ভূমণ্ডলের বর্ণনা দিয়েছেন একথা বিশ্বাস করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নয়। আর যদি ধরেই নেওয়া যায় যে পুরাকালে কোন না কোন সময়ে আমাদের পৃথিবীর ভূ-সংস্থান পুরাণকারদের বর্ণনা মতই ছিল ; কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীরা সেরকম কিছু কল্পনা করতে পারেননি, তাহলে নিশ্চয় পুরাণকার-দের বর্ণনা মত পৌরাণিক ভূ-মণ্ডলের বিস্তৃতি আমাদের পৃথিবীর বিস্তৃতির সঙ্গে মিলে যাবে। কিন্তু সেখানেও দেখি বহু ফারাক।

ভূ-মণ্ডলের বিস্তার সম্বন্ধে প্রায় সব পুরাণই বলেন :

'পঞ্চাশৎ কোটি বিস্তীর্ণা স-সমুদ্রা ধরাস্মৃতা।
দ্বীপৈশ্চ সপ্তভির্যুক্তা যোজনানাং সমন্ততঃ॥'

'অর্থাৎ সপ্তদ্বীপ সমন্বিত সসাগরা বসুন্ধরার চারিদিকের বিস্তৃতি বা পরিধি পঞ্চাশ কোটি যোজন।' অর্থাৎ ভূ-মণ্ডলের পরিধির মাপ হচ্ছে ৪৫০ কোটি মাইল। কিন্তু আমাদের পৃথিবীর পরিধির মাপ তো মোটে হাজার পঁচিশেক মাইল।

সম্ভবত ৪৫০ কোটি মাইল ভূ-মণ্ডলের পরিধির মাপ নয়। হয়তো ভূ-মণ্ডলের মোট আয়তনের পরিমাণ হচ্ছে ৪৫০ কোটি মাইল। কিন্তু আমাদের পৃথিবীর মোট আয়তন (জলভাগ ও স্থলভাগ নিয়ে) প্রায় ২০ কোটি বর্গমাইলের মত। তাহলে এ কোন পৃথিবীর কথা লিখে রেখেছেন পুরাণকাররা ? নিশ্চয় আমাদের পৃথিবী নয় ; অন্য এক সৌরমণ্ডলের অন্য আর এক পৃথিবীর বর্ণনা দিয়েছেন তাঁরা। এই পৃথিবীই হচ্ছে দেবতাদের আদি বাসভূমি। পৌরাণিক সৌরমণ্ডল কবি-কল্পনা নয় বাস্তব সত্য। মহীশূরের ইনটারন্যাশনাল অ্যাকাডেমী অব স্যাংসক্রিট রিসারচ মহর্ষি ভরদ্বাজ রচিত 'বৈমানিক শাস্ত্র' নামে একখানি পুঁথি আবিষ্কার করে ইংরেজী অনুবাদ সহ প্রকাশ করেছেন। দানিকেনের গ্রন্থেও এই পুঁথির উল্লেখ আছে। তবে দানিকেন এই পুঁথি সম্পর্কে উপর উপর আলোচনা করেছেন মাত্র। এ এক বিস্ময়কর গ্রন্থ। পুঁথিখানি দেশবিদেশের পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে। এক

শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর সাহায্যে গ্রন্থখানি আমি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। এই গ্রন্থের ভূমিকায় মহর্ষি ভরদ্বাজ বলছেন—তিনি ঈশ্বরের আশীর্বাদে বেদের রহস্য অনুধাবন করে বহু প্রাচীন শাস্ত্রের সহায়তায় মানুষের উপকারের জন্য 'যন্ত্রসর্বস্ব' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থের চল্লিশতম অধ্যায়ে তিনি বিমান তৈরির কলাকৌশল নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। এই অধ্যায়টিই বৈমানিক শাস্ত্র নামে পরিচিত। অর্থাৎ বৈমানিক শাস্ত্র যন্ত্রবিজ্ঞান-মহাকোষ গ্রন্থের একটি অংশ। সুতরাং এ গ্রন্থ কোন কাব্য বা গল্পকথা নয়।

পুরাকালে বিমান বলতে শুধু উড়োজাহাজ জাতীয় যানকেই বোঝাতো না, মহাকাশযানকেও বোঝাতো। বৈমানিক শাস্ত্রের প্রথম সূত্রের ইংরেজি অনুবাদ :

'Experts say that, that which can fly through air from one country to another country, from one island to another island and from one world to another world, is a VIMAANA.'

অর্থাৎ একদেশ থেকে অন্য দেশে, এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে এবং এক গ্রহ থেকে ভিন্নগ্রহে যে যান উড়ে যেতে পারে তাই বিমান।

এই গ্রন্থে সপ্তলোক, অর্থাৎ ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপলোক ও সত্যলোকের উল্লেখ আছে। এই সপ্তলোকে বিমানে যাতায়াতের বিমান পথেরও উল্লেখ আছে এই গ্রন্থে। সপ্তলোকের অধিবাসীদের বিমান চলাচলের জন্য ৫.১৯,৮০০ বিমান পথ বা মহাকাশ পথের কথা আছে এখানে।

মহাকাশের পথগুলি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। এগুলির নাম, পথ সংখ্যা ও কোন লোকের অধিবাসীদের বিমান চলাচলের জন্য কোন কোন পথগুলি নির্দিষ্ট তা দেওয়া হল।

পথের নাম	মোট বিমান পথ সংখ্যা	কোন লোকের অধিবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট	পথের কোন অংশ বা বিভাগ নির্দিষ্ট
১। রেখা	৭,০৩,০০,৮০০	ভূর্লোকের বিমান চলাচলের জন্য	১—৪
২। মণ্ডল	২০.০৮,০০,২০০	ভুবর্লোক, স্বর্লোক ও মহালোকের বিমান চলাচলের জন্য	৩—৫
৩। কাক্ষ্য	২,০৯,০০,৩০০	জনলোকের বিমান চলাচলের জন্য	২—৫
৪। শক্তি	১০,০১,৩০০	তপলোকের বিমান চলাচলের জন্য	১—৬
৫। কেন্দ্র	৩০,০৮,২০০	ব্রহ্মলোকের বিমান চলাচলের জন্য	৩—১১

তাহলে দেবতারা যে ভিনগ্রহবাসী নভশ্চর, একথা বলতে আর কি কোন বাধা আছে?

কি সেই ইতিহাস

আমাদের আঠারোখানা পুরাণ হচ্ছে দেবতাদের তথা তাঁদের বংশধর মানবদের ইতিহাস।

সুস্পষ্টভাবে দুই গ্রহের কথা এখানে লেখা না থাকলেও এমন কতকগুলি জোরালো সূত্র দেওয়া আছে যা থেকে যেকোন বুদ্ধিমান পাঠকই সেকথা বুঝে নিতে পারবেন। কেন পুরাণকাররা আরো খোলখুলি আরো স্পষ্ট ভাষায় সব কিছু লিখে রেখে যান নি তার উত্তর আমাদের জানা নেই। হয়তো তাঁরা সবকথা খোলাখুলি লিখতে চাননি বিশেষ কোন কারণে, অথবা হয়তো তাঁরা ভেবেছিলেন যে তাঁরা যা লিখেছেন তাই যথেষ্ট।

পুরাণকে ইতিহাস বললে কেউ হয়তো নাক সিঁটকোবেন, কিম্বা একটু মুচকি হেসে বললেন 'অ, তাই বুঝি।' কেননা তাদের কাছে পুরাণ হচ্ছে কতকগুলি অলীক ও অবাস্তব কাহিনীর সঙ্কলন। সেই পুরাণকে ইতিহাস বললে তাদের তো হাসি পাবেই। আসলে বিদেশী পণ্ডিতরাই আমাদের এভাবে ভাবতে শিখিয়েছেন; সাহেবরা আমাদের বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতে চাষার গান আর অলীক গল্পের সমাহার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান নি। আমরা স্বাধীনভাবে বিচার বিশ্লেষণ করার থেকে সাহেবদের বাণী বেদবাক্য বলে মেনে নিতে অভ্যস্ত। শুধু তাই নয় একদল বাঙালী বুদ্ধিজীবি এইসব মতাদর্শকে সারাজীবন ধরে জোরালো গলায় প্রচার করে গেছেন। খুব সৌভাগ্যের বিষয় যে এ ধরনের বুদ্ধিজীবিদের বাইরেও একদল সুস্থ বুদ্ধিমান গুণীজন তাঁদের স্বাধীন চিন্তাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের পুঁথি সমূহের সঠিক মূল্যায়ন করেছেন। তবু আজো পর্যন্ত এইসব মহামানবদের চিন্তাধারা থেকে সাহেবদের মতামতেরই প্রাধান্য বেশী। সাহেবপন্থী বাঙালী বুদ্ধিজীবির সংখ্যা এখনো বেশী। তাদের জ্ঞাতার্থে রাজবৈদ্য ডক্টর প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস গ্রন্থে তিনি যা বলেছেন তা তুলে দিচ্ছি।

'আমাদের দেশের বিখ্যাত পণ্ডিতগণের ধারণা যে ম্যাক্সমূলার একজন ভারতীয় কৃষ্টির প্রকৃত রসগ্রাহী এবং গুণগ্রাহী লেখক। মানুষের মনের আসল কথা অনেক সময় তাহার লিখিত পুস্তক হইতে কিংবা সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে ধরা যায় না। তাহার প্রকৃত মনোভাব তাহার অতি নিকট আত্মীয়কে লিখিত পত্রাবলী হইতে ধরা যায়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার পত্নীকে লিখিতেছেন, 'This edition of mine and the translation of the veda will hereafter tell to a great

extent on the fate of India. It is the root of their religion and to show them what the root is, I feel sure, it is the only way of uprooting all that has sprung from it during the last three thousand years.' অর্থাৎ এরপর থেকে আবার এই বেদের অনুবাদ বহুলাংশে ভারতের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করবে। বেদ হচ্ছে ওদের ধর্মের মূল ভিত। সেই ভিত কেমন তা দেখাতে হলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনহাজার বৎসর ধরে এই বেদ থেকে যাকিছুর উদ্ভব হয়েছে তা শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলাই বোধহয় একমাত্র পথ।

অপর পত্রে তিনি তাহার পুত্রকে লিখিতেছেন, 'would you say that any one sacred book is superior to all others in the world? I say the New Testament. After that, I should place the Koran, which in its moral teachings is hardly more than a later edition of the New Testament, Then would follow the Old Testament, the southern Budhist Tripitaka, the Vedas and the Avesta.'

ম্যাক্সমূলার সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গী এখানে খুবই পরিষ্কার। তাঁর মতে ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্ট। তারপর কোরাণ, বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট, ত্রিপিটক, বেদ ও আবেস্তা। এই যাঁর ধ্যানধারণা তিনি কীভাবে ভারতীয়দের বেদের নিরপেক্ষ বিচার করবেন?

শ্রী প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থ থেকে আরো কিছুটা তুলে দিচ্ছি, 'পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ভারততত্ত্ব বিষয়ে যে মনে মুখে এক নন, তাহা অধিকাংশ ভারতীয় ঐতিহাসিক দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকগণ অবগত নহেন। ঐ সকল ভারত তত্ত্ব বিশারদগণ ও ইউরোপীয় ইন্দোলজিস্টগণ ভারতীয় বৃটিশ গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে ভারতীয় কৃষ্টির বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার এবং বিষোদ্গারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা সাহায্য পাইয়াছেন এবং সেই অর্থে ভারতের ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভেষজ-বিজ্ঞান ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান রাজনীতি সাহিত্য জ্যোতিষ বিষয়ক তথ্যগুলির বিরুদ্ধে প্রকৃত বিদগ্ধজনরীতি বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। এবং বিগত দুইশত বৎসরের চেষ্টায় ভারতে একদল Pseudo Historians, Pseudo Philosophers, Pseudo Philologists, Pseudo Indologists এবং Pseudo Scientists তৈরী করিয়াছেন। এই সকল Pseudo পণ্ডিতগণ এক্ষণে ভারতীয় বিদগ্ধ জগতে রাজত্ব করিতেছেন। কিন্তু ইঁহারা সকলেই মিথ্যার এবং ভুলের বালুচরে গগনচুম্বী প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। এই সকল সৌধের ভিত্তিভূমিতে বহুদিন পূর্ব হইতেই ফাটল ধরিয়াছে এবং বৃহৎ শীর্ষের চূড়া হেলিয়া পড়িয়াছে। উহা কাল পারাবারে সত্যের উদ্ভাসিত দিবালোকে নিশ্চয়ই খসিয়া পড়িবে। ইহা মহর্ষি

দয়ানন্দের বাণী। তিনি স্বয়ং George Bhuler, Monier Williams, Rudolph Hornel, G. C. Thibot প্রমুখ তথাকথিত সংস্কৃতবিদ্যাবিশারদগণের সহিত তর্ক করিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন যে তাঁহারা যে পথে সংস্কৃতবিদ্যার অনুশীলন করিতেছেন এবং তাহাদের অনুশীলিত বিদ্যা ভারতবাসীগণকে শিক্ষা দিতেছেন তাহাতে আরও কিছুদিন অগ্রসর হইলে, তাঁহারা ভারতের উদীয়মান জনতার মনোভূমি হইতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা উৎখাত করিতে সমর্থ হইবেন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের তদানীন্তন পণ্ডিত ব্যক্তিগণকে তাঁহার বহুসংখ্যক বক্তৃতার দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে ইউরোপীয় তথাকথিত সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের পুনরভ্যুদয়ের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা মুখে যেরূপ কথা বলেন, মনে তাহার বিপরীত ভাব পোষণ করেন, এবং চাতুর্য্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক লিপিকুশলতার দ্বারা সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ভাষায় প্রকাশ করিয়া উদীয়মান জনতার মনোভূমিতে স্বদেশীয় কৃষ্টি ও শিক্ষাদীক্ষার বিরুদ্ধে বিজাতীয় ভাবের বীজ বপন করিয়া ভারতীয়-গণের অগ্রগতির পথ আগামী দুইশত বৎসরের জন্য রুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু সত্যকে বেশীদিন গোপন করিয়া রাখা যায় না। সত্য সূর্য্যের মত সপ্রকাশ। বড়ই সুখের বিষয় যে বর্তমানে পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দ্বিস্বভাবের বা দুইমুখো সাপ হওয়ার প্রবৃত্তির বিষয় অবগত হইয়াছেন এবং এই বিষয়ে দেশের লোককে অবহিত করিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।'

পার্জিটার সাহেব (F. E. Pargiter) তাঁর 'Ancient Indian Historical Tradition' গ্রন্থে মন্তব্য করলেন যে প্রাচীন ভারতের কোন ইতিহাস নেই। তিনি বললেন, 'History is the one weak spot in Indian literature. It is in fact, non-existent. The total lack of the historical sense is so characteristic, that the whole course of sanskrit literature is darkened by the shadow of this defect, suffering as it does from are entire absence of exact chronology.'

অথচ এই পার্জিটার সাহেবই পুরাণের উপর নির্ভর করে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস লিখে ফেললেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের চরিত্রের এই বৈশিষ্টের কথাই উল্লেখ করেছেন শ্রী প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁরা মুখে এক, কাজে আর এক। পুরাণের উপর নির্ভর করে যদি ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস লেখা সম্ভব হয় তাহলে কি করে একথা বলা যায় যে প্রাচীন ভারতের কোন ইতিহাস নেই?

আসল কথা হল এই যে বেশীর ভাগ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতের মহান সভ্যতা, ঐতিহ্য, ও কৃষ্টিকে ঠিক মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেন নি অথচ তাকে সরাসরি অগ্রাহ্য করার ক্ষমতাও তাঁদের ছিল না, তাই এত ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত করতে হয়েছিল।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'বেদ-রহস্য' গ্রন্থে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বেদ ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে স্বকীয় মতের অথবা আনুমানিক ভাবার্থের আরোপ করে তাঁরা বেদমন্ত্রের এমন একটি রূপ দিলেন যা বহুস্থলে স্বৈরচারী ও কল্পনা প্রসূত।'

ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে এই কারণে যে আমরা অনেকেই আজো পর্যন্ত ওইসব সুবিধেবাদী ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতামতকে বেদবাক্য বলে শিরোধার্য্য করে নিয়েছি। যদিও আমরা বহুকাল হল স্বাধীন হয়েছি তবু আমাদের সত্যিকারের ইতিহাস লেখার কোন সুসংহত চেষ্টা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বহু প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার করেছেন, অনেক টীকা ব্যাখ্যা করেছেন ঠিকই; কিন্তু সেগুলির সত্যিকারের প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছেন বলে আমরা মনে করি না। এই সব পুঁথির অন্তর্নিহিত মর্মকথা যে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন নি তা নয়। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে কালা ভারতীয়দের সভ্যতা যেমন প্রাচীন তেমনি মহান। তাই এইসব পণ্ডিতগণ ইচ্ছাকৃতভাবে দুটি পরস্পরবিরোধী কাজ শুরু করলেন।

(এক) পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ বেদ, যা এক অসীম জ্ঞান ভাণ্ডার, তাকে তাঁরা মর্যাদা দিলেন না। বললেন ওসব হচ্ছে আদিম মানুষের প্রাকৃতিক শক্তিকে ভয়ে পূজো দেওয়ার গান। ওসব বালসুলভ স্বভাবকবিদের রচনা চাষার গান ছাড়া বিশেষ কিছুই নয়। Maxmuller এর মত ভারতীয় কৃষ্টি প্রেমিক লিখলেন, 'Large number of Vedic hymns are childish in the extreme, tedious low, common place.'

(দুই) আবার অন্যদিকে এই চাষার গানের সঙ্গে নিজেদের কোন রকমে যুক্ত করার জন্য শুরু হল আন্দোলন।

বেদ যদি চাষার গানই হয় তাহলে সেই বৈদিক সংস্কৃতি বা আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে ইউরোপীয় সংস্কৃতির একটা আত্মিক যোগাযোগ ঘটানোর জন্যে কেন তাঁরা উঠে পড়ে লাগলেন? আবিষ্কার হল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর। তাতেও ক্ষান্ত হলেন না পণ্ডিতেরা। তত্ত্ব খাড়া হল আর্যরা ভারতে বহিরাগত এবং তাদের আদি বাসভূমি ছিল নাকি মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের কোন অংশে অথবা রাশিয়ার উরাল পর্বতমালার দক্ষিণের সমতলে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে পড়ল বৈদিক সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক স্বভাবতই জার্মানী ও ইংরেজী। ব্যাস ইউরোপীয়রা ও আর্যরা হয়ে গেলেন ভাই ভাই। এই তত্ত্বের সত্যতা সম্বন্ধে বহু জ্ঞানীগুণী

পণ্ডিত সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'বেদ-রহস্য' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'এই পণ্ডিতেরা বেদের মধ্যে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, সমাজ-গঠন, সংস্থা, প্রথা, রীতিনীতি ও তৎকালিক সভ্যতার চিত্র ও নিদর্শন খুঁজলেন। ভাষাভেদের সূত্র অনুসরণ করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে আর্য-জাতি উত্তরদেশ থেকে এসে দ্রাবিড়ভারতকে আক্রমণ ও জয় করে। এরূপ ঘটনার স্মৃতি কিন্তু ভারতে পরম্পরাগত প্রবাদের মধ্যে পাওয়া যায় না, এরূপ ঘটনার উল্লেখও নাই ভারতের কোনও মহাকাব্যে বা অভিজাত সাহিত্যে।'

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের বড় দল বেদ উপনিষদকে চাষাব গান বলে অভিহিত করার পরও সেই চাষার গানের ঐতিহ্যের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার গৌরব অনুভব করতে চাইলেন কেন? তার উত্তরে বলতে হয় যে তারা বুঝেছিলেন এই চাষার গান হচ্ছে মানুষের উচ্চতম চিন্তার সব থেকে প্রাচীন ফসল। সুতরাং প্রাচীন ঐতিহ্যহীন ইউরোপীয়েরা এরকম একটি মহান ঐতিহ্যের অংশীদার হতে চাইবে এটাই তো স্বাভাবিক। তবে ব্যাপারটা সহজ পথে হলে কারো কিছু বলার থাকত না। এটা ঘটল ষড়যন্ত্রের কূটিল পথে। পশ্চাৎপটের এসব কাহিনী পাঠকবৃন্দকে উপহার দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে তাঁরা যেন সুবিধেবাদী ঐতিহাসিকদের প্রভাব মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ পান্।

পুরাণই ইতিহাস

পুরাণ যে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস[।] সেকথা বহু পণ্ডিত ব্যক্তি বিশদভাবে আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন। সেসব আলোচনা নতুন করে করার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। এখানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে পুরাণ কোন অলীক গল্প নয় এ হচ্ছে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। শ্রদ্ধেয় অতুল সুর মহাশয় 'ইতিহাস ও মহাকাব্যের সীমানায়' প্রবন্ধে বলেছেন, 'আমার শিক্ষাগুরু ডঃ দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার বলেছেন যে পুরাণ সমূহের মধ্যেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে।'

ডঃ অশোক চট্টোপাধ্যায় তাঁর পুরাণ পরিচয় গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, প্রাচীন ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করিতে হইলে পুরাণগুলির প্রতি দৃষ্টি দিতেই হইবে।'

শ্রীগিরীন্দ্র শেখর বসু মহাশয় পুরাণ থেকে ধারাবাহিক ও কালানুক্রমিক ইতিহাস উদ্ধার করেছেন।

পুরাণের সংখ্যা আঠারোখানি। সমসংখ্যক উপপুরাণ আছে। আঠারোখানি পুরাণের নাম; (১) ব্রহ্ম (২) পদ্ম (৩) বিষ্ণু (৪) শিব (৫) ভাগবত, (৬) নারদ

(৭) মার্কণ্ডেয় (৮) অগ্নি (৯) ভবিষ্য (১০) বৈবর্তব্রহ্ম (১১) লিঙ্গ (১২) বরাহ, (১৩) স্কন্দ (১৪) বামন (১৫) কূর্ম (১৬) মৎস্য (১৭) গরুড় (১৮) ব্রহ্মাণ্ড।

পুরাণের লক্ষণ পাঁচটি ঃ

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।

বংশানুচরিতং চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম ॥ (বায়ু ৪।১০)

অর্থাৎ সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত এই হচ্ছে পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ।

সর্গ = বিশ্ব সৃষ্টি,

প্রতিসর্গ = প্রলয়,

বংশ = বিশিষ্ট রাজা, ঋষি, দেবতা, দৈত্য প্রভৃতির বংশ বিবরণ,

মন্বন্তর = মনুর কাল বা কাল নির্দেশ যেমন বঙ্গাব্দ, খৃষ্টাব্দ ইত্যাদি,

বংশানুচরিত = বিভিন্ন বংশীয় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কীর্তিকলাপ বর্ণনা।

পুরাকালে প্রত্যেক রাজা তাঁর নিজের রাজ্যের ইতিহাস লেখার জন্য একজন ইতিবৃত্তকার রাখতেন। এদেরকে বলা হত মাগধ। সূতেরা নানা রাজ্যে ঘুরে ঘুরে এইসব মাগধদের কাছ থেকে সেই রাজ্যের ইতিহাস সংগ্রহ করতেন। পুরাণকাররা আবার বিভিন্ন সূতের কাছ থেকে এইসব ইতিহাস সংগ্রহ করে রচনা করতেন পুরাণ। পুরাণ তাই ইতিহাস।

যজ্ঞস্থানে সূতেরা পুরাণ বর্ণনা করতেন। বায়ু পুরাণ সূতদের চরিত্র সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, সূত হবেন বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সত্যব্রত পরায়ণ ও বিশ্বস্ত। তিনি যেমন দেখবেন, যেমন শুনবেন ঠিক তেমনি বর্ণনা করবেন। এ বিষয়ে একজন সূত বলছেন, 'পুরাণজ্ঞ সত্যব্রতপরায়ণ আপনাদিগের দ্বারা পুরাণ কথনে প্রণোদিত হইয়া আমি নিজেকে পবিত্র ও অনুগৃহীত বোধ করিতেছি। দেবগণ, ঋষিগণ এবং অমিততেজ সম্পন্ন রাজগণ এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের বংশবৃত্তান্ত জানিয়া ধারণ করিয়া রাখা সূতের স্বধর্ম বলিয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণ কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মবাদিগণ ইতিহাস ও পুরাণ সম্বন্ধেই সূতের এরূপ অধিকার নির্দেশ করিয়াছেন কিন্তু বেদে সূতের কোন অধিকার নাই।' (বায়ু ১।৩০-৩৩)

মৎস্য পুরাণ (৫৩।৭১) বলেন, 'পুরাতনস্য কল্পস্য পুরাণানি বিদুর্বুধাঃ।' অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ পুরাণকে প্রাচীনকালের বিবরণ বলিয়াই অবগত আছেন।

শ্রদ্ধেয় শ্রীগিরীন্দ্র শেখর বসু মহাশয় তাঁর 'পুরাণ প্রবেশ' গ্রন্থে বলেছেন, 'সংস্কৃতে ইতিহাস অর্থে হিস্টরি নহে। পুরাণ শব্দই হিস্টরি অর্থে প্রযুক্ত হওয়া উচিত। যস্মাৎ পুরা হ্যনিতীদং পুরাণং তেন তৎ স্মৃতম্ অর্থাৎ যেহেতু ইহা পুরাকালে জীবিত ছিল অর্থাৎ যেহেতু পুরাকালে এই প্রকার ঘটনা ঘটিয়াছিল সেইজন্য ইহার নাম পুরাণ। পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ, সৃষ্টি, প্রলয়, বংশ, বংশানুচরিত ও মন্বন্তর অর্থাৎ বিভিন্ন ঘটনার

কাল নির্দেশে পুরাণ যে হিস্টরি তাহাই প্রমাণিত করিতেছে। পুরাণের অত্যুক্তি ও রূপক পুরাণকারের বিশেষ উদ্দেশ্য প্রসূত ও বিশেষ বিশেষ সূত্রানুমোদিত ; পুরাণ যথার্থ ও বিশ্বাসযোগ্য হিস্টরি বলিয়া গণ্য হইবার পক্ষে এগুলি কোন বাধা নহে ; সূত্রানুযায়ী ব্যাখ্যা করিলে দেখা যাইবে যে পুরাণে কোন অবাস্তব বা মিথ্যা কথা নাই।'

পুরাণ যদি ইতিহাস হয় তাহলে বেদ সৃষ্টির আগে থেকে তা সংগৃহীত হত। কারণ আমরা জানি বেদ একটি সভ্য জাতির সম্মিলিত জ্ঞানভাণ্ডার। খুব স্বভাবতই তা সৃষ্টি হয়েছে সেই জাতি সভ্য হয়ে ওঠার পরে। কিন্তু পুরাণ যদি সেই জাতির ইতিহাস হয় তাহলে তা বেদ সৃষ্টির আগেই থাকবে। এর কি কোন প্রমাণ আছে ? বায়ুপুরাণের (১।৬১) শ্লোকে পাওয়া যায়,

'প্রথমং সর্ব্বশাস্ত্রানাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্ ।
অনন্তরঞ্চ বক্তে্ভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃ সৃতাঃ ॥'

'অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রমধ্যে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অগ্রে পুরাণ ব্যক্ত হইয়াছিল। অনন্তর তাঁহার মুখসমূহ হইতে বেদ নিঃসৃত হইল।' তাহলে দেখা যাচ্ছে পুরাণের জন্ম হয় বেদেরও পূর্বে এবং তাই স্বাভাবিক।

পুরাণ নিঃসন্দেহে ইতিহাস, তবে তা শুধুমাত্র পৃথিবীবাসী মানুষের ইতিহাস নয়। পুরাণের ব্যপ্তি দুইগ্রহ জুড়ে। পুরাণ ভিনগ্রহবাসী দেবতাদের ইতিহাস, সেই সঙ্গে পৃথিবীতে উপনিবেশ স্থাপনকারী দেবতা ও তাদের উত্তরাধিকারী মনুর সন্তান মানবদেরও ইতিহাস।

আমার প্রথম গ্রন্থে বলেছিলাম যে দেবতারা বেদ নিয়ে এসেছিলেন এই পৃথিবীতে তাদের নিজেদের গ্রহ থেকে। বেদ ইতিহাস ও না ভূগোল গ্রন্থও না। কিন্তু পণ্ডিতরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে বেদে ভারতের আর্যাবর্তের ভৌগোলিক বিবরণ আছে। আমরা জোর দিয়ে বলছি বেদে ইতস্ততঃ চড়ানো যে সব ভৌগোলিক বিবরণ আছে তা এই পৃথিবীর নয়, তা ভিনগ্রহের।

বেদ যদি ভিনগ্রহ থেকে আমদানী করা হয়ে থাকে তাহলে বেদপূর্ব পুরাণও আমদানী হয়েছিল ভিনগ্রহ থেকে। কিন্তু পুরাণ যেহেতু ইতিহাস তা বহতা নদীর মত চলতে শুরু করেছিল। পুরাণকাররা up to date করেছিলেন পুরাণগুলিকে। পুরাণ থেকে লেখা হল পুরাণ-সংহিতা ; পঞ্চলক্ষণযুক্ত পুরাণ কালক্রমে হয়ে উঠল দশলক্ষণ যুক্ত।

অনেকে মনে করেন আঠারোখানি পুরাণের আগে একটি আদি পুরাণ ছিল। তাঁদের মতে এই আদি পুরাণ থেকেই অন্যান্য পুরাণের সৃষ্টি হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণে আছে, 'অনন্তর পুরাণার্থবিশারদ 'ভগবান বেদব্যাস, আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও

কল্পশুদ্ধির সহিত পুরাণসংহিতা প্রণয়ণ করিলেন। বেদব্যাসের অপর একজন শিষ্য ছিলেন। তিনি সূত জাতীয় ও রোমহর্ষণ নামে বিখ্যাত। মহামুনি বেদব্যাস তাঁহাকে পুরাণসংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন। লোমহর্ষণের ছয় জন শিষ্য ছিলেন। তাঁদের নাম সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রয়ু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি। কাশ্যপ অর্থাৎ অকৃতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন, ইঁহারা রোমহর্ষণ হইতে প্রাপ্ত মূল সংহিতা অবলম্বন করিয়া প্রত্যেকে এক একখানি পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করেন। মুনে, ঐ চারি সংহিতার সারোদ্ধার করিয়া আমি এই বিষ্ণুপুরাণ সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছি।'

'অমর কোষ বর্ণিত পঞ্চলক্ষণযুক্ত প্রামাণিক পুরাণ হচ্ছে বিষ্ণুপুরাণ। এর প্রামাণিকতা আচার্য রামানুজ, শ্রীধর স্বামী ও ডঃ এচ. এচ উইলসনও স্বীকার করেছেন।' (অতুল সুর : ইতিহাস ও মহাকাব্যের সীমানায়)

আমরা স্বভাবতই আমাদের আলোচনার জন্য বিষ্ণুপুরাণের উপরই নির্ভর করেছি।

পৌরাণিক কালদণ্ড

ইতিহাস লিখতে গেলেই প্রয়োজন হয় কাল নির্দেশের। আধুনিক ইতিহাসের সংজ্ঞা হচ্ছে 'সভ্যতার পথে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মানব সমাজ কিভাবে অগ্রসর হইয়াছে তাহাই হইল ইতিহাসের বিষয়বস্তু। মানুষ ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর মধ্যে আদান প্রদান, সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের ফলে বৃহত্তর মানব-সমাজের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক বিবরণই হইল ইতিহাস'

তাই ধারাবাহিকতা ও সময়ানুক্রম (chronology) হচ্ছে ইতিহাসের মূল সূত্র। সময়ানুক্রম তথা ধারাবাহিকতা না থাকলে ইতিহাস যোগসূত্রহীন কতকগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনার বিবরণে পরিণত হয়। তখন তাকে আর কোনমতে ইতিহাস বলা চলে না।

পুরাণকাররা একথা ভালভাবেই জানতেন। পুরাণের পঞ্চ লক্ষণের মধ্যে মন্বন্তর একটি। মনুরা বিখ্যাত নরপতি ছিলেন এবং এঁদের রাজত্বকালকে মন্বন্তর বলা হত। মন্বন্তর কালনির্দেশক। বায়ুপুরাণ বলেন :

'মন্বন্তর প্রসঙ্গেন কালজ্ঞানঞ্চ কীর্ত্তিতে।' ১।৭৯ অর্থাৎ, মন্বন্তর প্রসঙ্গে কালজ্ঞানও বিবৃত করা হইয়াছে। পৌরানিক কাল নির্দেশ অবশ্যই আমাদের আধুনিক কালের কাল নির্দেশের মত নয়। ইংরেজী মতে যীশুখ্রীষ্টের জন্মবৎসরকে স্থির-বিন্দু কল্পনা করে কাল নির্দেশ করা হয়। বায়ু পুরাণে আছে মহাদেব কল্পমুখ নির্দিষ্ট করলেন ও মনুগণনা আরম্ভ করালেন। স্বায়ম্ভুব মনুর আরম্ভ কল্পমুখ ও কৃতযুগমুখ হল ও তা স্থিরবিন্দু নির্দিষ্ট হল। হিন্দু পুনরাবর্তনে বিশ্বাসী। হিন্দুমতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় পর্যায়ক্রমে ঘটে চলে। 'সসর্জ্জ সৃষ্টিং তদ্রূপাং, কল্পাদিষু যথা পুরা। বায়ু ৬।৩৫

অর্থাৎ, ব্রহ্মা পূর্ব পূর্ব কল্পে যেরূপ সৃজন করেছিলেন সেই রূপানুযায়ী সৃষ্টি করেন।
বিষ্ণু পুরাণ বলেন :

'তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্ সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে।

তান্যেব তে প্রপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ॥ ১।৫।৫৯

অর্থাৎ, তাহাদের মধ্যে পূর্বসৃষ্টিতে যাহার যে কর্ম নির্দিষ্ট ছিল পুনঃ পুনঃ সৃজ্যমান হইয়া তাহার সেই কর্মপ্রাপ্তিই ঘটে।

শ্রীগিরীন্দ্র শেখর বসু মহাশয় তাঁর 'পুরাণ প্রবেশ' গ্রন্থে প্রচুর পরিশ্রম করে পৌরাণিক কালকে আধুনিক কালমানে পরিবর্তিত করেছেন। সেই বিস্তৃত আলোচনা এখানে করা সম্ভব নয়, তার প্রয়োজনও নেই। আধুনিক ঐতিহাসিকরাও পৌরাণিক কালক্রমকে আধুনিক কালক্রমে পরিবর্তিত করেছেন, তবে তা মোটামুটি বিদেশীয় ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত বলে আমরা শ্রীবসুর কালক্রমকে অনুসরণ করছি।

	শ্রীবসুর কালক্রম	আধুনিক ঐতিহাসিকদের কালক্রম
স্বায়ম্ভুব মনু (কল্পারম্ভ)	৫৯৫৮ খ্রী পূঃ	×
প্রাচেতস দক্ষ	৩৮৮৯ " "	×
বৈবস্বত মনু	৩৮১৪ " "	৩১০০ খ্রীঃ পূঃ
যযাতি	৩৭২১ " "	৩০০০-২৭৫০ " "
মান্ধাতা	৩৪৫৮ " "	২৭৫০-২৫৫০ " "
পরশুরাম (জামদগ্ন্য)	২৯৫৮ " "	২৫৫০-২৩৫০ " "
রামচন্দ্র (দাশরথি)	২১২৪ " "	২৩৫০-১৯৫০ " "
কৃষ্ণ	১৪৫৮ " "	১৯৫০-১৪০০ " "
ভারতযুদ্ধ	১৪১৬ " "	১৪০০ " "

ভারতযুদ্ধের কাল আধুনিক ঐতিহাসিকরা যা ধরেছেন শ্রীবসুও প্রায় তাই ধরেছেন; কিন্তু তার পূর্ববর্তী কালক্রম হিসাবের মধ্যে পার্থক্য ঘটেছে। যাহোক এই গ্রন্থের শেষে মনুবংশ ও মনুবংশ থেকে ইক্ষ্বাকুবংশের একটি ধারাবাহিক ও কালানুক্রমিক সারণী যোগ করেছি। এই সারণীটি শ্রী বসুর গ্রন্থ থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রী বসু মানব মানে এক কল্প ধরেছেন ৫০০০ বছরে। মানবমান পিতৃমান ও দেবমান যে পৃথক একথাও তিনি স্বীকার করেছেন। এর একটি সুন্দর ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন পুরাণে মৃত পূর্বপুরুষগণকে পিতৃগণ শব্দে অভিহিত করা

হইয়াছে। পিতৃগণের কালনির্ণয়ে পিতৃমানই প্রশস্ত। এই জন্যই বোধ হয় ইহার পিতৃমান নাম হইয়াছিল। প্রাকৃতিক শক্তিগণকে দেবতা বলায় সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ইত্যাদি ব্যাপার পরিমান করিবার যে যুগ তাহাকে দৈব বলা উপযুক্ত হইয়াছে। জীবিত মানবের ক্রিয়াকলাপ মানুষ মানেই পরিমেয়।' মানব, পৈত্র ও দৈব বর্ষ হিসেব করা হয় এইভাবে :

যুগ	মানব বর্ষ	পৈত্র বর্ষ	দৈব বর্ষ
কৃত বা সত্য	১৭,২৮,০০০	৫৭,৬০০	৪,৮০০
ত্রেতা	১২,৯৬,০০০	৪৩,২০০	৩,৬০০
দ্বাপর	৮,৬৪,০০০	২৮,৮০০	২,৪০০
কলি	৪,৩২,০০০	১৪,৪০০	১,২০০
মোট	৪৩,২০,০০০	১,৪৪,০০০	১২,০০০

কৌতূহলী পাঠক শ্রীবসুর 'পুরাণ প্রবেশ' পড়ে নিতে পারেন।

[illegible]

বিষ্ণুপুরাণ আরম্ভ হচ্ছে এইভাবে : বসিষ্ঠের পৌত্র মুনি শ্রেষ্ঠ পরাশরকে প্রণাম করে তাঁর শিষ্য মৈত্রেয় বললেন, 'গুরুদেব। আপনার নিকট যথাক্রমে অখিল বেদ বেদান্ত এবং সকল ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। হে মুনিবর। আপনার অনুগ্রহে আমি শাস্ত্রে পরিশ্রম করি নাই এ কথা পণ্ডিতেরা বলেন না। এমনকি শত্রুপক্ষেও আমাকে কৃতশ্রম বলিয়া থাকেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ। জগৎ যে রূপে হইয়াছে, পুনশ্চ যে প্রকার হইবে, তোমার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। হে ব্রহ্মন্‌। জগতের উপাদান যাহা, এই চরাচর যাহা হইতে উৎপন্ন, যাহাতে লীন ছিল এবং যাহাতে লয় প্রাপ্ত হইবে; আকাশাদির পরিমান, দেবাদির উৎপত্তি, সমুদ্র পর্ব্বত ও পৃথিবীর স্থিতি, সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহের সংস্থান ও পরিমাণ, দেবতাদিগের বংশ, মনু, মন্বন্তর সকলের বিবরণ, চতুর্যুগবিকল্পিত কল্প, কল্পবিকল্প, কল্পান্তের স্বরূপ, সম্পূর্ণ যুগধর্ম্ম, দেবর্ষি ও রাজা দিগের চরিত্র, ব্যাসদেব কর্ত্তৃক বেদের শাখা প্রণয়ন এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমবাসিগণের ধর্ম্ম সমুদয়, হে মহাভাগ শক্তিতনয়। আপনার নিকট শুনিতে অভিলাষ হয়।'

মৈত্রেয়র কথা থেকে আমরা পুরাণ বা ইতিহাসের সংজ্ঞা পাচ্ছি। এই সংজ্ঞা যে আধুনিক ইতিহাসের সংজ্ঞা থেকে বহু ব্যাপক তা সকলেই স্বীকার করবেন। যাহোক মৈত্রেয়র কথা শুনে পরাশর বললেন, 'হে ধর্ম্মজ্ঞ মৈত্রেয়। পুরাতন বিষয় ভাল স্মরণ করাইলে। পিতামহ ভগবান বসিষ্ঠ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই সকল বিষয় আমার

মনে পড়িল।' এই কথা বলে পরাশর ব্রহ্মার মানসপুত্র পুলস্ত্য তাঁকে যে বর দিয়েছিলেন সে কথারও উল্লেখ করলেন। পুলস্ত্য পরাশরকে বলেছিলেন, 'বৎস! তুমি পুরাণসংহিতার কর্ত্তা হইবে দেবতা ও পরমার্থতত্ত্ব যথাবৎ জানিতে পারিবে এবং আমার প্রসাদে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিধায়ক কর্ম্মে তোমার বুদ্ধি নির্ম্মল অসন্দিগ্ধ হইবে। অনন্তর মৎপিতামহ ভগবান বসিষ্ঠ কহিলেন, পুলস্ত্য তোমাকে যাহা বলিলেন, সমস্ত ঘটিবে। হে মৈত্রেয়! পূর্ব্বে বসিষ্ঠদেব ও বুদ্ধিমান পুলস্ত্য এইরূপে যাহা কহিয়াছিলেন, সম্প্রতি তোমার প্রশ্নে তৎসমস্ত আমার স্মরণ হইল। সেই আমি তোমার জিজ্ঞাসিত সেই পুরাণসংহিতা সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি। যথাবৎ শ্রবণ কর।'

দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের মূলীভূত জগন্ময় পরমাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার' করে মুনি পরাশর সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন। এই সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আমরা একটু বিশদভাবে আলোচনা কবতে চাই। কারণ এই সৃষ্টিরহস্য উন্মোচনে আমাদের পূর্বপুরুষরা যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন তা বিস্ময়কর। আজ আধুনিক বিজ্ঞানীরা যে সৃষ্টিতত্ত্ব খাড়া করেছেন বহু বহু যুগ আগে আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষরা তার থেকেও অনেক গভীরভাবে সে রহস্য উপলব্ধি করেছিলেন।

রাতের আকাশের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই সোনার চুমকির মত গ্রহ-নক্ষত্রের দল আসর জাকিয়ে বসে আছে। এই অপার্থিব দৃশ্য আমাদের মুগ্ধ করে, বিস্মিত করে। তারপরই প্রশ্ন জাগে মনে ওরা কারা? কোথা থেকে এল? কে ওদের সৃষ্টি করল? প্রাচীন ঋষিরা এর ব্যাখ্যা করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানীরাও এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবী থেকে শুরু করে বহু দূর দূর প্রান্তের নক্ষত্রলোক সবই রয়েছে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কত বড তা বুঝতে চেষ্টা করলেও হয়ত তা বুঝতে পারব না কারণ আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের পক্ষে সেই বিশালত্বের ধারণা করাও বোধ হয় সম্ভব নয়। আমাদের সূর্য একটি নক্ষত্র। এই সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে নটি গ্রহ (এখন দশটি, কারণ প্লুটোর কক্ষপথের বাইরে আর একটি ছোট গ্রহের অস্তিত্ব আছে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা)। এই বিশাল জগতকে বলা হয় সৌরমণ্ডল। এই সৌরমণ্ডল আবার একটি নক্ষত্র জগতের অন্তর্ভুক্ত এই নক্ষত্র জগতের নাম হচ্ছে milky-way galaxy বা ছায়াপথ, প্রাচীন ঋষিরা যার নাম দিয়েছিলেন আকাশ গঙ্গা। আধুনিক বিজ্ঞানীদের হিসের মত এই ছায়াপথে আছে প্রায় দশ হাজার কোটি নক্ষত্র। অর্থাৎ সূর্যের থেকে ছোট বড় দশ হাজার কোটি নক্ষত্র রয়েছে ছায়াপথে। আবার এই রকম কোটি কোটি ছায়াপথের সমষ্টি হচ্ছে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। শুধু তাই নয় ছায়াপথগুলির মধ্যে রয়েছে কোটি কোটি মাইলের ব্যবধান। অকল্পনীয় সে বিশালতা। এই বিশালতা সম্বন্ধে ঋষিদের ও স্পষ্ট ধারণা ছিল। বিষ্ণুপুরাণ বলেন, 'ব্রহ্মাণ্ডের

বিবরণ এই কপিথের বীজ যেমন চারিদিকে সম্পূর্ণ আবৃত থাকে, সেইরূপ এই চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক জগৎ পার্শ্বদ্বয়, ঊর্দ্ধ ও অধঃ এই চারিদিকেই অণ্ডকটাহ দ্বারা সমাবৃত। মৈত্রেয়! সেই অণ্ড দশগুণ অধিক জল দ্বারা আবৃত। এই সমস্ত জলাবরণ, বহির্ভাগে অগ্নিদ্বারা বেষ্টিত। হে মৈত্রেয়! বহ্নি বায়ুদ্বারা ও বায়ু আকাশ দ্বারা আবৃত। আকাশ তামস অহঙ্কার দ্বারা এবং তামস অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব দ্বারা পরিবেষ্টিত। মৈত্রের! অসীম সপ্ত আবরণই উত্তরোত্তর দশগুণ বৃদ্ধিভাব প্রাপ্ত। প্রকৃতি আবাব মহত্তত্ত্বকেও আবৃত করিয়া অবস্থিত। সেই অনন্তের (সর্ব্বগত প্রকৃতির) অন্ত অর্থাৎ নাশ এবং সংখ্যা নাই; যেহেতু তাহা অনন্ত (নিত্য), অসংখ্যাত, অপ্রমাণ এবং সর্ব্বব্যাপী বলিয়া প্রসিদ্ধ। হে মুনে! সেই পরা প্রকৃতি সমস্ত কার্য্যের হেতুভূতা। তাহাতে এইরূপ সহস্র সহস্র অযুত এবং এইরূপ কোটি কোটি শত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে।' অর্থাৎ এক একটি ছায়াপথকে ব্রহ্মাণ্ড বলা হচ্ছে তাদের সমষ্টিগত রূপই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড।

এই মহাজাগতিক দূরত্ব মাপতে আমাদের পার্থিব মাপকাঠি অর্থাৎ কিলোমিটার অচল। তাই মহাজাগতিক দূরত্ব মাপতে ব্যবহার করা হয় 'আলোক-বর্ষ' নামক মাপকাঠি। আলো এক বৎসরে যত পথ পাড়ি দিতে পারে তাই হচ্ছে আলোক বর্ষ। (আলো প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১,৮৬,০০০ মাইল বা ৩,০০,০০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে)।
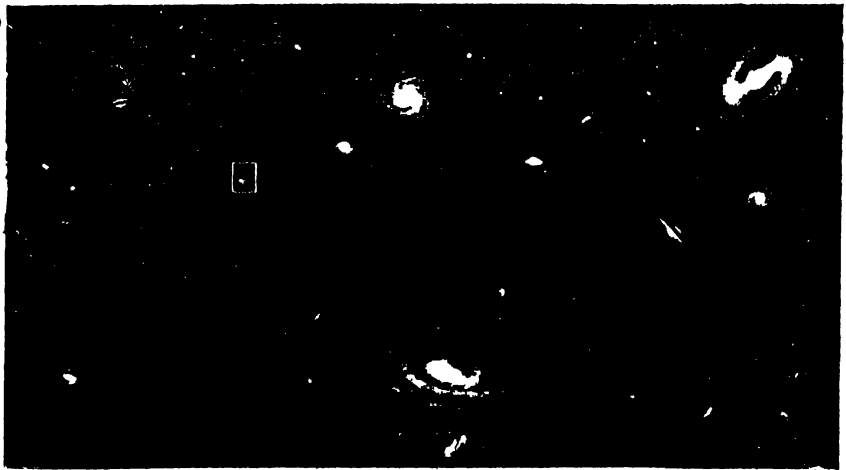
Milkyway Galaxy (□ চিহ্নিত জায়গাটি)

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি গ্যালাক্সী বা ছায়াপথের মধ্যে পৃথিবী থেকে দেখা যায় সামান্য কয়েকটি। আমাদের সব থেকে কাছের গ্যালাক্সী হচ্ছে এ্যাণ্ড্রোমিডা।

আমাদের নিজেদের গ্যালাক্সী বা ছায়াপথের আয়তন হচ্ছে: লম্বা: ১ লক্ষ আলোকবর্ষ, চওড়া: ছ'হাজার আলোকবর্ষ। সূর্য এর কেন্দ্র থেকে প্রায় ২৬ হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত।

সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখায় আধুনিক বিজ্ঞানীরা একের পর এক তত্ত্ব খাড়া করেছেন। ১৯২৯ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হাব্‌ল (Hubble) একটি সূত্র আবিষ্কার করলেন। এই সূত্র অনুযায়ী যে গ্যালাক্সী অন্যান্য গ্যালাক্সী থেকে দ্রুতবেগে দূরে অপসৃয়মান তার বর্ণালীর (Spectrum) লাল-অভিসরণ (Red Shift) তত বেশী। লাল অভিসরণের তাৎপর্য হচ্ছে যে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেড়ে যাওয়া। অর্থাৎ গ্যালাক্সীর অপসরণ বেগ যত বেশী লাল-অভিসরণের মাত্রাও তত বেশী। বিজ্ঞানীরা একেই বলেন 'ডপলার এফেক্ট'।

একদল বিজ্ঞানী হাব্‌ল-এর সূত্র ধরে বললেন যে কোটি কোটি ছায়াপথ তাদের আভ্যন্তরীণ অগণিত অতিকায় নক্ষত্রজগৎ নিয়ে অকল্পনীয় বেগে (আলোর গতির প্রায় অর্ধেক বেগে অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ৯৩ হাজার মাইল বা ১৫০,০০০ কিলোমিটার বেগে) মহাশূন্যের চারিদিকে ছুটে চলেছে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। একটি বেলুনের গায়ে কিছু রঙিন ফুটকি এঁকে তারপর যদি বেলুনটাকে ক্রমশ: ফোলাতে শুরু করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে ওই ফুটকিগুলো একে অন্যের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। ফুটকিগুলো এখানে এক একটি গ্যালাক্সী। (নিচের ছবিটি লক্ষ্য করুন) বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বের নাম দিলেন সম্প্রসারণশীল বিশ্বের মতবাদ বা Expanding Universe theory. এই তত্ত্বেরই আর এক নাম 'Big Bang তত্ত্ব।

George Gamow তাঁর 'The Creation of the Universe' গ্রন্থে বলেছেন যে হাব্‌ল-এর আবিষ্কার বিশ্ব-রহস্য জানবার পথে আমাদের একধাপ এগিয়ে দিয়েছে। তিনি আরো বলেছেন, 'with the new broadening of horizons a completely new picture emerged; the entire space of the Universe populated by billions of galaxies, is in a state of rapid expansion,

with all its members flying away from one another at high speed.'

V. Komarov তাঁর 'This Fascinating Astronomy' গ্রন্থে এই সম্প্রসারণশীল বিশ্ব তত্ত্বকে এই শতাব্দীর সবথেকে বিস্ময়কর আবিষ্কার বলে অভিহিত করেছেন।

কেন এই বিশ্ব সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে এ কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১৯৩০ সালে বেলজিয়ান জ্যোতির্বিজ্ঞানী Georges Lemaitre বললেন ১০০০ কোটি বছর আগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তু একটি আদিম পরমাণুতে (primeval atom) পর্যবসিত ছিল ; এর নাম দিলেন তিনি 'Super dense cosmic egg'। তিনি বললেন তারপর একদিন সেই মহাজাগতিক অণ্ডটি প্রচণ্ড নিনাদ সহ আকস্মিক ভাবে বিস্ফোরিত হল। তারই ছিন্নভিন্ন দেহ থেকে সৃষ্টি হল কোটি কোটি ছায়াপথ এবং তারা অকল্পনীয় বেগে ছুটতে শুরু করল মহাবিশ্বের দিকে দিকে। সৃষ্টি হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

George Gamow বললেন, 'If the universe is now expanding, it must have been once upon a time in a state of high compression.'

Komarov বললেন, 'It is based on the principle assumption that the Metagalaxy (universe) emerged about 10 billion years ago as a result of a great cosmic explosion of a compact clot of super-dense matter.'

অর্থাৎ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্বমুহূর্তে সৃষ্টি হয়েছিল একটি মহাজাগতিক অণ্ড। পুরাণকার এই সৃষ্টিপূর্ব মুহূর্ত বর্ণনা করলেন এইভাবে : হে ব্রহ্মণ। আকাশ, বায়ু, তেজ, সলিল ও পৃথিবী উত্তরোত্তর শব্দাদি গুণযুক্ত। ইহারা শান্ত, ঘোর, মূঢ় হওয়ায় ইহাদিগকে বিশেষ কহা যায়। ইহারা নানা বীর্য্য ও পৃথগ্‌ভূত বলিয়া সংহতি বিনা সম্পূর্ণ মিলন না হওয়ায় প্রজা সৃষ্টি করিতে অক্ষম। অন্যান্য সংযোগ এবং পরস্পর সমাশ্রয় জন্য সম্পূর্ণ ঐক্যপ্রাপ্ত এবং এক-সঙ্ঘাতের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পুরুষের অধিষ্ঠান এবং প্রধানের অনুগ্রহবশত ঐ মহদাদি বিশেষান্ত সকলে (অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব হইতে মহাভূত পর্যন্ত) মিলিত হইয়া অণ্ড (ব্রহ্মাণ্ড) উৎপাদন করে।' (বিষ্ণুপুরাণ ১ম : ২য় অধ্যায়)।

সহজ কথায় বলতে গেলে এই বিশ্ব প্রথমে ছিল অতি সূক্ষ্ম 'আকাশ'ময়। তারপর আকাশময় আবরণের মধ্যে সৃষ্টি হল 'বায়ু'। তারমধ্যে জন্ম নিল 'তেজ' রূপী পদার্থ, তার ভিতরে জন্ম নিল 'জল'। জলের ভিতর স্থূলতম 'ক্ষিতি' উৎপন্ন হল। ক্ষিতি অপ (জল), তেজ, মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম বা আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত দিয়ে তৈরী

হল একটি অণ্ড। শ্রীগিরীন্দ্র শেখর বসু 'পুরাণ প্রবেশ' গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'পঞ্চ মহাভূত আমাদের পরিচিত মৃত্তিকা জল ইত্যাদি নহে, তবে গুণতারতম্যানুসারে এই সকল পরিচিত প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের নামানুযায়ী পঞ্চ মহাভূতের নামকরণ হইয়াছে। পঞ্চমহাভূতজাত অণ্ড প্রথমে সূর্যের জ্যোতিঃ সম্পন্ন ছিল। এই অণ্ডের অধিষ্ঠাতৃদেবতার নাম হিরণ্যগর্ভ। জ্যোতির্ময় অণ্ড হইতে ক্রমে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল পদার্থ সমূহ প্রকাশ পাইতে লাগিল ও অণ্ডমধ্যে সূর্য প্রভৃতি গ্রহ তারকা ও আমাদের পৃথিবী সৃষ্ট হইল। মহাভূতগুলি যেরূপ ক্রমশ সূক্ষ্ম হইতে স্থূলরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেইরূপ তাহাদের পঞ্চীকৃত সংমিশ্রণে উৎপন্ন প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকাশ প্রভৃতি জড় দ্রব্য সূক্ষ্ম হইতে স্থূলরূপ ধারণ করিল।'

আজকের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে 'the chemical constitution of the universe is surprisingly unifrom.' তাহলে প্রাচীন ঋষিরা যে বলেছিলেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে পঞ্চমহাভূতের সংযোগে তা ঠিকই। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর মধ্যেই এই সমতা দেখা যাবে। শুধু তাই নয় এই পঞ্চভূত সূক্ষ্ম অবস্থা থেকে স্থূল রূপ পেয়েছে।

পঞ্চভূতাত্মক অণ্ড সূর্যের জ্যোতিঃ সম্পন্ন। এ কথাটা কি অলঙ্কার? একদিকে অলঙ্কার অন্য দিকে একটি বৈজ্ঞানিক সত্যের দিকে ইঙ্গিত। George Gamow তাঁর 'The Creation of the Universe' গ্রন্থে সৃষ্টির সময়কার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'During this epoch ordinary matter did not count, and the main role was played by intensely hot radiation (radiation means light visible and invisible).' তিনি এই প্রসঙ্গে আরো লিখেছেন, One may almost quote the Biblical statement : 'In the beginning there was light', and plenty of it! But of course, this 'light' was composed mostly of high-energy x-rays and gamma rays.'

সূক্ষ্ম থেকে স্থূলরূপ সূর্য, গ্রহ তারকা প্রভৃতি সৃষ্টি হল। এ কথাটার মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছে এক বৈজ্ঞানিক সত্য। আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলেন যে মহাজাগতিক অণ্ডটি তৈরী হয়েছিল 'পারমানবিক তরল' পদার্থে। অর্থাৎ তখন পরমাণুও (পরমাণুর অংশ হচ্ছে নিউট্রন, প্রোটন ও ইলেকট্রন) আস্ত ছিল না। পরে এই পারমানবিক পদার্থগুলি একত্রিত হয়ে গড়ে উঠল পরমাণু তা থেকে অণু এবং এইসব সূক্ষ্মভূত থেকে সৃষ্টি হল স্থূল পদার্থের।

প্রাচীন ঋষিদের সৃষ্টিতত্ত্ব আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আলোয় সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ হয়ে যাবে। এখানে তাই আমরা সংক্ষেপে

সূত্রোল্লেখ করেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি। ঋগ্বেদে সৃষ্টিপূর্ব অবস্থা ও সৃষ্টি রহস্য এমন কবিত্বময় ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে এখানে তা তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না।

'সেকালে যা নেই তাও ছিল না, যা আছে তাও ছিল না। পৃথিবী ছিল না, অতিদূর বিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল? তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না কেবল সে একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মমাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত হয়ে জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সর্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিকে জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তুদ্বারা সে সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সে এক বস্তু জন্মিলেন। সর্বপ্রথম মনের উপর কামের আবির্ভাব হল, তা হতে সর্বপ্রথম উৎপত্তির কারণ নির্গত হল। বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধিদ্বারা আপন হৃদয়ে পর্যালোচনাপূর্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তিস্থান নিরূপণ করলেন। রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হলেন, মহিমা সকল উদ্ভব হলেন। ওদের রশ্মি দুপার্শ্বে ও নিম্নের দিকে এবং উর্ধদিকে বিস্তারিত হল। নিম্নদিকে স্বধা রইল, প্রয়তি উর্ধদিকে রইলেন। কেউ বা প্রকৃত জানে? কেউ বা বর্ণনা করবে? কোথা হতে জন্মিল? কোথা হতে এ সকল নানা সৃষ্টি হল? দেবতারা এ সমস্ত নানা সৃষ্টির পর হয়েছেন, কোথা হতে যে হল, তা কেউ বা জানে? এ নানা সৃষ্টি যে কোথা হতে হল, কার থেকে হল, কেউ সৃষ্টি করেছেন, কি করেন নি, তা তিনিই জানেন, যিনি এর প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন। অথবা তিনিও না জানতে পারেন।' (ঋগ্বেদ ১০। ১২৯। ১-৭ হরফ) দেবীপুরাণ আরো স্পষ্ট ভাষায় বলেন :

'হে বরাননে। আমি জগৎ স্রষ্টা, তুমি সৃষ্টি। বাক সৃষ্টিকারিণী বলিয়া তুমি ক্রিয়া নামেও অভিহিতা। তুমি ব্রহ্মার সৃষ্টিকারিণী মূল প্রকৃতি। হে প্রিয়ে। ব্রহ্মা আমার নিমেষের কতিপয় ভাগৈকভাগ জীবিত থাকিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হন এবং সেই মূল প্রকৃতিতেই লীন হইয়া থাকেন। আমি তদীয় কপাল গ্রহণ করিয়া অসীম পথে ক্রীড়া করিয়া থাকি। এইরূপ বহু কোটি কোটি ব্রহ্মকপালে আমার এই মালা নির্মিত হইয়াছে। হে বরবর্ণিনি। বিষ্ণুর (সূর্যের) অঙ্গ প্রত্যঙ্গও এই মালার সঙ্গে গ্রথিত আছে। যখন কালবশে সমস্ত জগৎই মায়ার উদরে বিলীন হয় তখন হে ভবানি। আমি ঈশ্বরতত্ত্বে সুখে নিরত থাকি।

'ব্রহ্মার কোটিমুণ্ড নির্মিত (ছায়াপথ সমূহ) সুভৈরব মালা ধারণ করিয়া দ্বাদশলোচন অনন্ত-ভৈরব মহাকাল মূর্তি ধারণ করিয়া স্ববীর্যশালী মাতৃগণযুক্ত হইয়া

একাকী এই আকাশে ক্রীড়া করি। হে মহেশ্বরী! দ্বি-পরার্দ্ধ-বর্ষাত্মক কাল অতিক্রান্ত হইলে (অর্থাৎ ব্রহ্মার জীবৎকাল), ঘোররূপী শক্তিগণের সহিত ক্রীড়া সমাপন করিয়া ভাবভূতময় বিশ্ব অনন্ত ভক্ষ্যস্বরূপ উদরস্থ করিয়া যোগনিদ্রাবলম্বনে শক্তিপর্য্যঙ্কে শয়ন করি।

'অনন্তর পুনরায় দিব্যনেত্র উদিত হইলে ও তমোরাশি বিনাশ প্রাপ্ত হইলে আমি স্বশক্তি প্রবুদ্ধ হই, তৎপরে প্রজাপতি উৎপাদনে চিন্তা হয়। মায়া হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় জগৎই মদীয় যোগসম্ভূত।'

'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়' চক্রে আবর্তনশীল এই ঋষিদের বিশ্বাস। আধুনিক বিজ্ঞানীরা কি এই চক্রে বিশ্বাস করেন?

১৯৬৫ সালে আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক Allan Sandage এক তত্ত্ব খাড়া করলেন ' Big Bang' তত্ত্বকে মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে ধরে নিয়ে। এই নতুন তত্ত্বের নাম হচ্ছে 'Pulsating Universe' বা 'স্পন্দনশীল-বিশ্ব তত্ত্ব'। Allan Sandage এর মতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে আবার নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি বলেন আমাদের বর্তমান ব্রহ্মাণ্ডের বয়স ১০০০ কোটি বছর এবং এখন চলছে সম্প্রসারণের কাল। এইভাবে আরও চলবে ৩০০০ কোটি বছর। এরপর এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ছুটে চলার শক্তি হবে নিঃশেষিত, তখন তা আবার শুরু করবে সঙ্কুচিত হতে; এইভাবে আবার তৈরী হবে একদিন সৃষ্টি-পূর্ব-সেই cosmic egg বা মহাজাগতিক অণ্ড। যা বিস্ফোরিত হয়ে আবার সৃষ্টি হবে নতুন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। এইভাবে আবর্তিত হবে কাল চক্র।

সৃষ্টির পর একদিন আসে প্রলয়। আমাদের পূর্বপুরুষরা সেই প্রলয়েরও চমক-প্রদ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

আমরা আগের আলোচনা থেকে দেখেছি যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়, তারপর স্থিতিকালের পর আবার ধ্বংস হয়। এ ব্যাপারে প্রাচীন ঋষি ও আধুনিক বিজ্ঞানী একমত। এই যে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস একে বলে, প্রাকৃত প্রলয়। এই প্রাকৃত প্রলয় হয় ব্রহ্মার জীবৎকালের শেষে। এইসময় স্থূল পঞ্চমহাভূত তাদের স্থূলত্ব হারিয়ে ফেলে ক্রম-পর্যায়ে এবং সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূতে পরিণত হয়। বিষ্ণুপুরাণ এই প্রলয়ের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে:

'ভগবানের ইচ্ছায় প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ জলসমূহ পৃথিবীর গন্ধস্বরূপ গুণকে গ্রাস করিয়া থাকে। যখন পৃথিবী হইতে সমস্ত গন্ধ জলদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যায়, তখন পৃথিবী বিলয় প্রাপ্ত হয়। গন্ধতন্মাত্র বিনষ্ট হইলে, পরে পৃথিবী জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। রস হইতে জল উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং জলকে রসাত্মক জানিবে। সেই সময়ে জলসমূহ প্রবৃদ্ধ হইয়া, অত্যন্ত বেগে মহাশব্দ

করিতে করিতে সমস্ত ভুবনকে প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হয়। তৎপরে জলের গুণ যে রস, অগ্নি তাহাকে শোষণ করিতে আরম্ভ করে; কালক্রমে অগ্নিকর্তৃক শোষিত হইয়া রসতন্মাত্র বিনষ্ট হইলে, জল সমূহ বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং সেই রসহীন জলসমূহ তেজের মধ্যে প্রবেশ করে। তৎপরে তেজ ক্রমশঃ অতিশয় প্রবলরূপ ধারণ করিয়া সমস্ত ভুবনে ব্যাপ্ত হয়। (একি রেডিয়েশান বা তেজস্ক্রীয়তা ?) সেই অগ্নি, সমস্ত ভুবনের সারভাগ শোষণ করত নিরন্তর তাপ প্রদান করে। উর্দ্ধ অধঃ সমস্ত প্রদেশই যখন অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়, তখন বায়ু সমস্ত তেজের আধার প্রভাকরকে গ্রাস করিয়া থাকে। তেজঃসমূহ বিনষ্ট হইলে সমস্ত ভুবনই বায়ুময় হইয়া উঠে এবং তেজসকল হৃতরূপ হইয়া প্রশান্ত হয়; তখন কেবল প্রবল বায়ুই চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হয়। সেই তেজঃসমূহ বায়ুমধ্যে প্রবেশ করিলে সমস্ত ভুবনই অন্ধকারময় হইয়া যায়। তৎপরে সেই প্রচণ্ড বায়ু আপনার উৎপত্তিবীজ আকাশকে অবলম্বন করিয়া দশদিকে প্রবাহিত হইয়া বেড়ায়। (এই বায়ু কি cosmic cloud ? বা মহাজাগতিক মেঘ ?)। ক্রমে বায়ুর গুণ যে স্পর্শ, আকাশ তাহাকে গ্রাস করে ও বায়ু শান্ত হইয়া যায় এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও মূর্ত্তিহীন আকাশ দ্বারাই এই সমস্ত লোক পরিপূর্ণ থাকে। তখন একমাত্র শব্দই সমস্ত আকাশ মণ্ডলকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করে। তখন অহঙ্কারতত্ত্ব আকাশের গুণ শব্দ এবং ভৌতিক ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রাস করে। ক্রমে অহঙ্কারতত্ত্বও বুদ্ধিস্বরূপ মহত্তত্ত্বে বিলয়প্রাপ্ত হইবে এবং কালে বুদ্ধিতত্ত্বও স্বীয় কারণ প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যাইবে। এইরূপে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পর্যন্ত সমস্ত জগৎ আপন আপন প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যাইবে। হে মহামতি মৈত্রেয়! সমস্ত পদার্থকে আবৃত করিয়া এই যে ভূমণ্ডল প্রকাশ পাইতেছে, ইহা জলমধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে।'
(বিষ্ণু ৬।১২-৩০)

এই প্রাকৃত প্রলয় ছাড়া আর এক ধরণের প্রলয়ের কথাও পুরাণে বলা হয়েছে। এই প্রলয় ঘটে এক একটি কল্প অর্থাৎ ব্রাহ্মদিনের শেষে। এই প্রলয়ের নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। সৃষ্টির ৪৩২ কোটি বৎসর পরে ঘটে এই প্রলয়। বিষ্ণুপুরাণ থেকে এই প্রলয়ের বর্ণনা দিচ্ছি;

'হে মৈত্রেয়! তদনন্তর ব্রাহ্ম নামে নৈমিত্তিক প্রলয় হইয়া থাকে। সেই প্রলয়ের স্বরূপ অত্যন্ত উগ্র, তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর; চতুর্যুগসহস্রের পর মহীতল ক্ষীণ হইয়া আসিলে, অত্যন্ত কঠোর ও শতবর্ষ অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাহাতে অল্পসার যাবতীয় পার্থিব জীবসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর সেই অব্যয় আত্মা ভগবান বিষ্ণু, রুদ্ররূপ ধারণ করিয়া প্রলয়ের জন্য আপনাতে প্রজাসমূহকে বিলয় করিবার চেষ্টা করেন। তৎপরে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! রুদ্ররূপী সেই ভগবান বিষ্ণু, সূর্যের সপ্তবিধ রশ্মিতে অবস্থান পূর্বক যাবতীয় জল সমূহকে পান

করিয়া থাকেন। যাবতীয় প্রাণী ও ভূমিগত জলসমূহ পান করিয়া সেই মহাপুরুষ পৃথিবীতল শোষণ করিতে করিতে নদী বা সমুদ্র, শৈল অথবা শৈল প্রস্রবন কিংবা পাতালে যে সমস্ত জল আছে; তাহাও শোষণ করিলেন। তৎপরে জলপান দ্বারা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া সূর্যের সেই সপ্তরশ্মি সাতটি সূর্য্যরূপে প্রকাশ পাইবে। প্রদীপ্ত সেই সপ্তভাস্কর ঊর্দ্ধ এবং অধঃস্থিত যাবতীয় ভুবনকে অশেষরূপে দগ্ধ করিবেন। তৎপরে সেই প্রদীপ্ত ভাস্কর সমূহ দ্বারা দগ্ধ হইয়া ত্রিভুবন জলাভাবে শুষ্ক হইয়া যাইবে। সেই সময় ত্রিভুবনস্থিত যাবতীয় বৃক্ষাদি বিশুষ্ক হইয়া যাইয়া একমাত্র বসুধা কূর্ম্ম-পৃষ্ঠের আকারে প্রতিভাসমান হইবে। তৎপরে সমস্ত সংহার করিতে উদ্যত ভগবান বিষ্ণু, অনন্তদেবের নিশ্বাস-সম্ভূত কালাগ্নি স্বরূপে পাতাল সমূহকে ভস্ম করিবেন। তৎপরে সেই কালানল, সমস্ত পাতালখণ্ড দগ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধগামী হইয়া পৃথিবীতলকে ভস্মসাৎ করিবে। তাহার পর জাজ্বল্যমান সুদারুণ সেই অনল ভুবর্লোকসমূহকে দগ্ধ করিয়া স্বর্লোক ভস্মসাৎ করিবে। (অর্থাৎ গ্রহ-উপগ্রহগুলি ভস্মিভূত হবে)। প্রখর কালানলতেজোবিনষ্ট সমস্ত চরাচর ত্রিভুবন সেই সময়ে একখানি ভর্জ্জনকটাহের ন্যায় বোধ হইবে।'

এই নৈমিত্তিক প্রলয়ে স্থূল পদার্থ disintegrate হয়ে সূক্ষ্ম পদার্থ প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রনে পরিণত হচ্ছে না। এখানে সূর্য বিশাল আকার ধারণ করে একটি সৌরমণ্ডলকে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। অর্থাৎ নৈমিত্তিক প্রলয় প্রাকৃত প্রলয়ের মত সর্বধ্বংসী নয়। এ শুধু একটি সৌর মণ্ডলের ধ্বংসের বর্ণনা। আধুনিক বিজ্ঞানীরাও নক্ষত্রদের ধ্বংসের বর্ণনা ঠিক একই ভাবে দিয়ে থাকেন। আমাদের সূর্য একটি নক্ষত্র; বিজ্ঞানীরা এই সূর্যের পরিণতির কথা বলে থাকেন, তা কেমন একটু দেখা যাক।

এখন থেকে ৮০০ কোটি বছরের মধ্যে সূর্য তার জ্বালানী হাইড্রোজেন শেষ করে ফেলবে এবং তখন পৃথিবীও ধ্বংস হয়ে যাবে। হাইড্রোজেন ফুরিয়ে গেলে হিলিয়াম পুড়ে কারবনে পরিণত হবে। আর সেইজন্যে সূর্য আকারে বিশাল হয়ে উঠবে এবং লাল তারায় পরিণত হবে। সূর্য বিশাল হয়ে উঠলে তার উত্তাপও হয়ে উঠবে ভীষণ এবং সে উত্তাপে পৃথিবী পুড়ে খাক হয়ে যাবে।

George Gamow তাঁর 'A Planet Called Earth' গ্রন্থে আরো বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। এখানে আমরা তার অনুবাদ তুলে দিলাম।

সূর্যের ভবিষ্যত সম্বন্ধে তত্ত্বগতভাবে আমরা কি জানতে পারি? সূর্য আজ মধ্যবয়সী যুবা। ৫০০ কোটি বছর পেরিয়ে এসেছে সে, আরও ৫০০ কোটি বছর সে জীবিত থাকবে, সেই সুদূর ভবিষ্যতে যখন সূর্যের অভ্যন্তরের জ্বালানী হাইড্রোজেন সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাবে তখন সূর্যের দেহে আসবে একটি অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন।

সূর্যের কেন্দ্রের জ্বালানী শেষ হয়ে গেলে ভিতরের সেই 'পারমাণবিক অগ্নি' অর্থাৎ 'nuclear fire' ছড়িয়ে পড়বে বাইরের স্তরে। এইসব স্তরে তখনো কিছু হাইড্রোজেন থাকবে। থারমোনিউক্লিয়ার রিঅ্যাকসান সূর্যের কেন্দ্র থেকে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়বে বাইরের স্তরের দিকে। আর এই বিক্রিয়ার ফলে সূর্যের দেহের আয়তন বৃদ্ধি পেতে শুরু করবে। ফলে আলো ও উত্তাপও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এই সময় সূর্যের বাইরের স্তরের তাপ কমতে কমতে দাঁড়াবে ৩০০০° সেন্টিগ্রেড (বর্তমান তাপ ৬০০০° সেন্টিগ্রেড)। এই সময় সূর্যের আয়তন এত বেড়ে যাবে যে আকাশের একটা বিরাট অংশ অধিকার করে ফেলবে। সূর্যের ঔজ্জ্বল্য কমে গিয়ে হয়ে উঠবে টকটকে লাল। প্রথমে বাড়তে বাড়তে সূর্য গ্রাস করবে বুধ ও শুক্র গ্রহকে তারপর সে হাত বাড়াবে পৃথিবীর দিকে। তখন পৃথিবীর সমুদ্রের জল টগবগ করে ফুটতে শুরু করবে আর বহিস্তরের পাথুরে আস্তরণ হয়ে উঠবে জ্বলন্ত লোহার মত টকটকে লাল। সমস্ত সৌরমণ্ডল ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর একদিন আমাদের লাল তারা সূর্য ফেটে যাবে। বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন 'সুপারনোভা'। তারও পরে সে পরিণত হবে 'সাদা-বামন' তারায়। তারপর একদিন সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। সূর্য মৃত্যু বরণ করবে।

সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনায় আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আধুনিক বিজ্ঞানীরা আজ যে সিদ্ধান্তে এসেছেন আমাদের পূর্বপুরুষ ভিনগ্রহবাসী দেবতারা বহুকাল আগেই এই রহস্য রীতিমত বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যসহ উপলব্ধি করেছিলেন এবং তা লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। শুধু তাই না, তাঁরা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের থেকেও বহুগুণ উন্নত ছিলেন। তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি ছিল আরো গভীর। আধুনিক বিজ্ঞানীরা সৃষ্টি রহস্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে। কিন্তু প্রাচীন ঋষিরা সৃষ্টি রহস্য ব্যাখ্যা করেছেন সেই বিজ্ঞানঘন পরমপুরুষ যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্তা তাঁকে ধরে নিয়েই।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি-প্রলয়ের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একক নক্ষত্র কিভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তাও আমরা পুরাণ থেকে বিশ্লেষণ করলাম। এবার দেখা যাক পৃথিবী সদৃশ গ্রহ সৃষ্টির কথা পুরাণে কিছু পাওয়া যায় কিনা। দেবীপুরাণ বলছেন ঃ

'তখন আমি বিবেচনা করিয়া রজোবৃদ্ধি করিয়া ছিলাম। সহস্রবাহু, সহস্রমুখ, সহস্রমস্তক বিষ্ণুও (সূর্য) স্ববীর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়েই বিবিধ অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পরস্পরে পরস্পরে গ্রহণে উদ্যত হইলেন। তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া পুরাণ পুরুষোত্তমগণ ভীত হইলেন। প্রলয় মেঘমালা গগনপথে প্রবৃদ্ধ হইতে লাগিল। দশদিক ভীমরূপে ঘোরস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। প্রলয় শিখা, ভীষণ বিদ্যুৎলতা খেলিতে লাগিল। প্রচণ্ড প্রভঞ্জন বেগে পর্ব্বতগণ পতনোন্মুখ.

হইল। ভূকম্প হইতে লাগিল, জলোচ্ছাস বাড়িল, সমুদ্র সকল উদ্বেল হইতে লাগিল। ধূমকেতু উদিত হইল। দিগহস্তিগণ, ঘোরনাদ কম্প এবং মদস্রাব সহকারে নিজ মর্য্যাদা লঙ্ঘনে উদ্যত হইল। আকাশের তীব্র গর্জ্জন, দণ্ডঘূর্ণিত চক্রবৎ ভ্রমণ, পতনোম্মুখতা, কপালবর্ষণ নির্ব্বাণ অঙ্গারবর্ষণ, প্রদীপ্ত অঙ্গারবর্ষণ, স্থূলধার দারুণ বহ্নিশিখা বর্ষণ, ব্যালরূপী জ্যোতিঃ সম্পন্ন লেলিহান মেঘমালার ভ্রমণ এবং উল্কামুখ শৃগালকুলের জগৎ পরিবেষ্টন হইতে লাগিল। জগৎ ঘোর একার্ণব, সমুদ্রতরঙ্গ সর্ব্বতোভাবে আসিয়া তাড়না করিতেছে।'

এ বর্ণনা তো পৃথিবী সৃষ্টির বর্ণনা। দেখা যাক আধুনিক বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে কি বলেন।

সূর্যের খুব কাছ ঘেসে একটি অন্য নক্ষত্র চলে যাওয়ার সময় সেই নক্ষত্রের অভিকর্ষের টানে সূর্যের দেহ থেকে এক চাঙড় লম্বা উত্তপ্ত গ্যাস ছিটকে বেরিয়ে এল। সেই উত্তপ্ত গ্যাস সূর্যের অভিকর্ষের টানে সূর্যের চারিদিকে ঘুরতে শুরু করল। বহুকাল পরে সেই পটলের মত দেখতে বিশাল গ্যাসপিণ্ড ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এরাই একদিন সূর্যের বিভিন্ন গ্রহে পরিণত হল। মাধ্যাকর্ষণ ও তেজস্ক্রীয়তার প্রভাবে এই উত্তপ্ত গ্যাসীয় গোলকের কিছু কিছু গ্যাস তরল পদার্থে পরিণত হল। তারপর কোটি কোটি বছর পরে সেই তরল পদার্থ আরো ঘন হল। আস্তে আস্তে এগুলোর উপর পড়তে লাগল দুধের সরের মত সর। সেই পাতলা পাথুরে সর বা আস্তরণ সৃষ্টি করল ভূত্বকের। আরো কোটি কোটি বছর ধরে ঠাণ্ডা হতে থাকল পৃথিবী। যখন পৃথিবীর ভূত্বক ঠাণ্ডা ও শক্ত হচ্ছিল সেই সময়ে হাজার হাজার বিশাল আগ্নেয়গিরির গহ্বর থেকে ঘন মেঘপুঞ্জ উঠে পৃথিবীর আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। তারপর শুরু হয়েছিল অগ্ন্যুৎপাৎ। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল উত্তপ্ত গলিত লাভা। এই উত্তপ্ত লাভা যত ঠাণ্ডা হতে লাগল ততই ভূত্বক কঠিন হয়ে উঠল। যে গ্যাসীয় মেঘ পৃথিবীর আকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তারা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে পৃথিবীর চারপাশে ভেসে রইল। এই পুরু ঘন মেঘমণ্ডলের পুরু আস্তরণ ভেদ করে সূর্যের আলো পৌঁছুতে পারল না পৃথিবীর বুকে। এই মেঘপুঞ্জ থেকে শুরু হল একটানা প্রবল বর্ষণ; কিন্তু উত্তপ্ত ভূত্বক স্পর্শ করার আগেই এই বৃষ্টি বাষ্প হয়ে আবার উঠে গেল আকাশে। শুরু হল উল্কাপাত, বিদ্যুতের চমক। আর প্রবল বর্ষণ। নিচু জায়গা জলে ভর্তি হয়ে আকার নিল সমুদ্রের। সেই জল ও উচ্ছ্রিত হতে লাগল।

বহুকাল বাদে পৃথিবী আরো ঠাণ্ডা হল। ঘণ মেঘপুঞ্জ হালকা হতে শুরু করল। একদিন সূর্যের আলো এসে পৌঁছুলো পৃথিবী গ্রহের বুকে। উন্মুক্ত পাহাড় আর

নিস্প্রাণ সমুদ্রের জলের উপর ছড়িয়ে পড়ল প্রথম সূর্যালোক। প্রথম প্রাণীর উদ্ভব হতে কেটে গেল আরো কত কাল।

পৃথিবী বা পৃথিবীর মত একটি গ্রহ সৃষ্টির প্রাচীন ইতিহাস ও আমরা জানতে পারলাম দেবতাদের ইতিহাস সেই পুরাণ থেকেই।

সব থেকে মজার ব্যাপার হল এই যে পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীরই ছায়া যেন ছড়িয়ে রয়েছে সারা পৃথিবীর পুরাকথা, উপকথা, লোককথা ও ধর্ম গ্রন্থে। কি করে সম্ভব হল এমন অঘটন ?

পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা সৃষ্টিতত্ত্ব

মেসোপটেমিয়ার নিনেভে পাওয়া গেছে মৃৎফলকে লেখা 'পৃথিবীর সূচনা' সম্পর্কে একটি কাহিনীর অংশ। এখানেও পাওয়া যায় সেই আদিপর্বের (আদি সূপ) কাহিনী আর মানুষ সৃষ্টির আগে দেবকুলের জন্মের কথা। দানিকেনের 'প্রমাণ' গ্রন্থ থেকে সে কাহিনী তুলে দিচ্ছি :

'স্বর্গে যখন নামকরণ হয়নি,
যখন পৃথিবীও ছিল নামহীন, গোত্রহীন,
'আদি প্রবর্তক, তথা জনক
মহাসমুদ্র এবং তার বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাস
যখন জন্ম দিল সর্ব বস্তুর,
যখন ক্ষেত্র ছিল কর্ষনহীন
কোন মানুষের যখন ঘটেনি আবির্ভাব,
কোন দেবতারও যখন ছিল না অস্তিত্ব,
গড়ে ওঠে নি কোন নাম, নিয়তিও হয়নি সুস্থির,
তখনি সৃষ্টি হল হল দেবকুলের,
জন্ম হল লুহমু আর লাহামুর,
কত যুগ বয়ে গেল কালের অনন্ত লক্ষ্য পানে।'

জাপানি শিন্টো ধর্মের এক গ্রন্থ নিহোঙ্গী। এই নিহোঙ্গীর সৃষ্টিতত্ত্ব :

'কালের সূচনায় স্বর্গ এবং পৃথিবী যখন আলাদা হয় নি, নারী পুরুষও হয়নি বিচ্ছিন্ন (!), তখনই মুরগীর ডিমের মত গড়ে উঠলো অমূর্ত একটি পদার্থ পিণ্ড। সেই অমূর্ত পদার্থপিণ্ডে নিহিত ছিল একটি বীজকণা। তারই শুচিশুভ্র অংশটুকু ছড়িয়ে পড়লো আলতোভাবে, গড়ে উঠল স্বর্গ আর, শ্রীহীন ভারী অংশটুকু পড়ে রইলো নিচে, সেই হল পৃথিবী। হালকা অংশটুকু দানা বাঁধতে দেরী হল না, কিন্তু শ্রীহীন ভারী অংশটুকু দানা

বাঁধলো অনেক পরে, অনেক কষ্টে। তাই প্রথম গড়ে উঠেছে স্বর্গ কিন্তু পৃথিবীর দানা বেঁধে উঠতে লেগেছে অনেক দীর্ঘ সময়।'

মিশরীয় মৃতের পুঁথিতে রয়েছে সেই মহাজাগতিক 'অণ্ডের কথা :

'শোনো হে মহাজাগতিক অণ্ড,
বহু লক্ষ বছরের হোরাস আমি,
আমি রাজা, আমি শাসক।
পাপমুক্ত আমি
পার হয়ে চলিয়াছি
অসীম অনন্ত দেশকাল।'

চৈনিক লিয়াও সভ্যতার কিম্বদন্তী বলে, আমাদের পৃথিবী নির্গত হয়েছে নাকি একটি ডিমের ভিতর থেকে।

ডোবানদের কিম্বদন্তী বলে আম্মা ছিলেন আদি এবং একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বর। মৃত্তিকাস্তূপ থেকে তারকা সৃষ্টি করে আম্মা নিক্ষেপ করলেন মহাকাশে।

বান্টুদের একটি বড় দল পাংওয়েদের ভিতর চলতি কাহিন টি হচ্ছে এই রকম :

'একটি বিশেষ অণ্ডে ভরা ছিল বিদ্যুৎ। আদি জননী তাহা হইতে গ্রহণ করিল অগ্নি। অণ্ড ভাঙিয়া গেল, তাহার অর্ধাংশ দুইটি হইতে দৃশ্যমান বস্তুসমূহ বাহির হইল। উপরিস্থ অর্ধাংশ বৃক্ষ-ছত্রাকে পরিনত হইয়া আকাশে উঠিয়া স্বর্গে চলিয়া গেল। নিম্নস্থ অর্ধাংশ রহিয়া গেল পৃথিবীতে।'

গুয়েতেমালার মায়াজাতির পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে কাহিনীটি বলে : কুয়াশার মত একটা মেঘখণ্ডের মত এবং ধূলোর মত সৃষ্টি রূপ পরিগ্রহ করতে লাগল।

দক্ষিণ কঙ্গোর পেণ্ডে উপজাতিরা বলে কালের সূচনায় কিছুই ছিল না। সর্ব চরাচর আঁধারে ঢাকা ছিল। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হত পৃথিবীতে, তবু কোথাও একটাও নদী ছিল না। বৃষ্টি থামতেই দেবাদিদেব মাউম্বিসি নদীর ব্যবস্থা করলেন, তারপর সৃষ্টি করলেন অজ্ঞান মানুষ, তাদের দেহ ছিল অসম্পূর্ণ আর দেহমাত্র ছিল তারা। মাউম্বিসি ছিলেন বিশ্বস্রষ্টা, সমস্ত তারা তাঁর হাতে গড়া। তিনিই শিখিয়েছিলেন জনার-ভুট্টা চাষ করতে, তাল-তমাল গাছ পুঁততে।

আর একটি বান্টু জাত হচ্ছে বুশোঙ্গো। এদের পুরাণ বলে,

'আদিতে পৃথিবী ছিল জলে ঢাকা আর অন্ধকার। তারপর এলো বুম্বা দৈত্য। তার গায়ের চামড়া ছিল পাতলা। একদিন তার পেটে ব্যথা উঠলো, বমি করতে শুরু করলো সে। বমিতে প্রথম বেরুলো তারা, সূর্য আর চাঁদ। সূর্যের উত্তাপে জল শুকিয়ে গেল, জেগে উঠলো বালির চড়া। বুম্বার এক ছেলে একটা চারাগাছ বমিকরল, আর তা থেকেই সৃষ্টি হল অন্য সব গাছ। তারপর, সে পৃথিবীর জীবজন্তু

বমি করলো, প্রথমে অতি প্রয়োজনীয় সব জন্তু, তারপর মানুষ। ওষুধও সে বমি করেছিল, আর বমি করেছিল উল্কা ও ক্ষুর। তারপর জীবেরা সৃষ্টিকর্ম এগিয়ে নিয়ে চললো। একটানা বমি করে পৃথিবী সৃষ্টিকরার পর বুম্বা গেল মানুষদের গ্রামে। সেখানে গিয়ে ঘোষণা করলো কী কী নিষিদ্ধ আহার। একজন মানুষকে সে প্রথম রাজা করলো। পৃথিবীতে সেই রাজাই হল পৃথিবীর দেবতা। তারপর সে বাতাসে সওয়ার হয়ে চলে গেল স্বর্গে।'

উদাহরণ বাড়িয়ে আর লাভ নেই। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সভ্য ও অসভ্য মানুষদের পুরাকথা, কিম্বদন্তী, উপকথায় উল্লিখিত সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীগুলির মধ্যে কি করে এই ধরণের মিল হল? এর উত্তরে আমরা এ কথা কি বলতে পারি না যে এই সৃষ্টিতত্ত্বের জন্ম খুব সম্ভবতঃ এক আদিম উৎস থেকে। যে আপাত অমিল দেখা যায় তা শুধুমাত্র স্থান, কাল ও প্রকাশ ভঙ্গিমার পার্থক্যের জন্যেই ঘটেছে। ভারতীয় পুঁথি এখনো টি'কে আছে বলে সেখানে রয়েছে সৃষ্টি-তত্ত্বের নিখুঁত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, আর অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে যেন এই কাহিনীরই ছায়া।

অভিব্যক্তিবাদ

আগের অধ্যায়ে আমরা গ্রহ সৃষ্টি পর্যন্ত এগিয়েছি। এরপর আসবে প্রাণীর উদ্ভব কাহিনী। দেখা যাক দেব-ঐতিহাসিকরা এ সম্বন্ধে কি আলোকপাত করেন এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদের সঙ্গে কোথায় তার মিল বা অমিল। একটা কথা এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার তা হচ্ছে প্রাচীন পণ্ডিতরা ইতিহাস লিখেছেন, তাঁরা কোন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করেন নি তাই এসব কাহিনীর মধ্যে বিশদ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব খোঁজার চেষ্টা নিরর্থক হবে। আমাদের দেখতে হবে এইসব কাহিনী বৈজ্ঞানিক মতামত অনুযায়ী কি না? এবং বৈজ্ঞানিক সূত্র এসব কাহিনীর মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আছে কিনা? যদি আমরা তার সন্ধান পাই তাহলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করব।

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ থেকে নবম অধ্যায় (১ম অংশ) পর্যন্ত প্রাণী সৃষ্টির বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণ থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি আমরা দিচ্ছি না কারণ সেগুলো নানারকম দার্শনিক কথায় পরিপূর্ণ। আমরা এখানে প্রয়োজনীয় অংশের উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা করতে চাই।

মৈত্রেয় গুরুদেব পরাশরকে প্রশ্ন করলেন কল্পের আদিতে ব্রহ্মা যেভাবে সর্বভূতের সৃষ্টি করেছিলেন তা আমাকে বলুন। পরাশর তখন বলতে আরম্ভ করলেন, 'অতীত কল্পের অবসানে নিশাসুপ্তোত্থিত এবং সত্ত্বোদ্রিক্ত প্রভু ব্রহ্ম, লোকশূন্য অবলোকন

করিলেন।' অর্থাৎ পৃথিবী বা গ্রহটি তখন সম্পূর্ণ নিষ্প্রাণ। এরপর ব্রহ্মা বা নারায়ণ 'জনলোকগত সনকাদি সিদ্ধ পুরুষ কর্তৃক অভিষ্টুত (সম্যক স্তুত) হইয়া জল মধ্যে প্রবেশ করিলেন।'

আধুনিক বিজ্ঞানীরাও মনে করেন যে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের স্পন্দন শুরু হয়েছিল সমুদ্রের জলে।

পুরাণকার কি সেই ইঙ্গিত দিচ্ছেন? পুরান কার আরও একটি অদ্ভুত কথা বললেন। ভগবদ বিশ্বাসী পুরাণকারদের কথা যেন অনেকটা জড়বাদী বিজ্ঞানীদের কথারই প্রতিধ্বনি। সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর সৃষ্টি ব্যাপারে নাকি নিমিত্ত মাত্র। ব্রহ্মারূপধারী দেব রজোগুণাবৃত ভগবান চতুর্ম্মুখ হরি, তৎপরে সৃষ্টি করিলেন। তিনি সৃজ্য সকলের সৃষ্টিকর্ম্মে নিমিত্তমাত্র হইলেন, যেহেতু সৃজ্য বস্তুর শক্তিই সৃজন বিষয়ে প্রধান্ কারণীভূত। হে তপস্বীশ্রেষ্ঠ। সৃজন কার্য্যে নিমিত্তমাত্র ভিন্ন অন্য কিছুরই অপেক্ষা দেখা যায় না। বস্তু সকল স্ব-শক্তি দ্বারাই বস্তুতা প্রাপ্ত হয়।'

এই শক্তির নাম করণ করেছেন তারা 'প্রাণ'। আমাদের শাস্ত্রে তাই এই প্রাণের এত জয় গান। 'নারায়ণাখ্য ভগবান ব্রহ্মা' যিনি সৃষ্টিকর্তা রূপে বর্ণিত তাঁর আসল পরিচয় কি? আমরা দেখতে পাই ব্রহ্মার দুইরূপ এক অতীন্দ্রিয় শক্তিময় পুরুষ হিসেবে, আর এক দেহধারী দেবতা হিসেবে। ডক্টর অশোক চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'পুরাণ পরিচয়' গ্রন্থে ব্রহ্মার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, 'ত্রিমূর্তির অন্যতম, সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ। বৈদিক ব্রহ্মা সর্বদর্শী, সর্বতোমুখ, সর্বতোবাহু এবং সর্বতোপাদ। কয়েকটি মন্ত্রে তাঁহার পাখার কথাও সমাম্নাত। তিনি স্রষ্টা, পুরোহিত ও জগতের পিতা। তিনি বাচস্পতি, চিন্তার ন্যায় দ্রুতগামী, পরের উপকারক এবং সর্বসুখশান্তির একমাত্র আশ্রয় স্থল। তিনি সর্বস্থান ও অবস্থার :সহিত পরিচিত। কোন প্রাণী তাঁহার অজ্ঞাত নাই এবং তিনিই সকল দেবতার নাম করণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা পরম প্রাজ্ঞ, অসীম শক্তি সম্পন্ন ও পরমা সংদৃক। তিনিই ধাতা, তিনিই বিধাতা, পৃথিবীর জনক এবং অন্তরীক্ষের আবিষ্কারক।' এরপর ডক্টর চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'বৈদিক যুগের প্রজাপতি ব্রহ্মার এই চরিত্র পৌরাণিক যুগে মোটেই একইভাবে পাওয়া যায় না। স্রষ্টারূপে ব্রহ্মা ভূমণ্ডলকে সৃষ্টি করিলেন—স্থাবর, অস্থাবর, চলাচল সমগ্র পদার্থ উৎপন্ন হইল সেই:জন্য তিনি ভূপতি। প্রত্যেক সৃষ্ট প্রাণীকে তিনি উপযুক্ত কর্মে নিয়োগ করিলেন। রামায়ণ এবং মহাভারতে তাঁহার সম্বন্ধে বহুবিধ উক্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য :—সৃষ্টিকৃৎদেব, সর্বস্ব ধাতা, লোককর্তা, লোকধাতা, সর্বলোককৃৎ, জগৎস্রষ্টা, লোকপতি ও জগৎপতি। পালয়িতা-রূপে তিনি সৃষ্টির প্রথমে তাঁহার পুত্র দেবগণকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন—বিশেষতঃ ইন্দ্রকে তিনি দৈবরাজ পদ প্রদান করেন।••• সাধারণতঃ ব্রহ্মলোকে তাঁহার বসবাস

হইলেও তিনি প্রায়ই প্রয়াগ, মহেন্দ্র পর্বত, হিমবৎ, পুষ্কর ইত্যাদি প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মলোকই হউক আর পৃথিবীর যে কোন তীর্থস্থানই হউক যেখানেই ব্রহ্মা নিবাস করেন সেখান হইতেই তিনি জগতের স্থিতি ও পালনের দিকে মনোযোগ প্রদান করেন। প্রতি মাসে একদিন করিয়া পৃথিবীর স্বর্গ—কুরুক্ষেত্র তীর্থে তিনি আগমন করেন।' ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ থেকে ব্রহ্মার মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে, মৎস্যপুরাণে এবং বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে ব্রহ্মার মূর্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মা কমণ্ডলুধারী, চতুর্মুখ, কখনও হংসারূঢ় কখনও বা কমলাসন। বর্ণে পদ্মগর্ভের ন্যায়। চারি হস্তের তিনটিতে কমণ্ডলু, স্রুব ও দণ্ড (চতুর্থহস্তে অক্ষমালা ধারণের উল্লেখ মৎস্য পুরাণে নাই)। শুক্লাম্বরধারী, মৃগচর্ম ও দিব্য যজ্ঞোপবীতশোভিত। মুনি, দেব, গন্ধর্ব পরিবেষ্টিত। এক পার্শ্বে আজ্য দ্রব্য ও অপর পার্শ্বে চারি বেদ শোভা পায়। তাঁহার বাম প্রান্তে সাবিত্রী ও দক্ষিণ প্রান্তে সরস্বতী।'

এই বর্ণনা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে বৈদিক প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টিশক্তি এক অতীন্দ্রীয় দেবতা। কিন্তু পৌরাণিক ব্রহ্মা এক দেহধারী লোকপাল এবং রাজচক্রবর্তী। মাঝে মাঝে বৈদিক দেবতার কিছু কিছু গুণও যেন এই পৌরাণিক ব্রহ্মার উপর অর্পিত হয়েছে। তবু এই দুই স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে চিনতে ভুল না হবারই কথা।

বৈদিক প্রজাপ্রতি ব্রহ্ম কে ? সেই কথারই উত্তর দিয়েছেন পুরাণকার। এখানে তিনি বৈদিক ব্রহ্ম সত্বাকেই বর্ণনা করছেন। বস্তুর স্ব-শক্তি বা প্রাণই হচ্ছে বৈদিক ব্রহ্মা। বেলাবাসিনী গুহ ও অহনা গুহ তাঁদের 'ঋগ্বেদ ও নক্ষত্র' গ্রন্থে ব্রহ্ম সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা করেছেন। এখানে সংক্ষেপে একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

'প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব।
যৎ কামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম।

(দশম ঋক)

অনুবাদ : প্রজাপতি প্রাণদেবতা, একমাত্র তুমি ছাড়া অন্যে এই বিশ্ব সৃষ্টি করতে সমর্থ হত না। তুমি ইহলোক, পরলোক ব্যাপ্ত হয়ে আছ। ধর্ম, অর্থ, অভিলাষ ও মুক্তির জন্য জীবনে মরণে তোমাকে আহুতি দিব।

প্রাণীর প্রাণ অতীন্দ্রিয়। অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি পদার্থবিদ্যার প্রমাণ প্রয়োগ করতে গেলে কেবল বিতণ্ডা ও জল্পনাই হয়ে থাকে সত্য আগেও যতদূর ছিল, বহু বিতণ্ডার পরও ততদূরেই থাকে। অনুমানও ত প্রত্যক্ষ-মূলক। প্রাণ যে চোখে দেখে নাই, সে প্রাণ সম্বন্ধে কি করে অনুমান করবে ? ঋষ্ ধাতুর অর্থ দর্শন। ইন্দ্রিয়ের অগোচর প্রাণ দর্শন করেছেন যিনি, তিনি ঋষি। অতীন্দ্রিয় প্রাণের;

বিদেহীপ্রাণের প্রমাণের জন্য ঋষিদের বাক্যের উপর নির্ভর করতে হবে, কারণ তাঁরা প্রাণের গতাগম্য সত্যদর্শন করেছেন। এইখানেই জড়বিজ্ঞানবিদ্ এবং প্রাণতত্ত্ববিদ্ ঋষির মধ্যে মর্মান্তিক প্রভেদ।'

যাহোক যা আলোচনা করছিলাম—বৈদিক প্রজাপতি ব্রহ্ম হচ্ছেন অতীন্দ্রিয় প্রাণ শক্তি। এই শক্তির 'দ্বারাই বস্তুতা প্রাপ্ত হয়' বা সৃষ্ট হয়। তাই প্রাণ হচ্ছেন প্রজাপতি।

কিন্তু পৌরাণিক ব্রহ্মা হচ্ছেন একজন দেহধারী লোকপাল। যার নিবাস কখনো পৃথিবী আবার কখনো স্বর্গ অথবা ব্রহ্মলোক অর্থাৎ অন্যকোন গ্রহ।

আমাদের মূল আলোচনা থেকে একটু সরে এসেছি। তবে সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করতে পারলে তাঁর সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেককিছু সহজবোধ্য হয়ে উঠবে বলেই আমাদের বিশ্বাস তাই এই ভিন্ন আলোচনা।

যাহোক আমরা আবার আমাদের আসল বক্তব্যে ফিরে যাই।

মৈত্রেয়র প্রশ্নে পরাশর সৃষ্টির ক্রমপর্যায় বর্ণনা করলেন।

মহত্তত্ত্ব — প্রথম সৃষ্টি —	এর নাম বিজ্ঞেয়		প্রাকৃত সর্গ
তন্মাত্রা — দ্বিতীয় ,, —	এর নাম ভূতসর্গ		
বৈকারিক — তৃতীয় ,, —	এর নাম ঐন্দ্রিয়িক		

এই তিনপ্রকার সৃষ্টি অবুদ্ধিপূর্ব্বক (অবিদ্যাখ্য প্রকৃতিসম্ভূত) অন্য অর্থে বলা যায় এগুলি সূক্ষ্ম সৃষ্টি। এগুলি খুব সম্ভবতঃ নিউট্রন, প্রোটন, ইলেকট্রন, মেসন, পজিট্রন জাতিয় অতিসূক্ষ্ম পারমাণবিক বস্তু।

এরপর হচ্ছে :

মুখ্য স্থাবর :	চতুর্থ সৃষ্টি	বৈকৃত সর্গ
তির্য্যকস্রোতা :	পঞ্চম সৃষ্টি — (তির্য্যকস্রোতার অর্থ আহার সঞ্চারে জীবিত)	
ঊর্দ্ধস্রোতা :	ষষ্ঠ সৃষ্টি — দেব সর্গ	
অর্ব্বাকস্রোতা :	সপ্তম সৃষ্টি — মানুষ সর্গ (অধঃপ্রবিষ্ট আহারে জীবিত)	

অর্থাৎ প্রথমে পারমানবিক বস্তুসমূহ থেকে সৃষ্টি হল তন্মাত্রা বা পরমাণু। সেই পরমাণু অন্য পরমাণুর সংযোগে সৃষ্টি করল অনু, যাকে হয়ত বৈকারিক তৃতীয় সৃষ্টি বলা হয়েছে। এ পর্যন্ত যে সৃষ্টি তা সূক্ষ্ম, চোখে দেখা যায় না। এইবার বিভিন্ন অণুর সংযোগে সৃষ্টি হতে লাগল স্থাবর বা দৃশ্য জগৎ। ছায়াপথ, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি। একে বলা হয় নগাত্মক সৃষ্টি। নগ অর্থে পর্বত। আমাদের ব্যাখ্যা খুব একটা কষ্টকল্পিত বলে মনে হয় কি ?

যাহোক গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টির পর স্বভাবতই সৃষ্টি হবে প্রাণী। হ্যাঁ, পঞ্চম সৃষ্টি প্রাণী। এরা তির্যকস্রোতা অর্থাৎ আহার সঞ্চারে জীবিত থাকে। তির্যকস্রোতা প্রাণী হচ্ছে (গো, অজ, মেষ, অশ্ব, অশ্বতর, ঘর, শ্বাপদ ব্যাঘ্রাদি), দ্বিক্ষুর, হস্তী, বানর, পক্ষী, ঔদক (কূর্ম্মাদি) ও সরীসৃপ।' এছাড়াও প্রজাপতির 'লোম হইতে ফলমূলশালী ওষধি জন্মিল।'

এরপর সৃষ্টি হল দেব, অসুর, পিতৃ, যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব, অপ্সর, নর, কিন্নর, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, মৃগ ও উরগ।

এরপর বর্ণনা করা হল কি করে মানুষ ঘরবাড়ি ও পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী করতে শিখল তার কথা। 'তৎপরে তাহারা বাক্ষ´, পার্ব্বত ঔদক, আদি স্বাভাবিক ও প্রাকারাদি কৃত্রিম দুর্গ, পুর, খর্ব্বটক প্রভৃতি স্থাপিত এবং শীতাতপাদি বাধা প্রশমনের জন্য তাহাতে যথান্যায়ে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিল। শীতাদির এইরূপ প্রতীকার করিয়া কর্ম্মজাত বার্ত্তোপায় (কৃষ্যাদি) ও হস্তসিদ্ধি (ভৃতি-জীবিকার) সৃষ্টি করিয়াছে। হে মুনে! ব্রীহি, যব, গোধূম, অনু, তিল, প্রিয়ঙ্গু, উদার, কোরদূষ, চীনক, মাষ, মুদ্গ, মসূর, নিষ্পাব (শিজ্যা), কুলত্থক, আঢক্য, চণক ও শণ এই সপ্তদশ জাতীয় ঔষধি গ্রাম্য। ব্রীহি, যব, মাষ, গোধূম, অনু, তিল, প্রিয়ঙ্গু, কুলত্থক, শ্যামাক, নীবার, জর্ত্তিল, গবেধুক, বেণুযব ও মর্কটক গ্রামারণ্য এই চতুর্দ্দশ ওষধি যজ্ঞীয় (যজ্ঞনিষ্পত্তির নিমিত্ত স্মৃত) এবং যজ্ঞ ইহাদের হেতু (বৃষ্টি দ্বারা উৎপাদক)।'

অর্থাৎ প্রজাগণ ঘরবাড়ি তৈরি করতে শিখল, কৃষি বিদ্যা ও কারুশিল্প পারঙ্গম হয়ে সভ্যতার দরজায় পা রাখল। কি অদ্ভুত ধারাবাহিক বর্ণনা। তবে খুবই সংক্ষিপ্ত এই যা। কিন্তু এসব সংক্ষেপে বর্ণনা না করে যে উপায় নেই; কারণ এই দেব ঐতিহাসিকদের যে এখনো বহু বিষয়ের বর্ণনা করতে হবে। বিশেষ করে দুই পৃথিবীর দেব ইতিহাস লিখতে হবে। সুতরাং তাঁদের দোষ দেওয়া যায় কি?

এই যে সৃষ্টিক্রম বর্ণনা করেছেন দেব ঐতিহাসিকরা এর সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিদের তত্ত্বের তো কোন অমিল দেখি না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকরাও বলেন নিষ্প্রাণ পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের উদ্ভব হয় সাগরের লোনা জলে। তারপর এককোষী প্রাণী বহুকোষী হয়ে মানুষের মত জটিল জীবের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের জন্মের বহু পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে তির্যকস্রোতা প্রাণীর। সবার শেষে সৃষ্টি হয়েছে মানুষের।

যাহোক এবার শুরু হল ইতিহাস। এ ইতিহাস অন্য গ্রহ স্বর্গের দেবতাদের ইতিহাস।

সংক্ষিপ্ত ভিনগ্রহের ইতিহাস

মোটামুটিভাবে দেব বংশের কথা উল্লেখ করলেন পুরাণকার। এরপর তিনি তাঁদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করছেন। মনে রাখতে হবে 'পুরাণ সংহিতার' রচয়িতারা পুরাণ রচনা করেছেন আমাদের পৃথিবীতে বসে। সুতরাং তাঁরা জোর দিয়েছেন দেবতাদের এই পৃথিবীতে আগমনের পরবর্তী ঘটনার উপর। এখান থেকে তাঁরা বিশদভাবে ও কালানুক্রমিক পদ্ধতিতে ইতিহাস লিখেছেন। কিন্তু প্রকৃত ঐতিহাসিক সব সময় ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেন। তাই পুরাণকাররাও দেবতাদের আপনগ্রহের ইতিহাস না লিখে এড়িয়ে যেতে পারলেন না। তাঁরা বিশ্ব সৃষ্টি, তাঁদের নিজেদের গ্রহ সৃষ্টি, সেই গ্রহে প্রথম প্রাণ সৃষ্টি, তারপর অন্যান্য গাছপালা, জীবজন্তু সৃষ্টি, দেবতা, অসুর সৃষ্টির কাহিনী পর্যায়ক্রমে বলে গেলেন। নিজেদের গ্রহের দেব-সভ্যতার ইতিহাস নিশ্চয় দীর্ঘ। এই দীর্ঘ ইতিহাস বিশদভাবে লিখতে গেলে গ্রন্থ বিশাল হবে। তাই তাঁরা এই দীর্ঘ ইতিহাসকে সংক্ষেপে বলবার জন্য একটা প্রতীকি কাহিনীর অবতারণা করলেন। এ কাহিনী পাঠ করে আজ পর্যন্ত বহু পাঠকই বিভ্রান্ত হয়েছেন। অনেকে অনেক রকম ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। কিন্তু সেসব ব্যাখ্যা আসল রহস্যের উপর খুব বেশী আলোকপাত করতে পেরেছে বলে আমাদের মনে হয় না। এই প্রতীকি কাহিনীটি হচ্ছে সমুদ্র মন্থন কাহিনী। এই কাহিনীটির ধারা অনুসরণ করলে আমরা দীর্ঘ দেব-ইতিহাস খুব সংক্ষেপে জানতে পারব। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই রকম :

শঙ্করের অংশে উৎপন্ন ঋষি হচ্ছেন দুর্বাসা। ইনি ঋষি হলে কি হবে, বড়ই ক্রোধ পরায়ণ। রেগে গেলে শাপ-শাপান্ত একেবারে সর্বনাশ করে দেন। সেই দুর্বাসা ঋষি একদিন এক বিদ্যাধরীর হাতে সন্তানক ফুলের একটি মালা দেখতে পেলেন। মালাটি চাইলেন দুর্বাসা বিদ্যাধরীর কাছে। বিদ্যাধরী মালাটি দুর্বাসাকে দিয়ে দিলেন। দুর্বাসা সেই মালা মাথায় ধারন করে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একদিন রাজা ইন্দ্রকে হাতীর পিঠে চড়ে আসতে দেখলেন। দুর্বাসা মালাটি ছুড়ে দিলেন ইন্দ্রের দিকে। ইন্দ্র মালাটি নিয়ে হাতীর মাথার উপর রাখলেন। হাতী শুড় দিয়ে মালাটি মাথা থেকে তুলে নিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। এই দেখে দুর্বাসা ভীষণ রেগে গেলেন ও ইন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন, 'রে মূঢ়। তুমি মদ্দত্ত এই মালাকে বহু বিবেচনা করিলে না, অতএব তোমার ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।' ইন্দ্র তাড়াতাড়ি হাতির পিঠ থেকে নেমে দুর্বাসাকে অনুনয়-বিনয় করলেন। কিন্তু দুর্বাসার ক্ষমা পাওয়া অত সহজ ব্যাপার নয়। দুর্বাসা ইন্দ্রকে ক্ষমা না করেই চলে গেলেন। ইন্দ্রও

বিরস মুখে অমরাবতীতে ফিরে গেলেন। এরপরই শুরু হল বিপর্যয়। 'ওষধি ও লতা বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষীণ হইল। যজ্ঞ সংপ্রবর্ত্তিত হয় না, তাপসগণ তপস্যা করেন না, কোনও ব্যক্তি দানাদি ধর্ম্মে মনোযোগ করে না, হে দ্বিজোত্তম। লোভাদি দ্বারা উপহতেন্দ্রিয় হইয়া সকল লোক নিঃসত্ত্ব এবং স্বল্প বিষয়ে সাভিলাষ হইতে লাগিল। যেখানে সত্ত্ব অর্থাৎ ধৈর্য্য, সেই স্থানেই লক্ষ্মী, ধৈর্য্য লক্ষ্মীরই অনুগামী, যাহারা নিঃশ্রীক তাহাদের সত্ত্ব কোথায়? আর সত্ত্ব ব্যতিরেকে গুণ সকলই বা কোথায় হইতে পারে? গুণ ব্যতিরেকে পুরুষের বল শৌর্য্যাদির অভাব হয়, বল শৌর্য্যাদি বিবর্জ্জিত ব্যক্তি সকলের লঙ্ঘনীয়। প্রথিত ব্যক্তিও লঙ্ঘিত হইলে ছন্নমতি হইয়া পড়ে। ত্রৈলোক্য এইরূপ অত্যন্ত নিঃশ্রীক ও সত্ত্ববর্জিত হইলে পর দানবগণ দেবতাদের প্রতি বলোদ্যোগ করিতে লাগিল। তদনন্তর লোভাভিভূত নিঃশ্রীক সত্ত্ববর্জ্জিত দৈত্য সকল শ্রীহীন নিঃসত্ত্ব দেবগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং ইন্দ্রাদি ত্রিদশেরা দৈত্যদিগের দ্বারা বিজিত হইয়া হুতাশনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া মহাভাগ পিতামহের শরণ লইলেন।' ব্রহ্মা সব শুনে বললেন এ ব্যাপারে একমাত্র বিষ্ণুই তোমাদের মন্ত্রণা দিতে পারেন। সবাই মিলে বিষ্ণুর স্তব আরম্ভ করলেন। অবশেষে বিষ্ণু দেখা দিয়ে দেবতাদের পরামর্শ দিলেন, 'দৈত্যগণের সহিত ক্ষীরাব্ধিতে সকল ওষধি আনিয়া (নিক্ষেপ পূর্ব্বক) এবং মন্দরকে মন্থন ও বাসুকিকে নেত্র (মন্থনরজ্জু) করিয়া, আমার সাহায্যে অমৃত মন্থন কর। সাহায্যের নিমিত্ত দৈতেয়দিগকে সামপূর্ব্বক বল যে তোমরা সামান্য ফলভোক্তা (সমান ফলভাগী) হইবে। সমুদ্র মন্থন হইলে যে অমৃত উৎপন্ন হইবে তাহা পানে তোমরা এবং আমরা বলবান হইব। তৎপরে আমি এরূপ করিব যাহাতে দেবদ্বেষিগণ অমৃত না পাইয়া কেবল ক্লেশভাগী হয়।'

পুরো কাহিনী বর্ণনার আগে আমরা আমাদের ব্যাখ্যার সূত্রপাত করতে চাই।

স্বর্গলোকে দেবতাদের আধিপত্য। ইন্দ্র দেবতাদের রাজা। সবই ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু কোন একসময়ে কোন এক ইন্দ্র হয়ে উঠলেন ভোগবিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল। দুর্বাসার অভিশাপ একটি প্রতীকি ব্যাপার। রাজা ইন্দ্র যে বেশ আত্মগর্বী ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিলেন তা দুর্বাসার কথা থেকেই জানা যায়। ইন্দ্রকে অভিশাপ দেওয়ার পর ইন্দ্র যখন অনুনয়-বিনয় করে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন, তখন ক্রুদ্ধ দুর্বাসা বললেন, 'আমি কৃপালুহৃদয় নহি, ক্ষমা আমাকে ভজনা করে না। হে শক্র। (যাহারা ক্ষমা করে) তাহারা অন্য মুনি; আমাকে দুর্বাসা বলিয়া জানিও। তুমি গৌতমাদি অন্যান্য মুনি কর্তৃক বৃথাগর্ব্ব প্রাপিত হইয়াছ।'

রাজা উচ্ছৃঙ্খল ও ভোগবিলাসী হলে স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ প্রজাগণও রাজার পথই অবলম্বন করে থাকে। পরবর্তী সময়ে আমরা সেই চিত্রই দেখি। প্রজা

সাধারণ অলস ও ধৈর্যহীন হয়ে উঠেছে—এ অবস্থায় দেশের 'লক্ষ্মী বিনাশ প্রাপ্ত' এতো স্বাভাবিক। দেবতাদের বিরুদ্ধ শক্তি হচ্ছে দানবরা। তারা সুযোগ বুঝে দেবতাদের আক্রমণ করে রাজ্যচ্যুত করে স্বর্গরাজ্য অধিকার করে বসল।

এবার জ্ঞানী দেবতারা সবাই মিলে মন্ত্রণা করলেন অতঃ কিম্? তাঁরা ঠিক করলেন দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করে কোন ফল হবে না। তার চেয়ে যদি সন্ধি করে দানবদের সাহায্য নিয়ে উন্নতি করা যায় তবে সেই চেষ্টা করাই লাভ জনক। কিন্তু বিপক্ষীয় দানবগণ হঠাৎ পরাজিত দেবতাদের সঙ্গে সন্ধি করতে আগ্রহী হবে কেন? বিষ্ণু পরামর্শ দিলেন সমুদ্র মন্থনে যে অমৃত উঠবে দানবদের সেই অমৃতের লোভ দেখালেই দানবরা অমৃতের লোভে দেবতাদের সঙ্গে সন্ধি করে সমুদ্র মন্থনের মত কষ্ট সাধ্য কাজে রাজি হলেও হতে পারে। কিন্তু দেবতারা ছিলেন দুঁদে রাজনীতিক। তাঁরা আগেই ঠিক করে ফেললেন মন্থনে অমৃত উঠলে তার ভাগ দানবদের দেওয়া হবে না। তাদের ফাঁকি দেওয়া হবে।

সমুদ্র মন্থনের যে কাহিনী পুরাণকার বর্ণনা করেছেন তা অসম্ভব ব্যাপার। সমুদ্রের মধ্যে একটা আস্ত পাহাড় উপড়ে এনে ফেলে এবং একটি সাপকে মন্থনরজ্জু করে সমুদ্র মন্থন হাস্যকর ব্যাপার, একটা প্রতীকি ব্যাপারকে পুরাণকার ইচ্ছে করে এরকম একটি আষাঢ়ে গল্প বানিয়েছেন যাতে প্রতীকটি পাঠকের চোখ এড়িয়ে না যায়। মন্থন কথাটির অর্থ আলোড়নও হয়। আবার একথাও বলা যায় সারা দেশ মন্থন করে তাঁরা অমৃত ওঠাতে চেয়েছিলেন—অর্থাৎ দেব-দানবরা মিলে দেশের উন্নতি করবেন—এই উন্নতিই তো অমৃত। দেশ উন্নত হলে ছলেবলে দানবদের বঞ্চিত করে দেবতারা সেই উন্নত রাজ্য ভোগ করবেন। সমুদ্র মন্থনের এর থেকে সহজতর ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে?

এবার সমুদ্র মন্থনের পরবর্তী অংশটুকু শুনলে আমাদের ব্যাখ্যা ঠিক না ভুল তা পাঠক নিজেই বিচার করতে পারবেন।

'সুরগণ অসুরগণের সহিত সন্ধি করিয়া অমৃতের জন্য যত্নবান হইলেন। হে মৈত্রেয়! দেব দৈত্যেয় দানবেরা নানা ওষধি আনয়ন করত শরৎকালের মেঘের ন্যায় নির্ম্মলকান্তি বিশিষ্ট ক্ষীরব্ধিপয়োমধ্যে নিক্ষেপ পূর্ব্বক মন্দরকে মন্থান ও বাসুকিকে নেত্র করিয়া সত্বর অমৃত মন্থন আরম্ভ করিল।'

আমাদের ব্যাখ্যা : সন্ধির পর দেবতা ও দানবেরা দেশের উন্নতির দিকে মন দিলেন। উন্নতির প্রথম প্রর্যায় হচ্ছে খাদ্যে স্বনির্ভর হওয়া। ধান, যব, গম, কড়াই, মুগ, মুসুর ইত্যাদি তো ঔষধি। দেবতারা ও দানবরা মিলে কৃষির উন্নতিতে লেগেছিলেন বলেই আমাদের ধারণা।

এরপর, 'কৃষ্ণ দেবতা সকলকে পুচ্ছের দিকে এবং দৈত্যেয় সকলকে বাসুকির

পূর্ব্বকায়ে (অর্থাৎ মুখের দিকে) নিযুক্ত করিলেন। হে মহাত্মতে। অসুরেরা সেই ফণীর শ্বাসবহ্নি দ্বারা নষ্ট কান্তি হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িল এবং তাহার মুখের নিঃশ্বাস বায়ু দ্বারা ক্ষিপ্ত মেঘ সকল পুচ্ছদেশে গিয়া বর্ষণ করায়, তাহাতে দেবতা সকল আপ্যায়িত হইতে লাগিলেন।'

আমাদের ব্যাখ্যা ঃ দেবতারা বুদ্ধিজীবি তারা স্বল্পশ্রমের কাজ গুলি রাখলেন নিজের জন্যে আর ভারি বা শ্রমসাধ্য কাজগুলি চাপালেন দানবদের কাঁধে।

'তদনন্তর দেবদানব কর্ত্তৃক ক্ষিরাব্ধি মথ্যমান হইলে প্রথমে হবির্ধাম সুরপূজিতা সুরভি উৎপন্না হইলেন।'

আমাদের ব্যাখ্যা ঃ সুরভি অর্থে যে গাভী চাইলেই সব কিছু দিয়ে দেয় অর্থাৎ কামধেনু। এরকম গাভীর অস্তিত্ব কি বিশ্বাস যোগ্য? তার বদলে একথা কি বলা যায় না যে দেবতারা বিজ্ঞান কে রপ্ত করে ফেলেছিলেন। বিজ্ঞান ও তো এক অর্থে কামধেনু সুরভি। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের যা প্রয়োজন তাই পাচ্ছি।

এরপর জন্ম নিলেন বারুণী দেবী। তারপর উত্থিত হল পারিজাত তরু। এরপর অপ্সরাগণ। তারপর জন্ম নিলেন শীতাংশু। এরপর উঠল বিষ। নাগেরা সেই বিষ গ্রহণ করল।

আমাদের ব্যাখ্যা ঃ বারুণী দেবীর জন্মের অর্থ হতে পারে দেবতারা সমুদ্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হলেন। বিজ্ঞানে উন্নতি করার পরই সমুদ্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব। আমাদের কালেও এই একই ঘটনা ঘটেছে। পারিজাত তরু সৌন্দর্যের প্রতীক। দেবতারা সবদিক থেকে যথেষ্ট উন্নতি করছিলেন হয় তো একথাই বোঝানো হয়েছে পারিজাত তরুর জন্মের মধ্যে দিয়ে। এরপর জন্ম হল অপ্সরাগণের এঁরা নৃত্যগীত পটিয়সী। সুতরাং এ হয় তো দেবতাদের সাংস্কৃতির উন্নতির প্রতীক। এরপর জন্ম হল শীতাংশুর। শীতাংশুর আর এক নাম চন্দ্র। চন্দ্র মহাকাশের ইঙ্গিত দেয়। দেবতারা হয় তো মহাকাশ বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করে চাঁদে পা রাখলেন।

এইবার উৎপন্ন হল বিষ। এ বিষ সাপের বিষের মত ভয়ঙ্কর হলেও ঠিক সাপের বিষ নয়। এ হচ্ছে সভ্যতার অগ্রগতির কুফল। এ ধরণের বহু কুফলের কথা আমরা অনেকেই জানি সুতরাং তা নিয়ে বিশদ আলোচনার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না।

যা হোক এসব বিষের দায়ভাগ গ্রহণ করল নাগেরা।

'তদনন্তর শ্বেতাম্বরধর দেব ধন্বন্তরি স্বয়ং অমৃতকমণ্ডলু ধারণ করিয়া সমুত্থিত

হইলেন। তাহার পর দেদীপ্যমান কান্তিমতী বিকশিত কমলেস্থিতা ধৃতাপঙ্কজা লক্ষ্মীদেবী সেই পয়ঃ হইতে উত্থিত হইলেন।'

অর্থাৎ সভ্যতা উঠল চরম উন্নতির পর্যায়ে। অমৃত ও লক্ষ্মী সেই উন্নতিরই প্রতীক। এরপর বিষ্ণু দানবদের ফাঁকি দিয়ে দেবতাদের অমৃত বন্টন করলেন, অর্থাৎ দেবতারা হয়ে উঠলেন এই সভ্যতার সর্বেসর্বা মালিক। দানবরা হলেন হীনবল।

দেবতারা কবে পৃথিবীতে এসেছিলেন?

দেবতারা সঠিক কোন দিন এই পৃথিবীতে এসে নেমেছিলেন তা আমরা জানিনা। তবে এটুকু কল্পনা করতে পারি যে পুরাকালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নত ভিনগ্রহবাসী নভশ্চর দেবতারা তাঁদের উন্নত বিমানে চেপে আমাদের সৌরমণ্ডলে প্রবেশ করেছিলেন। এই সৌরমণ্ডলটি তাঁদের হয়তো যথেষ্ট কৌতূহলও জাগিয়ে তুলেছিল। কারণ নিজেদের সৌরমণ্ডলেরই প্রতিচ্ছায়া যেন দেখতে পেয়েছিলেন তাঁরা এই সৌরমণ্ডলে। এর গ্রহ উপগ্রহগুলিকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তাঁরা। তখন হয়তো পৃথিবীতে চলছে দ্বিতীয় মহাযুগ বা Mezozoic যুগ; অতিকায় সরীসৃপ ডাইনোসরদের তখন রাজত্ব। বিবর্তনের ধারা বেয়ে আদিম মানুষের তখনো উদ্ভব হয়নি পৃথিবীতে। আবহাওয়া এবং পরিবেশ তখনো উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি মানুষের বসবাসের।

দেবতারা হয়তো তখনকার মত ফিরে গিয়েছিলেন নিজেদের গ্রহে। কিন্তু তাঁরা ভোলেননি আমাদের সৌরমণ্ডল ও তার অন্তর্গত গ্রহ পৃথিবীকে। মাঝে মধ্যে এসেছেন এবং পৃথিবীর পরিবর্তন লক্ষ করেছেন। এক সময় পৃথিবী মানুষ বাসের যোগ্য হয়ে উঠেছে। জন্ম নিয়েছে আদিম মানবগোষ্ঠী। ঠিক এইরকম সময়ে রাজনৈতিক কারণে দেবতাদের নিজেদের গ্রহ ছাড়তে হল চিরকালের মত। তখন স্বভাবতই তাঁরা বেছে নিলেন আমাদের সৌরমণ্ডলের প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা পৃথিবীকে। এখানে নেমে এলেন দেবতারা তারপর গড়ে তুললেন উপনিবেশ।

গ্রহ ছেড়ে আসার সময় দেবতারা নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সংক্ষিপ্ত ও সাংকেতিক ভাষায় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন ভবিষ্যতে কাজে লাগাবার জন্যে। এই জ্ঞানভাণ্ডারই হচ্ছে বেদ। বেদ সৃষ্টি করেছিলেন ভিনগ্রহবাসী দেবতারা। এক উন্নত সভ্যজাতির সম্মিলিত জ্ঞানভাণ্ডার হচ্ছে এই বেদ। ঐতিহাসিকরা বলে থাকেন বেদ নাকি আর্যদের সৃষ্টি। ঐতিহাসিকরা যে আর্যদের কথা বলে থাকেন সেই বর্বর যাযাবর আর্যরা কখনই বেদের মত গ্রন্থ রচনা করতে পারে না। আর্যদের সঠিক পরিচয় আজো ঐতিহাসিকরা উদ্ধার করতে পারেননি। তবে তারা অনুমান করেন যে প্রায়, ৩০০০ খৃস্টপূর্বাব্দে মধ্য বা পূর্ব ইউরোপের কোন অংশে অথবা রাশিয়ার

উরাল পর্বতমালার দক্ষিণের সমতলে এই আর্য জাতির উদ্ভব হয়েছিল। সভ্যতার বিচারে এরা কিন্তু খুব একটা উচ্চস্তরে উঠতে পারেনি। কিছু চাষবাস, কিছু পশু-পালন এই নাকি ছিল তাদের প্রধান বৃত্তি। অথচ ঠিক এই সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে বেশ বড় বড় কয়েকটা সভ্যতার বিকাশ ঘটে গেছে। সুমের, মিশর ও সিন্ধু-সভ্যতা তাদের কয়েকটি। জ্ঞান, বিজ্ঞান, বড় বড় ইমারত ও দেবমন্দির তৈরি, ভাস্কর্য, মূর্তিশিল্প, শিলালেখ, মৃন্ময়লেখ, উন্নত নগরপরিকল্পনা ইত্যাদি এইসব সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। আর্যরা তখনও কিন্তু পুরোপুরি সভ্য হয়েই ওঠেনি। ঐতিহাসিকদের বর্ণিত আর্যরা তখন চাষবাস আর পশুপালন করে সাধারণ জীবনযাত্রা চালাচ্ছে।

আনুমানিক ২০০০ খৃস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময় আর্যরা নাকি নিজেদের বাসভূমি ছেড়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচীন গ্রীস, এশিয়া মাইনর, ইরান, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশে এদের ছড়িয়ে পড়ার খবর পাওয়া যায়। এই সময় এরা নাকি ইরান হয়ে ভারতে ঢুকে পড়ে। ভারতে যখন আর্যরা এলো তখন তারা যাযাবর জাতি। ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছে গরুও পোষে, দল বেঁধে খাবার আর আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। এরকম একটা জাতির পক্ষে বেদের মত গ্রন্থ সৃষ্টি করা কি করে সম্ভব হল তার ব্যাখ্যা কোন ঐতিহাসিক আজো পর্যন্ত দেননি।

যাই হোক, পূর্ব কথায় ফিরে আসি। দেবতাদের পার্থিব ইতিহাস শুরু হল মনু স্বায়ম্ভুবর কাল থেকে। বিষ্ণুপুরাণ বলছেন, 'হে মুনে। বরাহ কল্পে স্বায়ম্ভুব মনু যখন প্রথম মন্বন্তরের অধিপতি ছিলেন, সেই সময় এই বংশ অর্থাৎ প্রিয়ব্রতের বংশোৎ-পন্নরা রাজা হইয়াছিলেন। তদনন্তর স্বারোচিষ মন্বন্তর হইতে উত্তানপাদের বংশীয়-দিগের আধিপত্য হয়। এই স্বায়ম্ভুব বংশের পুত্র পরম্পরা দ্বারা জগৎ পূর্ণ হইয়াছে।'

স্বায়ম্ভুব মনুকে পৃথিবীর প্রথম রাজা বলা হচ্ছে। আধুনিক ঐতিহাসিকরাও একথা মেনে নিয়েছেন। তাঁরা বলেন, 'Maun Svayambhuva's capital lay on the bank of the river Sarasvati; He is said to have subdued all enemies and became the first King of the earth.' (The History and Culture of the Indian People—The Vedic Age, Bharatiya Vidya Bhaban, Bombay).

অথচ পুরাণ থেকেই আমরা জানতে পারছি যে স্বায়ম্ভুব মনুর আগেও দেবতাদের ইতিহাস রয়েছে। গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'পুরাণ প্রবেশ' গ্রন্থ অনুযায়ী এই ইতিহাসের ব্যাপ্তি প্রায় ৫০০০ বছর। কিন্তু এই দীর্ঘসময়ের ইতিহাস কালানুক্রমিক ভাব সাজানো নয়—। অথচ দেখা যাচ্ছে স্বায়ম্ভুব মনুর সময় থেকে দেবতাদের পার্থিব ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে যা কালানুক্রমিকভাবে বা Chronologically সাজানো।

এই সময় থেকে মনু গণনা শুরু হল।

আমরা আগেই বলেছি পুরাণকাররা জানাচ্ছেন যে, স্বায়ম্ভুব মনুর আগে দেবতারা নাকি কাল গণনা করতে পারতেন না। যীশুখৃস্টের জন্মকালকে স্থির বিন্দু কল্পনা করে যেমন আধুনিককালে খৃস্টাব্দ গণনা করা হয় স্বায়ম্ভুব মনুর কালকে স্থিরবিন্দু ধরে তেমনি মন্বন্তর গণনার শুরু হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে গিরীন্দ্রশেখর বসু তাঁর 'পুরাণ প্রবেশ' গ্রন্থে বলেছেন, 'যুগগণনা বহু পুরাকাল হইতে প্রচলিত থাকিলেও যুগের স্থিরবিন্দু কল্পনা প্রথমে হয় নাই। ইলাবৃতবর্ষে দেবতারা যুগ গণনা করিতেন। বায়ু ৩২ অধ্যায়ে আছে, তথায় দেবতারা ১০০০ পরিবৎসর কালবিন্দু স্থির না করিয়াই যুগগণনা করিয়া আসিতেছিলেন। যুগসকল চক্রবৎ ভ্রমণ করিতে থাকিলে দেবগণ কালের বশ্যতাপন্ন হইয়া তাহার ইয়ত্তা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন। তাঁহারা মহাদেবের শরণ লইলেন। মহাদেব কল্পমুখ নির্দিষ্ট করিলেন ও মনু গণনা আরম্ভ করাইলেন। স্বায়ম্ভুব মনুর আরম্ভ কল্পমুখ ও কৃতযুগ মুখ হইল এবং তাহাই স্থিরবিন্দু নির্দিষ্ট হইল। এই কালবিন্দু হইতেই ভারতের প্রকৃত হিসটরি বা ইতবৃত্ত আরম্ভ হইয়াছে বলা যায়।'

ইলাবৃতবর্ষে দেবতারা যুগগণনা করতেন। এই ইলাবৃতবর্ষ সপ্তদ্বীপা ভূমণ্ডলের জম্বুদ্বীপের একটি ভূখণ্ড। পৌরাণিক ভূমণ্ডল যে আমাদের বর্তমান পৃথিবী নয় তা ব্যাখ্যা করেছি আগের একটি অধ্যায়ে।

তাহলে স্বায়ম্ভুব মনুর কাল থেকে নতুন করে কালগণনা শুরু করা হল কেন? আমরা আগেই বলেছি যে, স্বায়ম্ভুব মনু হচ্ছেন পৃথিবীর প্রথম রাজা। দেবতাদের পার্থিব ইতিহাসের শুরু এই কাল থেকেই। তাহলে আমরা একথা কি বলতে পারি যে, দেবতারা স্বর্গে অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ষে যে যুগগণনা করতেন তা পৃথিবীতে কাজে লাগালেন না বা কাজে লাগাতে পারলেন না। পার্থিব উপনিবেশের কালকে চিহ্নিত করে রাখার জন্যে চালু করলেন মনুগণনা। স্বর্গের কালগণনা ও পার্থিব কালগণনার মধ্যে একটা ফারাক রাখার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল এই কারণে যে, স্বর্গের ঘটনাবলী ও পার্থিব ঘটনাবলী উল্লেখের সময় তা যেন স্পষ্টাস্পষ্টি আলাদাভাবে করা যায়। তাই দেবতারা পৃথিবীতে নেমে আসার প্রাক্কালে নতুন একটা কালগণনা শুরু করলেন।

আগেই বলেছি বেদ হচ্ছে একটি উন্নত জাতির সম্মিলিত জ্ঞানভাণ্ডার। দেবতারা নিজেদের গ্রহ চিরতরে ছেড়ে আসার সময় এরকম একটি জ্ঞানভাণ্ডার সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন এটাই স্বাভাবিক। আমরা জানি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ বিভাগ করে বেদব্যাস উপাধি পেয়েছিলেন। বিষ্ণু, বায়ু, কূর্ম পুরাণ মতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হচ্ছেন আটাশ নম্বর বেদব্যাস। তাহলে প্রথম বেদব্যাস কে? স্বায়ম্ভুব মনুই হচ্ছেন প্রথম বেদব্যাস। এও পুরাণেরই কথা। তাই আমাদের বিশ্বাস স্বায়ম্ভুব মনুই স্বর্গ থেকে

পৃথিবীতে নেমে আসার সময় নিজেদের সভ্যতার বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারকে সংক্ষিপ্তাকারে ও সাংকেতিক ভাষায় লিখে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। আর এই কাজের জন্যই তিনি প্রথম বেদব্যাস উপাধি পেয়েছিলেন। বেদ সাংকেতিক ও বীজাকারে আনার কারণ হচ্ছে এই যে, এই বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের চাবিকাঠি যেন অজ্ঞলোক বা শত্রুর হাতে গিয়ে না পড়ে। আমরা সবাই জানি যে বেদের আসল স্বরূপ আজো সাধারণ মানুষের কাছে অজ্ঞাত। বেদ গুরুমুখী বিদ্যা। বেদজ্ঞ গুরু যতক্ষণ শিষ্যকে এর গূঢ় রহস্য বুঝিয়ে না দিচ্ছেন ততক্ষণ বেদজ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়।

মনুপুত্রগণকেই মানব বলা হয়। অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনুর কাল থেকে দেবতারা মানব নামেও পরিচিত হলেন।

স্বর্গ ছেড়ে দেবতাদের পৃথিবীতে নেমে আসার কোন সূত্র কি পুরাণ থেকে পাওয়া যায়? বিষ্ণু পুরাণ বলেন, 'দিতির মহাবীর্য পুত্র হিরণ্যকশিপু পুরাকালে ব্রহ্মার বরে দর্পিত হইয়া ত্রৈলোক্যকে বশে আনিয়াছিল। ঐ দৈত্য ইন্দ্রত্ব করে এবং স্বয়ংই সবিতা, বায়ু, অগ্নি, বরুণ, সোম ও ধনাধিপ ও যম হইয়াছিল। আর স্বয়ং অশেষ যজ্ঞভাগ ভোগ করে। হে মুনিসত্তম! দেবগণ তাহার ভয়ে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া মানুষীতনু ধারণকরতঃ অবনীতে বিচরণ করিয়াছিলেন।'

হিরণ্যকশিপু কোন কাল্পনিক পুরুষ নন। তিনি ছিলেন দৈত্যদের আদি পিতা। ইনি প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন এবং দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে নিজেই ইন্দ্র হয়ে বসেছিলেন। গিরীন্দ্রশেখর বসু তাঁর 'পুরাণ প্রবেশ' গ্রন্থে হিরণ্যকশিপুর সময়কালেরও ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর সমসাময়িক। এই বিষ্ণু বামন বিষ্ণুর পূর্ববর্তী।

বামন বিষ্ণু ত্রেতাযুগের, তার পূর্ববর্তী বিষ্ণুর সময়কাল স্বভাবতই পড়বে সত্যযুগে। তাহলে হিরণ্যকশিপুর কাল আমরা সত্যযুগে ধরতে পারি। সত্যযুগের শুরু হচ্ছে ৫৯৫৮ খৃঃ পূঃ (পুরাণ প্রবেশ) অর্থাৎ ৭৯৬৮ বা প্রায় ৮০০০ বছর আগে।

স্বায়ম্ভুব মনুর কালও যে প্রায় ৮০০০ বছর পূর্বে। (পুরাণ প্রবেশ)

ব্যাপারটা কি কাকতালীয়?

না, কাকতালীয় মোটেও নয়।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর কাছে প্রচণ্ডভাবে হেরে গিয়ে দেবতারা ও তাদের মিত্রপক্ষরা স্বর্গ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। আমাদের সৌরমণ্ডল আর পৃথিবীর কথা তাদের জানাই ছিল। সুতরাং, তাঁরা এই পৃথিবীতেই এসে নামলেন আট হাজার বছর আগে। এঁদের নেতা ছিলেন স্বায়ম্ভুব মনু। তাই তিনি পৃথিবীর প্রথম রাজা।

স্বায়ম্ভুব মনুর রাজত্বকাল যেন একটি ঐতিহাসিক ল্যানডমারক। দেখা যাচ্ছে

স্বায়ম্ভুব মনুর আগেও ৫০০০ বছরের দেবতাদের ইতিহাস রয়েছে, তবু স্বায়ম্ভুব মনুকে কেন পৃথিবীর প্রথম রাজা বলে সম্মান জানানো হল ? তার কারণ স্বায়ম্ভুব মনুর আগে যাঁরা রাজা ছিলেন তাঁরা রাজত্ব করেছেন নিজেদের গ্রহে। আমাদের পৃথিবীর প্রথম রাজা হচ্ছেন স্বায়ম্ভুব বা প্রথম মনু।

* স্বায়ম্ভুব মনুর কাল থেকে দেবতাদের ধারাবাহিক ইতিহাস শুরু হল। সে ইতিহাস এই পৃথিবীর ইতিহাস।
* এই সময় থেকে কালগণনা শুরু হল।
* স্বায়ম্ভুব মনু প্রথম বেদব্যাস।
* এই কাল থেকে দেবতারাও মনুপুত্র বা মানব বলে পরিচিত হলেন।
* স্বায়ম্ভুব মনুর কালেই দেবতারা হিরণ্যকশিপুর ভয়ে নিজেদের গ্রহ অর্থাৎ স্বর্গ ছেড়ে আমাদের পৃথিবীতে নেমে আসেন।

এই ঘটনাগুলি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে ভিনগ্রহী দেবতারা পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন।

পৌরাণিক সময়কালকে আধুনিককালে পরিবর্তিত করেছি শ্রদ্ধেয় গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'পুরাণ প্রবেশ' গ্রন্থ অবলম্বনে। তবু আমার ধারণা স্বায়ম্ভুব মনু কালকে হয়তো আরো হাজার দুয়েক বছর পিছিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ভবিষ্যতের গবেষণাই একথা যাচাই করবে। আপাতত আলোচনার জন্য স্বায়ম্ভুব মনুর কাল তথা সত্যযুগ আরম্ভ কালকে আমা দশ হাজার বছর আগে ধরছি।

তাহলে মোটামুটিভাবে একথা বলতে পারি যে, ভিনগ্রহবাসী নভশ্চর দেবতারা ১০,০০০ থেকে ৮,০০০ বছর আগে আমাদের পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন এবং একটি ভূখণ্ডকে বেছে নিয়েছিলেন উপনিবেশ স্থাপনের জন্য। এই ভূখণ্ডটি ছিল ঠিক বিষুব রেখার উপরে।

রহস্যময় লেমুরিয়া

ভারত মহাসাগরের বুকে নিমজ্জিত লেমুরিয়া আমাদের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় ভূখণ্ড। লেমুরিয়া সম্বন্ধে আমার প্রথম গ্রন্থে প্রাথমিক আলোচনা করেছি। সে আলোচনার উদ্ধৃতি দিয়ে লেমুরিয়া তত্ত্ব নিয়ে একটু বিশদ আলোচনার ইচ্ছে আছে।

আমার প্রথম গ্রন্থে বলেছিলাম : বিজ্ঞানীরা বলেন সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে পৃথিবীর বুকে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে চলেছে। আজ আমরা ভূপৃষ্ঠের যে চেহারা দেখছি আগে সে রকম ছিল না। জার্মান বিজ্ঞানী Alfred Wegener তাঁর Origin of Continents and Ocean Basin বইয়ে প্রথম ভাসমান-মহাদেশ বা Conti-

nental Drift তত্ত্ব প্রচার করেন। ওয়েগ্‌নারের মতে প্রথমে পৃথিবীর বুকে সমস্ত ডাঙা মিলে একটি মহাদেশ ছিল। পরে চাঁদ ও সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের টানাপোড়েনে ও পৃথিবীর অভ্যন্তরের ভয়াবহ পরিবর্তনের ফলে মহাদেশটি ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যায়। বর্তমানের ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং এশিয়ার বৃহত্তর অংশ নিয়ে উত্তর গোলার্দ্ধে রইল লাউরেশিয়া আর দক্ষিণ গোলার্দ্ধে রইল বর্তমানের দক্ষিন আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, অস্ট্রেলিয়া এবং সুমেরু মহাদেশ। এর নাম গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড।

পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকালে একটি অদ্ভুত দৃশ্য আমাদের নজরে পড়বে। দেখা যাবে যে এক একটি মহাদেশের সীমারেখা আর একটি মহাদেশের সীমারেখার সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে, যদিও এখন এই সব মহাদেশের মধ্যে হাজার কিলোমিটার সমুদ্রের ব্যবধান রয়েছে।

ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে যে মহাদেশগুলির তটরেখার ভূত্বকের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের ভূত্বকের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূলের ভূত্বকের যথেষ্ট মিল আছে। এই দুই মহাদেশের দুই উপকূলে এমন পাহাড় রয়েছে যাদের ভূস্তর একই ধরণের এবং এইসব পাহাড়ে একই ধরণের খনিজ পদার্থ পাওয়া গেছে।

লক্ষ লক্ষ বছর আগে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বৃটিশ প্রাণীতত্ত্ববিদ Philip Sclater মনে করেন যে ভারত মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিমে লেমুরিয়া নামে এক বিরাট ভূখণ্ডের অস্তিত্ব ছিল। লেমুরিয়া গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের উত্তর অংশ। গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড ভেঙে যাওয়ার বহু লক্ষ বছর পরেও লেমুরিয়া জলের উপর জেগে ছিল। বহু বিজ্ঞানী Sclater-এর মতকে সমর্থন করেন। আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্বের ম্যাডাগাস্কার দ্বীপ (বর্তমানে যার নাম মালাগাসি) লেমুরিয়ার অংশ। তাই দেখা যায় মালাগাসির উদ্ভিদ ও প্রাণীর সঙ্গে আফ্রিকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর খুব বেশী মিল নেই কিন্তু ভারতের উদ্ভিদ ও প্রাণীর সঙ্গে তাদের মিল অনেক বেশী।

ভূবিজ্ঞানীরাও বিশ্বাস করেন যে বহুকাল আগে এক বিরাট ভূখণ্ড ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল—যার নাম লেমুরিয়া এবং কালক্রমে এই লেমুরিয়া ভারত মহাসাগরের গর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে।

যাহোক কিভাবে লেমুরিয়া তত্ত্বের উদ্ভব হল ও এর স্বপক্ষে যুক্তিতর্কের অবতারণা হল তা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বিজ্ঞানীরা প্রথম লেমুরিয়া নামক ভূখণ্ডের কথা উল্লেখ করলেন। ভারতের সঙ্গে আফ্রিকার পাহাড়, জীবাশ্ম ও জীবজন্তুর কিছু কিছু মিল খুঁজে পেলেন বিজ্ঞানীরা। একটি প্রাণী বিজ্ঞানীদের খুবই ধাঁধায় ফেলল। এর নাম 'লেমুর'। বাঁদর ও মানুষের সঙ্গে

সম্পর্কযুক্ত স্তন্যপায়ী এই জীবটি দেখতে ছিল বাঁদর আর কাঠবিড়ালীর মাঝামাঝি। এদের প্রধান বাসস্থান ছিল ম্যাডাগাস্কার, কিন্তু আফ্রিকা, ভারতবর্ষ ও মালয় দ্বীপ-পুঞ্জেও এই জীবটির খোঁজ পাওয়া গেল। চার্লস ডারউইন এর 'On the origin of Species গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ার পর (১৮৫৯) এই লেমুর রহস্য নিয়ে বিতর্ক শুরু হল। এই সময়ে প্রাণী সৃষ্টির ব্যাপারে দুটি মত ছিল। একদলের মত হচ্ছে ঈশ্বর প্রাণী সৃষ্টি করে পৃথিবীতে ছেড়ে দিয়েছেন; আর একদলের মত হচ্ছে না বিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রাণীসৃষ্টি হয়েছে। প্রথম মতবাদ অনুযায়ী ঈশ্বর প্রাণী সৃষ্টি করে তাঁর ইচ্ছেমত পৃথিবীর যে কোন স্থানে ছেড়ে দিতে পারেন। কিন্তু ডারউইন ও তাঁর স্বপক্ষীয় বিবর্তনবাদীদের মতানুযায়ী কোন প্রাণী যদি বিশেষ কোন ভূখণ্ডে বিবর্তিত হয় তাহলে তার পক্ষে হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী স্থানে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই এই লেমুর বিবর্তনবাদীদের কাছে একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিল। আফ্রিকা, ভারতবর্ষ ও মালয়দ্বীপপুঞ্জে লেমুর দেখা যায়, তাহলে বলতে হয় কোন এক কালে এই জায়গাগুলি ভূখণ্ড দিয়ে যুক্ত ছিল, তা নইলে লেমুরের পক্ষে নিশ্চয় হাজার হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আফ্রিকা ও ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়ানো সম্ভব হত না। প্রাণীতত্ত্ববিদরা খুবই দ্রুত এ সমস্যার সমাধান করে ফেললেন। তারা বললেন যখন লেমুরের উদ্ভব হয় সেই সময়ে ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার মধ্যে একটি ভূখণ্ডের মাধ্যমে যোগাযোগ ছিল। তাই লেমুরদের পক্ষে আফ্রিকা ও ভারতবর্ষে যাতায়াত করা সম্ভব হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই ভূখণ্ড ভারতমহাসাগরে নিমজ্জিত হয়। বৃটিশ প্রাণীতত্ত্ববিদ Philip L. Sclater বললেন 'লেমুর'দের সম্মানে এই মহাদেশের নাম রাখা যাক লেমুরিয়া। সঙ্গে সঙ্গে বহু বিজ্ঞানী লেমুরিয়ার কথা মেনে নিলেন আগ্রহের সঙ্গে। Alfred Russel Wallace, যিনি ডারউইনের সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধীনভাবে বিবর্তনবাদ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তিনি লিখলেন লেমুরিয়ার অস্তিত্ব নিশ্চয় সম্ভব। তিনি আরো লিখলেন, 'It (Lemuria) represents what was probably a primary Zoological region in some past geological epoch ; but what that epoch was and what were the limits of the region in question, we are quite unable to say. If we are to suppose that it comprised the whole area now inhabited by lemuroid animals, we must make it extended from West Africa to Burmah, South China and Celelees, an area which it possibly did once occupy'.

লেমুরিয়ার সমর্থকদের মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন জার্মান প্রকৃতিবিদ Ernst Heinrich Haeckel. তিনি বললেন লেমুরিয়ার অস্তিত্ব মেনে নিলে তা

শুধু 'লেমুর'দের চলাচলের সমস্যাই সমাধান করবে না, তা সমাধান করবে একটি মৌলিক সমস্যার—অর্থাৎ মানুষ কি করে উদ্ভব হল—সে সমস্যারও সুষ্ঠু সমাধান করবে। ১৮৭০ সালে তিনি বললেন, বর্তমান পাঁচটি মহাদেশের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া অথবা আমেরিকা, কিম্বা ইউরোপে আদিম মানুষের উদ্ভব হয় নি। দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকায় এই সম্ভাবনা থাকলেও সুনির্দিষ্টভাবে কোন ধারাবাহিক ইতিহাস আমাদের হাতে এসে এখনো পৌঁছোয় নি। তাই আমাদের বিশ্বাস এই পৃথিবীর এমন একটি ভূখণ্ডে প্রথম মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল যে ভূখণ্ড এখন সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত। তিনি আরো লিখলেন, 'By assuming this Lemuria to have been man's primeval home, we greatly facilitate the explanation of the geographical distribution of the human species by migration.

যেহেতু তখনো পর্যন্ত মানুষের জীবাশ্ম বা মানুষ ও বাঁদরের মাঝামাঝি কোন জীবের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয় নি, তাই বিজ্ঞানীরা লেমুরিয়াকে মেনে নিয়ে বললেন এই লেমুরিয়াতেই প্রথম মানুষের উদ্ভব হয়েছিল। লেমুরিয়া বর্তমানে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত তাই ওই ধরনের কোন জীবাশ্ম আমরা খুঁজে পাই নি। পরবর্তীকালে অবশ্য বির্বতনবাদীদের লেমুরিয়া তত্ত্বের উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয় নি। কিন্তু লেমুরিয়া তত্ত্বকে সহজে হঠানো সম্ভব হল না। এবার এই তত্ত্বের স্বপক্ষে এগিয়ে এলেন অকাল্টিস্টরা বা অতীন্দ্রিয়বাদীরা।

থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতৃ Madame Helena Petrovna Blavatsky আধুনিক যুগের একজন বিখ্যাত অকাল্টিস্ট, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এক বিশাল গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। এই গ্রন্থের নাম 'The Secret Doctrine.' এই গ্রন্থে মাদাম ব্লাভাটস্কি তাঁর দার্শনিক চিন্তাভাবনা প্রকাশ করে লিখলেন যে এই সব চিন্তাভাবনা হচ্ছে প্রাচীন ঋষিদেরই চিন্তাভাবনা। সেই মহাত্মারাই তাঁদের তিব্বতীয় রাজধানী থেকে এই পৃথিবী পরিচালনা করছেন। এঁরা অলৌকিক জীব এবং তাঁরাই তাঁদের জ্ঞানের অংশ মাদাম ব্লাভাটস্কিকে দান করেছেন। মাদাম জানালেন যে তাঁর 'Secret Doctrine' আসলে বহু প্রাচীন 'ধ্যান পুঁথি'কে অবলম্বন করে লেখা। তাল পাতায় লেখা 'ধ্যান পুঁথি' লুপ্ত 'Senzar' ভাষায় লেখা। এটি লেখা হয়ে ছিল আটলান্টিসে। আটলান্টিসের আলোচনা ছাড়াও এতে লেমুরিয়ার কথাও আলোচিত হয়েছে।

মাদাম ব্লাভাটস্কির রচনা খুব সহজ বোধ্য নয়। যাহোক তিনি পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে এ কথা উল্লেখ করেছেন যে আমরা হচ্ছি 'পঞ্চম ধাপের জাতি'। পৃথিবীতে এইরকম সাতটি জাতি ও সাতটি উপজাতি রাজত্ব করবে। তাঁর মতে 'প্রথম ধাপের জাতি' হচ্ছে অদৃশ্য, আগ্নেয়-কুয়াশায় তাদের দেহ তৈরী। তাঁরা

বাস করে এক অক্ষয় স্বর্গে। 'দ্বিতীয় ধাপের জাতি' কিছুটা দৃশ্য। এদের বাস হচ্ছে Hyperborea তে। 'তৃতীয় ধাপের জাতি' হচ্ছে লেমুরিয়াবাসী। 'চতুর্থ ধাপের জাতি' হচ্ছে আটলান্টিসের অধিবাসী। আর আমরা হচ্ছি 'পঞ্চম ধাপের জাতি'। 'ষষ্ঠ ধাপের জাতি' আমাদের থেকেই উদ্ভূত হবে এবং তারা আবার লেমুরিয়াতে ফিরে গিয়ে বসবাস করবে। 'সপ্তম ধাপের জাতি'র পর পৃথিবী থেকে মানুষ বিদায় নেবে—এরপর নতুন মানবসভ্যতা সৃষ্টি হবে বুধ গ্রহে।

মাদাম ব্লাভাটস্কির মতে লেমুরিয়াবাসীরা অতীন্দ্রিয় শক্তির অধিকারী ছিল। তারা নাকি টেলিপ্যাথির সাহায্যে কথাবার্তা চালাতো।

এই প্রসঙ্গে তিব্বতের জ্ঞানগঞ্জের কথা বোধ হয় অবান্তর হবে না। স্বামী অমলানন্দ সরস্বতীর 'পরলোক-প্রসঙ্গ' গ্রন্থে এই জ্ঞান-গঞ্জের যে কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী আছে তা উল্লেখ করছি।

'পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা যে মহাকাশ নিয়ে গবেষণারত তা তাঁরা নতুন কিছু করছেন না। ভারতীয় যোগীরা লোক-লোকান্তরের যে সমস্ত বিবরণ দিয়ে এসেছেন তা বিস্ময়কর। এই মহাকাশে বা বায়ুমণ্ডলে অসংখ্য বস্তু রয়েছে। এই সমস্ত বস্তু জীবের কল্যাণকারক এবং অনেক অকল্যাণকারকও আছে। মানুষ নিজ বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা সেগুলি কাজে লাগাতে ধীরে ধীরে সক্ষম হচ্ছেন।

'সূর্য্যরশ্মি, চন্দ্ররশ্মি, তারকারশ্মিকে অবলম্বন করে যোগীরা অনেক মহাকল্যাণকর কাজ করেন বা করতে পারেন। আজ বিজ্ঞানীরাও কিছু কিছু রশ্মি চিকিৎসা করছেন। তিব্বত অঞ্চলে 'জ্ঞান-গঞ্জ' নামে একটি স্থান আছে যেখানে সমগ্র বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণের গবেষণা হচ্ছে। এ সম্বন্ধে কাশীর বিশুদ্ধানন্দ স্বামী অনেক কিছু জ্ঞাত ছিলেন। বিশুদ্ধানন্দ স্বামী মহামনীষী গোপিনাথ কবিরাজ মহাশয়কে কিছু কিছু বিষয় বলেছিলেন তাই তাঁর লিখিত পুস্তকাদিতে বিবরণ পাওয়া যায়। বিশুদ্ধানন্দ স্বামী সূর্য্যরশ্মি হতে বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য তৈরী করতে পারতেন। তাঁর কাছে যাঁরাই উপস্থিত হতেন তাঁরাই তাঁর অলৌকিক শক্তির কিছু না কিছু সন্দর্শন করতেন। তিনি এই বিদ্যা শিখে এসেছিলেন জ্ঞানগঞ্জ হতে। এই জ্ঞানগঞ্জ ঠিক কোথায় অবস্থিত তা খুব কম ব্যক্তিরাই অবগত আছেন।

'এই জ্ঞানগঞ্জ সম্বন্ধে বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের শিষ্য শ্রী অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় লিখেছেন—শ্রীশ্রীগুরুদেব জ্ঞানগঞ্জ সম্বন্ধে যে বিবরণ দিতেন সে সকল মোটের উপর স্থূলেরই বিবরণ তবে অসামান্যতা তাহাতে অবশ্যই যথেষ্ট আছে। স্থূলের দিকে বলা যায় জ্ঞানগঞ্জ যাওয়ার পথ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন—জলন্ধর হইতে (হিমালয়ের মধ্যে) গোগা পর্য্যন্ত যানবাহন পাওয়া যায়। তাহার পর পায়ে হাঁটিয়া যাইতে হয়। তাহাতে সময় দুই মাস লাগে। মাঝে মাঝে চটি আছে,

তথায় চিড়া আর দধি পাওয়া যায়। পথে বরফ আছে—স্থানে স্থানে কর্দ্দমের মত নরম বরফে পা কিছুদূর ডুবিয়া যায়।……জ্ঞানগঞ্জে বহু ব্রহ্মচারী, দণ্ড, সন্ন্যাসী, তীর্থস্বামী, পরমহংস, ভৈরবী, ব্রহ্মচারিণী ও কুমারীও আছেন। আশ্রমে সকলকে ঢুকিতে দেওয়া হইলেও বাহিরের কোন লোককে থাকিতে দেওয়া হয় না। তথায় সর্বদা যোগচর্য্যার সঙ্গে বিজ্ঞান-চর্চ্চা হয়। বিজ্ঞান অর্থে—সূর্যবিজ্ঞান, চন্দ্রবিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। পরমহংসগণ অনেকে বিজ্ঞান গবেষণা নিয়েই থাকেন। বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সাহায্যে অতি কঠিন কঠিন রোগেরও প্রতিকার করা হয়।……কাবার সূর্য্যবিজ্ঞানাদি বিজ্ঞানের শিক্ষার গুরু হইতেছেন পরমহংস শ্রীশ্যামানন্দ। তিনিই জ্ঞানগঞ্জের বিজ্ঞান চর্চ্চার ভারপ্রাপ্ত। জ্ঞানগঞ্জে বিজ্ঞান বলে প্রস্তুত আকাশযান আছে। প্রতিরাত্রি পূর্ণ চন্দ্রালোকে আলোকিত থাকে। এইরূপ আরো বহু অসাধারণ বৃত্তান্ত আছে।

'এই জ্ঞানগঞ্জ হতে সারা বিশ্বের মানুষের বহুবিধ সমস্যাসকলের সমাধান করার ব্যবস্থা আছে। জ্ঞানগঞ্জ হতেই লোকালয়ের মানুষদের চিকিৎসাদির ব্যবস্থা আছে—বায়ুমণ্ডলের মাধ্যমে।'

এ প্রসঙ্গে মন্তব্য নিস্প্রয়োজন। বুদ্ধিমান পাঠক সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে মাদম ব্লাভাটস্কির মন্তব্য, 'সেই মহাত্মারাই তাঁদের তিব্বতীয় রাজধানী থেকে এই পৃথিবী পরিচালনা করছেন', নিশ্চয় পাগলের প্রলাপ নয়। সুতরাং তাঁর লেমুরিয়া তত্ত্বের মধ্যে অলীক কল্পনা থেকে সত্যের আভাসই বেশী।

যাহোক মাদাম ব্লাভাটস্কির মৃত্যুর পর (১৮৯১ খ্রীঃ) তাঁর শিষ্যা এ্যানি বেসান্ট, লেমুরিয়া ও তার অধিবাসীদের সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। আর একজন বৃটিশ থিওসফিস্ট W. Scott-Eliot ও এই একই কাজ করেন। তিনি মাদাম ব্লাভাটস্কির কাহিনীকে আরও উজ্জ্বল করে তোলেন। এসব কাহিনী নাকি তিনি পেয়েছিলেন 'থিওসফিক্যাল মাস্টার'দের কাছ থেকে। তিনি পৃথিবীর সঙ্কটকালের বেশ কতকগুলি সম্পূর্ণ মানচিত্রও পেয়েছিলেন। এগুলি থেকে ছ'খানা মানচিত্র তিনি প্রকাশ করেছিলেন তাঁর, 'The Story of Atlantis and the lost Lemuria' গ্রন্থে (১৮৯৬ খ্রীঃ)। এ গ্রন্থ এখনো থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে আছে।

Scott-Eliot বলেছেন দ্বিতীয় ধাপের জাতির দেশ Hyperboria ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর, বিশ্বের অদৃশ্য কর্মকর্তারা, যারা মনু মামে পরিচিত, তাঁরা লেমুরিয়াকে বেছে নিলেন 'তৃতীয় ধাপের জাতি'র উদ্ভবের জন্য। মনুরা মানুষ সৃষ্টির চেষ্টা করলেন। প্রথমে সৃষ্টি হল জেলীর মত জীব। পরবর্তীকালে এদের দেহ শক্ত হয়ে উঠল।

Scott-Eliot বলেছেন এই লেমুরিয়াবাসীরা যখন পঞ্চম উপজাতিতে বিবর্তিত

হল তখন তারা যৌনক্রিয়ার সাহায্যে বংশবৃদ্ধি করতে শিখল। কিন্তু এই সময় তারা পশুদের সঙ্গেও সঙ্গমক্রিয়ায় রত হতে লাগল এবং বানর ও অন্যান্য কদাকার পশুর জন্ম দিতে শুরু করল। এই ব্যাপারে 'লা' (Lhas) খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন। এই লা হচ্ছেন এক অতিলৌকিক পুরুষ। ইনি এই সময় মানুষরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে বিবর্তিত লেমুরিয়াবাসীদের সাহায্য করবেন বলে ঠিক করেছিলেন; কিন্তু লেমুরিয়াবাসীদের এই অধঃপতন দেখে বিরক্ত হয়ে আর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন না। তখন লার কার্যভার গ্রহণ করল শুক্রগ্রহের জীবেরা। শুক্রবাসীদের বলা হত 'অগ্নির-সম্রাট।' তারা নিজেদের গ্রহে এক উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল। তারা লেমুরিয়াবাসীদের শিক্ষিত করে তুলতে লাগল। কিভাবে অমর হওয়া যায়, কি ভাবে অবতার রূপে অবতীর্ণ হওয়া যায় তাও শুক্রবাসীরা লেমুরিয়াবাসীদের শেখালো। সপ্তম উপজাতি উদ্ভব হওয়ার সময়ে লেমুরিয়াবাসীরা মানুষের মত দেখতে হয়ে ওঠে ও সভ্যতার চরম শিখরে আরোহন করে। ল্যাপরা ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরাই নাকি লেমুরিয়াবাসীদের বংশধর।

ষষ্ঠ ও সপ্তম উপজাতি উদ্ভবের সময় থেকে লেমুরিয়া ধীরে ধীরে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হতে শুরু করে। Scott-Eliot এর মতে ইউরোপের ক্রো-ম্যাগনন মানুষেরা হচ্ছে লেমুরিয়াবাসীদের বংশধর। তাঁর মতে এ্যাজটেক, টলটেকরা, আর্যরা, আধুনিক হিন্দু ও ইউরোপীয়ানরাও লেমুরিয়াবাসীদের বংশধর।

Richard E. Mooney, তাঁর 'Gods of Air and Darkness' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, 'That it is possible that man neither evolved, nor was divinely created, but arrived here as a Colonist from Worlds elsewhere in space.' অর্থাৎ খুব সম্ভবতঃ পৃথিবীতে মানুষ বিবর্তনের ধারাপথে সৃষ্টি হয় নি, ঈশ্বরও তাকে সৃষ্টি করে নি, সে মহাকাশের কোন এক জগৎ থেকে পৃথিবীতে নেমে এসেছে ঔপনিবেশিক রূপে।

পরমেশ চৌধুরী তাঁর 'মানুষের পূর্বপুরুষ অন্য গ্রহের মানুষ' গ্রন্থে বলেছেন, 'এ পৃথিবীতে অন্য গ্রহ থেকে মহাকাশচারীরা আসতেন, তারা পৃথিবীতে কলোনী স্থাপন করেছিলেন।'

যাহোক এখন সেই লুপ্ত লেমুরিয়া উদ্ধার করা যায় কি না তা দেখা যাক।

দেব-গন্ধর্বদের আদি পার্থিব উপনিবেশ

দেব-গন্ধর্বরা তাঁদের নিজেদের গ্রহ থেকে আমাদের এই শ্যামলা পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে তাঁরা কোথায় প্রথম উপনিবেশটি গড়ে তুলেছিলেন?

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বহু প্রাচীন রহস্যময় সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে; যেমন সুমের, মোহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পা, মিশর, চীন, মায়া, ইস্টারদ্বীপ ইত্যাদি। এইসব সভ্যতা কোনটিই ছ'হাজার বছরের বেশী পুরোনো নয়। আগের অধ্যায়ে দেবতারা যে দশহাজার থেকে আট হাজার বছর আগে পৃথিবীতে এসেছিলেন তার সাক্ষ্য প্রমান দিয়েছি। তাহলে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সভ্যতার কেন্দ্রভূমিগুলিকে দেবতাদের আদি উপনিবেশ বলা যায় না।

দেবতাদের আদি পার্থিব উপনিবেশটি এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। আমাদের কল্পনাকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এই ভূখণ্ডটি আবিষ্কারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ অধ্যায়ে আমরা সেই চেষ্টা করব।

এই ভূখণ্ডটি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বহুদিন থেকেই জল্পনা-কল্পনা শুরু করে দিয়েছেন। আমার প্রথম গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনাব সূত্রপাত করেছিলাম। এখানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে দেবতাদের সেই আদি উপনিবেশের নাম হচ্ছে লেমুরিয়া। ভূবিজ্ঞানীরা বলেন যে প্রাচীন কালে ভাবতের দক্ষিণ প্রান্ত ও আফ্রিকাব দক্ষিণ প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত ছিল এক বিবাট ভূখণ্ড। এই ভূখণ্ডেরই নাম ছিল লেমুরিয়া। লেমুরিয়া আজ ভারত মহাসাগরের বুকে নিমজ্জিত। বিজ্ঞানীরা বলেন এই লেমুরিয়াতে মানব সভ্যতার প্রথম উন্মেষ হয়েছিল। সোভিয়েত বিজ্ঞানী Alexander Kondratov এর দৃঢ় বিশ্বাস যে লেমুরিয়াতে ছিল উন্নত ও সভ্য মানুষের বাস। এখানে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার একটি প্রধান অংশ ছিল দ্রাবিড় সভ্যতা।

তামিলদের উপকথা বলে যে তাদের আদি বাসভূমি ছিল ভারত মহাসাগরের বুকে কোন এক দ্বীপে। কালক্রমে সেই দ্বীপ সমুদ্রগর্ভে ডুবে যায়। প্রাচীন তামিল ঐতিহাসিকদেরও বিশ্বাস যে তাদের আদি বাসভূমি তামালাহাম হচ্ছে নাওয়ালাম দ্বীপের অংশ। প্রাচীনকালে বিষুবরেখার কাছাকাছি এই দ্বীপের অস্তিত্ব ছিল। Kondratov তাঁর 'Riddles of the three Oceans' গ্রন্থে বলেছেন যে তামিল ঐতিহাসিকরা সংঘের কথা উল্লেখ করে থাকেন। এই সংঘ গঠিত হত বিখ্যাত কবি ও জ্ঞানীগুণীদের নিয়ে। প্রাচীন সংঘ গঠিত হয়েছিল 'দক্ষিণ মহাদেশে' বা লেমুরিয়াতে সম্ভবতঃ দশ হাজার বছর আগে তামিল ইতিহাসের আদি কালে। তারপর এই সংঘগুলি লেমুরিয়া ও তার রাজধানী 'দক্ষিণ মাদুরা' ভারত মহাসাগরের বুকে ডুবতে থাকার কালে আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যায়।

K. A. Nilkanta Sastri তাঁর 'A History of South India' গ্রন্থে এই সংঘ বা সংগম এর উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন 'The first well-lighted epoch in the history of the Tamil land is that reflected in the

literature of Sangam—the earliest stratum of Tamil literature now available.' তিনি বলেছেন এই সংঘ সাহিত্যে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা থাকলেও বহু কাল্পনিক কাহিনীও আছে। এই সংঘগুলির সময়কাল ৯৯৯০ বৎসর আগে। শ্রী-শাস্ত্রীর ধারণা এই সংঘ কাব্যগুলিতে বহু সংস্কৃত শব্দ ও ভাবধারা গ্রহণ করা হয়েছিল। এই ধরণের কাব্যে বিষ্ণু (তিরুমল) মুরুগা ও ভৈগৈ নদীর স্তব করা হয়েছে। এই সব স্তব মন্ত্র বা সংগীতের ভাবধারার মধ্যে উপনিষদের ও পুরাণের ভাবধারা রয়েছে। হিরণ্যকশিপুর ছেলে প্রহ্লাদের কথা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইন্দ্র-অহল্যার কাহিনী বর্ণিত আছে। তামিল সংঘ ও বৈদিক সাহিত্যের সভা সমিতির মধ্যে একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। শ্রদ্ধেয় শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র মহাশয় তাঁর 'স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা' গ্রন্থে বলেছেন, অথর্ববেদের সপ্তমকাণ্ডের দ্বাদশসূক্তে রাষ্ট্রসভা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবৃতি প্রদান করা হয়েছে। 'সভা' এবং 'সমিতি'—এই দুটিকে বলা হয়েছে প্রজাপতির দুহিতা। *** এই সভা সমিতিতে প্রত্যেকে সমবেত হয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হতেন। ***এই সভাকে দেবগণ তাঁদের ইষ্ট বা হিতকারী বলে জানতেন। এই সভার সদস্যগণ 'সবাচসঃ' অর্থাৎ আলাপ আলোচনায় একমত হবেন, এটাই ছিল কাম্য। এই সভাসমিতিতে যাঁরা সমাসীন হতেন তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিত্ব স্থাপন করতেন এবং বিজ্ঞানীদের উপযুক্ত যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করতেন। ইন্দ্র যেন এই সংসদের প্রত্যেকের প্রতি সদয় থাকেন, এই ছিল সকলের মনোগত বাসনা। সভাসমিতির কাজে যাতে সকলে নিবিষ্টভাবে যুক্ত থাকেন এবং একান্তভাবে মনঃসংযোগ করেন সেইরকম অনুরোধ জানান হত।'

অথর্ববেদের সভাসমিতির চারিত্রিক বৈশিষ্টই খুঁজে পাওয়া যায় প্রাচীন তামিল ঐতিহাসিকদের উল্লিখিত 'সংঘে'র চারিত্রিক বৈশিষ্টের সঙ্গে। সংঘও গঠিত হত বিখ্যাত কবি ও জ্ঞানীগুণীদের নিয়ে। ব্যাপারটা কাকতালীয় নয়। ভিনগ্রহবাসী দেবতারা তাঁদের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা আমদানী করেছিলেন অথর্ববেদের মাধ্যমে এবং সেই রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা চালু করেছিলেন তাঁদের পার্থিব উপনিবেশ লেমুরিয়াতে। তারই স্মৃতি বহন করে চলেছেন প্রাচীন তামিল ঐতিহাসিকরা। এ সম্বন্ধে আরো গভীরভাবে অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে বলেই আমরা মনে করি।

যাহোক তামিল ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে আমরা বিষুবরেখার নিকটবর্তী কোন ভূখণ্ডের কথা জানতে পারছি। এই ভূখণ্ডের নাম ছিল 'দক্ষিণ-মহাদেশ,' এর রাজধানী ছিল মাদুরা। এই দেশই কি লেমুরিয়া? তামিল ঐতিহাসিকদের কথা থেকে আমরা আরো জানতে পারছি যে এই দক্ষিণ মহাদেশ আস্তে আস্তে সমুদ্রগর্ভে ডুবে যায়। এই সময় সংঘগুলিও নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে আমরা হয়তো একথা বলতে পারি যে আটহাজার থেকে দশহাজার বছর আগে লেমুরিয়ার

টুকরো টুকরো পার্বত্য দ্বীপগুলি সমুদ্রের বুকে জেগেছিল। 'নাওয়ালাম' দ্বীপ হয়তো এরকমই একটা দ্বীপ ছিল। এই 'নাওয়ালাম'ই হয়তো ছিল লঙ্কা দ্বীপ। ভারত মহাসাগরের গভীরে অনুসন্ধান না করা পর্যন্ত এই লেমুরিয়া বা লঙ্কার খোঁজ হয়তো পাওয়া যাবে না; কিন্তু কিছু কিছু তথ্য ও প্রাচীন কাহিনী বা কিম্বদন্তী যে লেমুরিয়ার অস্তিত্ব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সেগুলোকেই বা আমরা অস্বীকার করি কি করে?

অতি সম্প্রতি ভারত মহাসাগরের গভীরে আবিষ্কৃত হয়েছে Lanka Ridge বা লঙ্কা পর্বতশ্রেণী। এর অবস্থান সিংহল থেকে ১০০০ কিলোমিটার দূরে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা গবেষণা-জাহাজ Vityaz য়ে করে গবেষণা চালাবার সময় একটা বিশাল পর্বত দেখতে পেয়েছেন জলের তলায়। এর নাম রেখেছেন তাঁরা Mt Afanasy Nikitin। ষোড়শ শতাব্দীর রাশিয়ান পর্যটক যিনি প্রথম ভারতে পদার্পন করেছিলেন সেই নিকিতিন এর সম্মানে এই নাম করণ করা হয়েছে।

মালাগাসীর উত্তর প্রান্তে ডিয়াগো সুয়ারেজ এর অধিবাসীদের মধ্যে 'সবুজ জলের নীচে দুর্গ' এই কাহিনী প্রচলিত আছে। এর মধ্যে কি কোন সত্য লুকিয়ে আছে? Kondratov বলেছেন 'Is there any factual basis for the legends about an underwater Castle "in the depths of the Green Waters" that have been recorded among the Malagasy who lived in the environs of Diego-Suarez, a harbour and town near the northern end of Madagascar?'

লেমুরিয়া রহস্য উন্মোচন করতে আমাদের সাহায্য করবে স্বর্ণলঙ্কা। তামিলরা যে 'নাওয়ালাম' দ্বীপের কথা বলেন তার কি কোন বাস্তব অস্তিত্ব আছে? এই 'নাওয়ালাম'ই কি রাবণের স্বর্ণলঙ্কা? রাবণ ও তো দ্রাবিড় রাজা ছিলেন, একথা আধুনিক ঐতিহাসিকরাই স্বীকার করে থাকেন।

আধুনিক শ্রীলঙ্কা (সিংহল) যে স্বর্ণলঙ্কা নয় সে সন্দেহের সূত্রপাত করেছিলাম আমার প্রথম গ্রন্থে। ঐতিহাসিকরাও এ ব্যাপারে একমত নন। রামায়ণের কাল নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক Keith বলেন যে সিংহলদ্বীপই যে রাবণের লঙ্কা এর কোন জোরালো প্রমাণ নেই। আবার শ্রদ্ধেয় H. C. Raychowdhury গরুড় পুরাণের একটি শ্লোকের-উপর নির্ভর করে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে সিংহলই রাবণের লঙ্কা।

সিংহলকে লঙ্কা বলে ধরে নেওয়া শুরু হয়েছে খুব সম্ভবতঃ বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে। মহাবোধি বংশ পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে তম্বপন্নিই (সিংহল) হচ্ছে লঙ্কা।

আনন্দময় মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রামায়ণের যুগে ভারত সভ্যতা' গ্রন্থে মন্তব্য

করেছেন, 'লঙ্কা রাজ্যের বিস্তার যে কতদূর ছিল এবং ইহার সঠিক অবস্থান যে কোথায় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এ বিষয়ে বহু ঐতিহাসিক নানা প্রকার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে মোটামুটি ইহাই মনে হয় যে রাবণের লঙ্কার বিস্তার আরো অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, পরবর্তীকালে তাহা সমুদ্রজলে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে।' ইনি অবশ্য বর্তমান সিংহলকে লঙ্কা মনে করেই উপরের মন্তব্য করেছেন। সিংহল ও লঙ্কা এক নয়। এ দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ভূখণ্ড। শ্রী মুখোপাধ্যায় সিংহল ও লঙ্কা ঘুলিয়ে না ফেললে লঙ্কা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা সত্যের খুব কাছাকাছি।

সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসের মূল উৎস হচ্ছে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পালি ভাষায় রচিত মহাবংশ নামে মহাকাব্য। মহাবংশ থেকে আমরা জানতে পারি যে রাজা সিংহবাহুর ছেলে বিজয় লঙ্কার তম্বপন্নি অঞ্চলে এসে উঠেছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৫৫০ অব্দে বঙ্গের বিজয় সিংহ লঙ্কা জয়ের পর থেকেই নাকি লঙ্কার নাম হয়েছে সিংহল। খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দে সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। সম্রাট অশোকের ছেলে মহিন্দ সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন। মহিন্দ পাটলিপুত্র থেকে বেদসগিরি হয়ে তম্বপন্নিতে গিয়েছিলেন।

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা তাঁর 'বৌদ্ধ যুগের ভূগোল' গ্রন্থে বলেছেন, 'অশোক অনুশাসনে তম্বপন্নির উল্লেখ পাওয়া যায়।' তিনি আরো মন্তব্য করেছেন, 'আমাদের মনে হয় যে তম্বপন্নি ও লঙ্কা অভিন্ন।'

টলেমী বলেছেন, 'তপ্রবেন দ্বীপ অনবরত নাম পাল্টাইয়াছে, রামায়ণে এবং
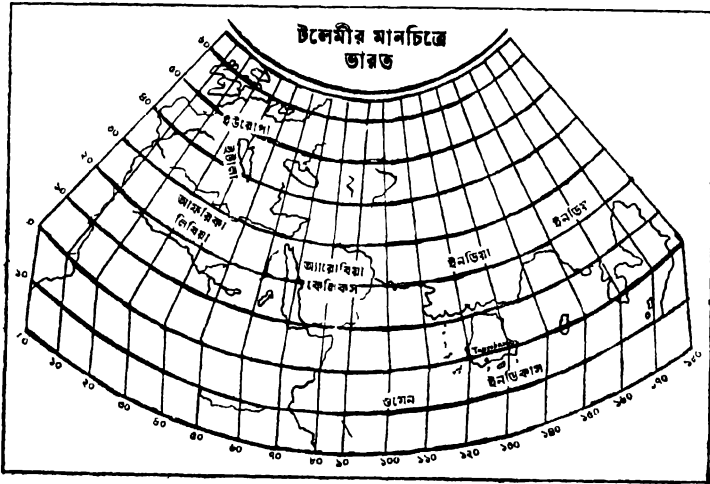
টলেমীর মানচিত্রে বিষুবরেখার উপর অবস্থিত তপ্রবেন দ্বীপ

অন্যান্য সংস্কৃত পুস্তকে ইহাকে লঙ্কা বলা হইয়াছে।' টলেমীর মানচিত্রে এই তপ্রবেন

দ্বীপ দেখান হয়েছে এবং এই দ্বীপ ঠিক বিষুব রেখার উপরে অবস্থিত। টলেমী তাঁর গ্রন্থ 'Geography' লেখেন ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে। টলেমী ভারতের উপকূলভাগের সঠিক অবস্থান দেখাতে না পারলেও তিনি যে তাঁর কালের পৃথিবী সম্পর্কে জ্ঞাত তথ্য নিপুণভাবে বর্ণনা করেছিলেন সে সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই। Susan Gole তাঁর 'Early Maps of India' গ্রন্থে টলেমীর ভারতের মানচিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'Most of the Latin names have been identified by scholars and the map is surprisingly accurate for period in which it was drawn except for the miscalculation of the long coast line.'

তা যদি হয় তাহলে টলেমীর মানচিত্রের তপ্রবেন সম্পর্কে কোন সন্দেহ হওয়া উচিৎ নয়। এই তপ্রবেন সিংহল নয়, এই তপ্রবেনই রাবণের স্বর্ণলঙ্কা। স্বর্ণলঙ্কা যে বিষুবরেখার উপর অবস্থিত কোন ভূখণ্ড তা আমরা জানতে পারি জ্যোতিষ গ্রন্থ থেকে। শ্রী নারায়ণ চন্দ্র জ্যোতিভূ'ষণ ভট্টাচার্য্য অনূদিত 'হোরাবিজ্ঞান রহস্যম' গ্রন্থ থেকে নিচের শ্লোক তুলে দিচ্ছি।

'পরাশরঃ

বসু-সাগর-নেত্রাণি পলানি লঙ্কোদয়ে মেষরাশৌ।
অঙ্কইঙ্কনেত্রে বৃষভে মিথুনইগ্নিযুঙ্ নেত্র সংখ্যাতম॥
বিপর্য্যয়মগ্রিম ত্রিতয়ে ষড়্লগ্নেশ্বেবমেব নির্দ্দিষ্টম।
হীনং খণ্ডত্রিতয়ং যুক্তং স্বদেশলগ্নোদয়ম্॥
বিদগ্ধতোষিণ্যাং। গজভং নন্দগোপক্ষা গুণদস্তাঃ ক্রমোৎক্রমাৎ।
লঙ্কোদয়-পলানি স্যুস্তুলাদৌ চ ব্যতিক্রমাৎ॥

লঙ্কার লগ্নমান ঃ অভীষ্ট দেশের লগ্নমান নিরূপণ করিতে হইলে নিরক্ষপ্রদেশের অর্থাৎ লঙ্কার লগ্নমান পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক বিধায় তাহা নিরূপিত হইতেছে ইত্যাদি।

অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট দেশের লগ্নমান জানতে হলে প্রথমে নিরক্ষপ্রদেশের অর্থাৎ বিষুবরেখার উপরকার কোন স্থানের লগ্নমান প্রথমে জানা দরকার। এই লগ্নমানকে standard ধরে অন্য দেশের লগ্নমান জানতে হলে 'লঙ্কার লগ্নমান পল হইতে অভীষ্ট দেশের দ্বাদশ রাশির চরার্দ্ধপল (রাশিবিশেষ) যোগ বা বিয়োগ করিয়া সেই দেশের লগ্নমান স্থির করিতে হইবে।'

এ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে লঙ্কার অবস্থান বিষুব রেখার উপর অবস্থিত। তাহলে টলেমীর মানচিত্রের 'তপ্রবেন'কে একেবারে কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি?

প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা গ্রন্থে বার বার লঙ্কার উল্লেখ যথেষ্ট তাৎপর্য পূর্ণ।

আর্যভট বলেন,

অনুলোমগতিণৌস্থঃ পশ্যাত্যচলং বিলোমগংযদ্বৎ।

অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম ॥

'অর্থাৎ পূর্বদিকে গতিযুক্ত নৌকায় আসীন ব্যক্তি নদীর উভয় পার্শ্বস্থ তটবর্তী অচল বৃক্ষাদি যেমন পশ্চিমগামী দেখেন, তেমনই লঙ্কাতে অচল নক্ষত্রসমূহকে সমবেগে পশ্চিমদিকে ধাবমান দেখা যায়।'

এই শ্লোক থেকেও পরোক্ষভাবে জানা যায় যে লঙ্কার অবস্থান ঠিক বিষুবরেখার উপরে। কারণ বিষুবরেখার উপর কোন স্থান থেকে স্পষ্টভাবে নক্ষত্রসমূহকে পশ্চিমগামী মনে হয় (পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূবে ঘোরে এবং বিষুবরেখার উপরে এই গতিবেগ খুব বেশী বলে অনুভূত হয়)।

যাহোক শ্রীঅরূপরতন ভট্টাচার্য্য তাঁর 'প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান' গ্রন্থে উপরের শ্লোকটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, সমস্ত বক্তব্যকে লঙ্কাদেশ অর্থাৎ বর্তমান সিংহলের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়েছে।' শ্রী ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন তুলেছেন 'লঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে কেন ? লঙ্কার কথা উল্লেখ না করে সমস্ত আলোচনাটি সাধারণভাবে ভারতবর্ষ বা পৃথিবীর পটভূমিতে বলা চলতে পারত। কিম্বা অন্য কোন দেশ বা শহরের কথা উল্লেখ করা যেত। কিন্তু বিশেষভাবে লঙ্কা বলার কারণ কি ?' এর উত্তরও তিনি দিয়েছেন—'কারণ লঙ্কা বিষুবরেখা সন্নিহিত বিষুবরেখার সামান্য উত্তরে অবস্থিত একটি অঞ্চল! এটি পৃথিবীর প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত।'

শ্রী ভট্টাচার্য্যের মতে বর্তমান সিংহল পৃথিবীর প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত বলেই নাকি শ্লোকে সিংহল বা লঙ্কার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রী ভট্টাচার্য্য সিংহল ও লঙ্কাকে এক করে দেখেছেন বলেই তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে পৃথিবীর এত জায়গা থাকতে লঙ্কার নাম উল্লেখ কেন করা হয়েছে শ্লোকে ?' সিংহল কিন্তু নিরক্ষরেখা অথাৎ পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত নয়। নিরক্ষরেখা বা বিষুব রেখা থেকে ৮° উত্তরে এর অবস্থান। জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত লগ্ন গণনায় যদি বিষুবরেখার উপরে অবস্থিত কোন স্থানের লগ্নমানকে Standard ধরার প্রয়োজন হয় তাহলে বর্তমান সিংহল কিছুতেই সে প্রয়োজন মেটাতে পারে না। কারণ সূক্ষ্ম জ্যোতিষীয় গণনায় ৮° ফারাক মোটেও হেলাফেলা করার মত নয়।

.এইসব জ্যোতিষগ্রন্থের শ্লোকে বারবার লঙ্কার নাম উল্লেখের একমাত্র কারণ লঙ্কা দেবতাদের পার্থিব আদি উপনিবেশ লেমুরিয়ারই একটি ভূখণ্ড, যার অবস্থান নিরক্ষরেখার উপর।

দেবতারা লেমুরিয়াতে উপনিবেশ স্থাপনের পর এই পার্থিব পটভূমিতে

জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার জন্য তাঁদের নিজেদের গ্রহের উন্নত জ্যোতির্বিদ্যাকে নতুনরূপে ঢেলে সাজালেন। এ কাজের জন্য প্রয়োজন হল একটি ধ্রুব নক্ষত্রের অর্থাৎ এই পৃথিবীর পটভূমিতে একটি আপাত নিশ্চল নক্ষত্র (এ নক্ষত্রের অবস্থান একমাত্র মেরু শীর্ষেই সম্ভব)। তাঁরা পার্থিব পটভূমিতে একটি ধ্রুব নক্ষত্রও চিহ্নিত করলেন। এ আমার কথা নয়, বিষ্ণুপুরাণেই এর সাক্ষ্য আছে। পরবর্তী অধ্যায়ে সে আলোচনা করা হবে। তাই লগ্ন গণনার জন্য নিজেদের বাসভূমি লেমুরিয়ার অংশ লঙ্কাকেই তাঁরা বেছে নেবেন এটাই স্বাভাবিক ?

লঙ্কা সৃষ্টির ইতিহাস পাই আমরা রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে। এই ইতিহাস খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। ব্রহ্মার বরলাভে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেদের থাকবার জন্য একটি নগরীর প্রয়োজনে বিশ্বকর্মাকে সেকথা বললেন মাল্যবান, সুমালী ও মালী। এরা রাক্ষস সুকেশের ছেলে। তখন বিশ্বকর্মা বললেন, 'হে রাক্ষসগণ! দক্ষিণসাগরের তীরে ত্রিকূট ও সুবেল নামক দুইটি পর্ব্বত আছে; দুইটি পর্ব্বতই দেখিতে একরূপ। তাহার মধ্যভাগে মেঘসন্নিভ একটি শৃঙ্গ আছে। ঐ শৃঙ্গে চারিদিকে ভগ্ন পাষাণ বিক্ষিপ্ত থাকায়, উহা অতি দুর্গম। আমি সেই শিখরে ইন্দ্রের আজ্ঞায় লঙ্কা নামে একটি নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছি; ঐ নগরী দৈর্ঘ্যে শতযোজন এবং বিস্তারে ত্রিংশৎযোজন ব্যাপী। উহা স্বর্ণময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং স্বর্ণময় তোরণে ভূষিত। হে রাক্ষস শ্রেষ্ঠগণ! স্বর্গবাসী ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ যেমন অমরাবতীতে বাস করেন, সেইরূপ তোমরা দুর্জ্জয় হইয়া সেই নগরে গিয়া বাস কর। হে শত্রু সূদন রাক্ষসগণ! তোমরা বহু রাক্ষস লইয়া লঙ্কাদুর্গে অবস্থান পূর্ব্বক শত্রুবর্গের নিকট দুর্জ্জয় হইয়া থাক।'

বিশ্বকর্মার কথা থেকে জানা যায় যে লঙ্কা ইন্দ্রের আজ্ঞায় তৈরী হয়েছিল দ্বিতীয় অমরাবতী হিসেবে। তাই আমাদের বিশ্বাস যে দেবতারা যখন এই পৃথিবীতে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন সেই সময়ই ইন্দ্রের আজ্ঞায় নকল অমরাবতী হিসেবে লঙ্কা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লঙ্কার ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য ও যান্ত্রিক উন্নতির কথা রামায়ণ পাঠক মাত্রেই ভাল করে জানেন, তাই এ প্রবন্ধে সেসব কথা আলোচনা করা বাহুল্য।

লঙ্কার অবস্থান খুঁজতে রামায়ণ অনেকখানি সাহায্য করে। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সুগ্রীব, জাম্ববান, অঙ্গদ, হনুমান, নীল, গন্ধমাদন ইত্যাদি বিক্রমশালী বীরদের সীতার খোঁজ করার জন্য দক্ষিণ দিকে যেতে নির্দেশ দিয়ে পথের বিশদ বর্ণনাও দিয়ে দিলেন। সুগ্রীব যেসব জায়গার কথা বললেন তাতে ভারত মহাসাগরের বুকে একটি দ্বীপশৃঙ্খলের ছবি ফুটে ওঠে। কিন্তু বর্তমানে আমরা ভারতের দক্ষিণে সিংহল ছাড়া আর কোন দ্বীপের কথা জানিনা। সুগ্রীব কিন্তু সিংহলের কোন উল্লেখ করেন নি। তাহলে সুগ্রীব কোন দ্বীপ শৃঙ্খলের কথা বললেন? কোথায়

সেসব দ্বীপ ? নাকি বাল্মীকি কল্পনার জাল বুনেছেন ? আমাদের ধারণা এই দ্বীপ শৃঙ্খল আর কিছুই না। একটি বিরাট নিমজ্জিত ভূভাগের শেষ চিহ্ন। যখন কোন ভূখণ্ড সমুদ্রগর্ভে ডুবতে শুরু করে তখন স্বভাবতই নিচু জায়গাগুলি আগে ডুবে যায়, জেগে থাকে উঁচু জায়গা অর্থাৎ পর্বতশীর্ষ বা মালভূমিগুলি। তাহলে সুগ্রীব কি নিমজ্জিত লেমুরিয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন ?

সিংহল যে লঙ্কা নয় এবং লঙ্কা যে লেমুরিয়ারই অংশ তার মোক্ষম প্রমাণ আমরা খুঁজে পেয়েছি। সূর্যসিদ্ধান্ত প্রাচীন জ্যোতিষীয় গবেষণা গ্রন্থ। এই গ্রন্থ সম্পর্কে শ্রীবিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য তাঁর 'বেদাঙ্গ পরিচয়' গ্রন্থে বলেছেন, 'বরাহমিহির 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'

পৌরাণিক স্বর্ণলঙ্কার আসল অবস্থান

গ্রন্থে পিতামহসিদ্ধান্ত বসিষ্টসিদ্ধান্ত, রোমকসিদ্ধান্ত, পুলিশসিদ্ধান্ত অপেক্ষা সূর্যসিদ্ধান্তকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ এই গ্রন্থের দৃকপ্রতীতি প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা অনেক বেশী স্পষ্ট।' এই সূর্যসিদ্ধান্তে বলা হয়েছে : লঙ্কা ও সুমেরু
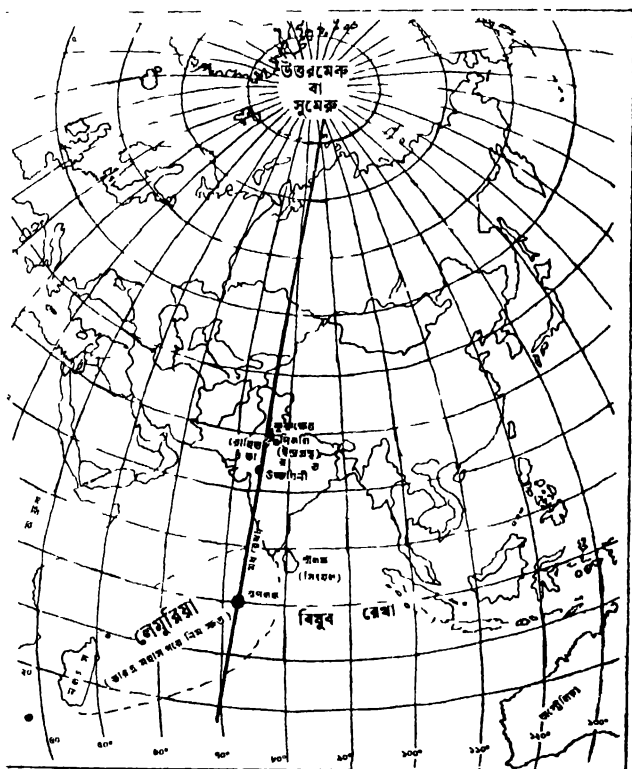
পর্বতের সমসূত্রপাতে যে রেখা কল্পিত হয় তার নাম মধ্য রেখা। ঐ রেখাতে রোহীতক নগর, উজ্জয়িনী ও কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি অবস্থিত।

সুমেরু	=	উত্তর মেরু।
কুরুক্ষেত্র	=	পাঞ্জাবে আম্বালা ও কর্ণাল জেলায় থানেশ্বর ও তার নিকটবর্তী অঞ্চল।
রোহীতক	=	হরিয়ানারাজ্যের রোহটক।
উজ্জয়িনী	=	মধ্যপ্রদেশের শহর।

কুরুক্ষেত্র রোহীতক, উজ্জয়িনীর অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ বিশ্লেষণ করলে একথা বলা যায় যে এই তিনটি স্থানকে একই সরল রেখার সাহায্যে যুক্ত করা যায়। এই সরলরেখাকে উত্তর দিকে বর্দ্ধিত করলে তা উত্তর মেরু অঞ্চল স্পর্শ করে ; কিন্তু এই রেখাকে দক্ষিণে বর্দ্ধিত করলে তা কিছুতেই সিংহলকে স্পর্শ করে না বা করতে পারে
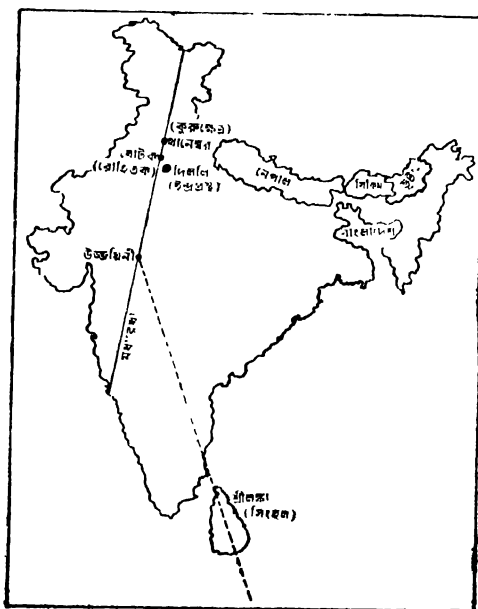
মধ্যরেখা কখনই সিংহল স্পর্শ করে না—তাহলে কি করে সিংহল লঙ্কা হয়

না। অথচ এই রেখা বিষুবরেখাকে ছেদ করে। আমরা আগেও দেখেছি যে লঙ্কার অবস্থান বিষুবরেখার উপর। তাহলে মধ্যরেখা যেখানে বিষুবরেখাকে ছেদ করছে সেখানেই লঙ্কার অবস্থান হবে। এই লঙ্কা হচ্ছে রাবণের স্বর্ণলঙ্কা যা লেমুরিয়ারই একটি অংশ। (৭৬ পৃষ্ঠায়) মানচিত্র দেখলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কৌতূহলী পাঠকদের জন্য অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ দেওয়া হল।

		অক্ষাংশ (প্রায়)	দ্রাঘিমাংশ (প্রায়)
১।	কুরুক্ষেত্র	২৯.৫৮° (উঃ)	৭৬.৫৬° (পূঃ)
২।	রোহীতক	২৮.৫৫° (উঃ)	৭৬.৩৮° (পূঃ)
৩।	উজ্জয়িনী	২৩.০৯° (উঃ)	৭৫.৪০° (পূঃ)
৪।	স্বর্ণলঙ্কা	0°	৭২° (পূঃ)
৫।	সিংহল	৮° (উঃ)	৮১° (পূঃ)

লঙ্কা আজ ভারতমহাসাগরের গর্ভে নিমজ্জিত। সমুদ্রতলের মানচিত্র লক্ষ করলে দেখা যাবে যে ভারতের পশ্চিম উপকূলভাগ থেকে বিষুবরেখা ছাড়িয়ে একটা বিশাল এলাকায় সমুদ্র খুব বেশী গভীর নয়। মাত্র ৬৬০ ফুটের মত গভীর। এই অগভীর
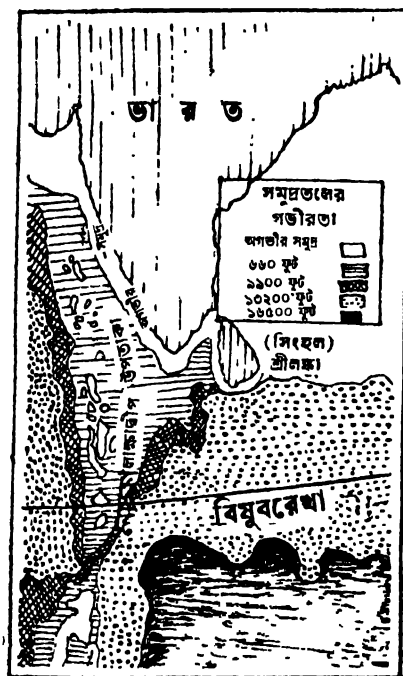
সমুদ্রতলের গভীরতা প্রমাণ করে পৌরাণিক স্বর্ণলঙ্কার অবস্থান

সমুদ্র কি কোন নিমজ্জিত ভূখণ্ডের ইঙ্গিত দেয়? এই অগভীর এলাকার নাম লাক্ষাদ্বীপ উপত্যকা। এই এলাকার মধ্যে যে ভূভাগ এখনো জেগে আছে তার নাম মাল দ্বীপপুঞ্জ ও লাক্ষাদ্বীপ। লাক্ষাদ্বীপের নাম হয়েছে নাকি লঙ্কাদ্বীপ

(১,০০,০০০ দ্বীপ) থেকে। লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ অবশ্য এখন ১৬টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত। বহু প্রাচীনকালে এইসব এলাকায় কি একলক্ষ দ্বীপ ছিল ? নাকি লঙ্কাদ্বীপ থেকেই লাক্ষাদ্বীপের নামকরণ হয়েছে ?

রামায়ণ থেকে আমরা জানি যে হনুমানকে শত যোজন সাগর পাড়ি দিয়ে লঙ্কায় পৌঁছুতে হয়েছিল। শত যোজন অর্থে প্রায় ৯০০ মাইল। ভারতের মূলভূখণ্ড থেকে সিংহলের দূরত্ব তো মাত্র ৩৩ মাইল। তাহলে বাল্মীকি লঙ্কার দূরত্ব শতযোজন লিখলেন কেন ? তিনি কি ভুল লিখেছেন ? না বাল্মীকি ঠিকই লিখেছেন। লেমুরিয়ার অংশ হিসেবে যে স্বর্ণলঙ্কা আমরা আবিষ্কার করলাম, সেই লঙ্কা থেকে ভারতের মূল ভূখণ্ডের দূরত্ব ৯০০ মাইল বা শতযোজনের খুবই কাছাকাছি।

তাহলে এখন আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে সিংহল ও রাবণের স্বর্ণলঙ্কা এক নয়। তাই মহাভারতের বনপর্বে শ্রীকৃষ্ণ রাজসূয় যজ্ঞে ইন্দ্রপ্রস্থে যে সমস্ত রাজারা এসে পাণ্ডবদের সাহায্য করেছিলেন তাদের কথা বলতে গিয়ে সিংহল ও লঙ্কার রাজাদের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করেছিলেন। সিংহল ও লঙ্কা একই ভূখণ্ড হলে তার কি কোন প্রয়োজন হত ?

লঙ্কা রামায়ণের কালে উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল, সে আজ থেকে ৪১০০ বছর আগে। তারপরেও বহুকাল লঙ্কা যে সমুদ্রের বুকে জেগে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঠিক কোন সময়ে লঙ্কা ভারত মহাসাগরের গর্ভে নিমজ্জিত হয়েছিল তা এক্ষুণি বলা সম্ভব নয়। ঠিক পথে গবেষণা হলে সে তথ্যও একদিন নিশ্চয় উদ্ঘাটিত হবে। ভারত মহাসাগরের তলদেশে বিশেষ কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা হয় নি। ভবিষ্যতে সমুদ্র গবেষণা যখন ব্যাপক হবে তখন লঙ্কা তথা লেমুরিয়া তথা দেবতাদের পার্থিব আদি উপনিবেশের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ উদ্ধার হবে বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ধ্রুব কাহিনী

স্বায়ম্ভুব মনুর দুই ছেলে। প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। এই উত্তানপাদের ছেলে হচ্ছে ধ্রুব। উত্তানপাদের বংশধররাই ধারাবাহিকভাবে পৃথিবীতে রাজত্ব করেছেন। ষষ্ঠ মনু চাক্ষুস ও সপ্তম বা শেষ মনু বৈবস্বত এই বংশোদ্ভূত। প্রথম পার্থিব স্বাধীন নরপতি বেন উত্তানপাদ বংশের সন্তান। সম্রাট পৃথু যাঁর রাজত্বকালে পার্থিব দেবতাদের উপনিবেশ চরম উন্নতি লাভ করেছিল এবং সম্রাট দক্ষ যিনি পার্থিব মানুষদের উন্নত করে তুলেছিলেন তাঁরা এই উত্তানপাদের বংশধর। বৈবস্বত মনু থেকে উদ্ভব হয় ইক্ষ্বাকু বংশ যে বংশের স্বনামধন্য পুরুষ হচ্ছেন রামচন্দ্র। সুতরাং

আমরা এই উত্তানপাদের বংশ লতিকা ধরে অগ্রসর হলেই লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করতে পারব বলে মনে হয়।

স্বায়ম্ভুব মনুর দুই ছেলে—প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। উত্তানপাদের দুই রাণী—সুরুচী ও সুনীতি। সুরুচীর গর্ভে জন্ম হল উত্তমের আর সুনীতির গর্ভে ধ্রুবর। ধ্রুবর গল্প অনেকেরই জানা, তবু আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। একদিন ভাই উত্তমকে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট পিতার কোলে দেখে ধ্রুবর ইচ্ছে হল পিতার কোলে ওঠার। রাজা উত্তানপাদ রাণী সুরুচীর সামনে ধ্রুবকে কোলে নিতে সাহস করলেন না। সুরুচী ধ্রুবর আকাঙ্খার কথা বুঝতে পেরে ধ্রুবকে ভর্ৎসনা করে বললেন, বৎস তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর নি সুতরাং রাজাসন তোমার জন্য নয়। ধ্রুব ক্ষুব্ধ হয়ে মা সুনীতির কাছে গিয়ে সব কথা বললেন। সুনীতি স্বান্ত্বনা দিলেও ধ্রুব শান্ত হতে পারলেন না। তিনি মাতা সুনীতিকে বললেন, 'আমি সেই মত করিব, যাহাতে অশেষ জগতের পূজিত সর্ব্বোত্তমের উত্তম স্থান পাইতে পারি।' এই বলে ধ্রুব রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে নগর অতিক্রম করে এক অরণ্যে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে গিয়ে 'কৃষ্ণাজিন উত্তরীয়বিশিষ্ট, কুশাসনে উপবিষ্ট পূর্ব্বাগত সপ্ত মুনিকে দেখিতে পাইলেন।' ধ্রুব তাঁদের প্রণাম করে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন তিনি তপস্যা করতে চান। সপ্তর্ষি বললেন তুমি বালক তায় রাজপুত্র এবং তোমার পিতা রাজাও জীবিত এ অবস্থায় তুমি কিজন্যে তপস্যা করতে এই অরণ্যে এসেছো? তখন ধ্রুব সপ্তর্ষিদের কাছে সব কথা খুলে বললেন, 'হে দ্বিজ সত্তমগণ। অর্থ বা রাজ্যের অভিলাষ করি না, আমি সেই একমাত্র স্থান ইচ্ছা করিতেছি, যাহা পূর্ব্বে অন্যে ভোগ করেন নাই।' সপ্তর্ষিরা ধ্রুবকে গোবিন্দের আরাধনা করতে উপদেশ দিলেন। ধ্রুব কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। বিষ্ণু ধ্রুবের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ধ্রুবকে দেখা দিয়ে বললেন, 'হে ধ্রুব। তুমি মৎপ্রসাদে ত্রৈলোক্যাধিক স্থানে সর্ব্বতারা-গ্রহের আশ্রয় হইবে, সন্দেহ নাই। সূর্য, সোম, ভৌম, সোমপুত্র, বৃহস্পতি, সিত, অর্কতনয়াদি, সর্ব্বনক্ষত্র ও সপ্তর্ষি যাঁহারা বিমানচারী দেবতা, হে ধ্রুব। সকলেরই উপরিভাগে তোমাকে ধ্রুব স্থান দিলাম।'

অপূর্ব কাহিনী বর্ণন কৌশল। একদিকে মহান রাজপুত্র ধ্রুবর কাহিনী অন্যদিকে তাঁর দিবি আরোহনের উপাখ্যান কি অপূর্ব দক্ষতায় প্রকাশ করেছেন পুরাণকার! এ দক্ষতা ছিল তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত।

ধ্রুব একজন মহান পুরুষ। এরকম একজন সৎ মহানুভব ব্যক্তির দিবি আরোহণ ঘটবে এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। মানুষ ধ্রুব আকাশের জ্যোতিষ্ক হলেন। তবে ধ্রুবের দিবি আরোহণ একটি বিশিষ্ট উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর বিশেষ প্রয়োজনও ছিল। কি সেই প্রয়োজন? ধ্রুব এমন স্থান চেয়েছিলেন 'যাহা পূর্ব্বে অন্যে ভোগ করেন নাই।'

ধ্রুব নক্ষত্র হচ্ছে মহাকাশে অবস্থিত একটি আপাতঃ নিশ্চল নক্ষত্র। মহাকাশের জ্যোতিশ্চক্রমার্গ পর্যবেক্ষণ ও গণনা কার্যে ধ্রুব নক্ষত্রের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাহলে ধ্রুবর আগে কি ধ্রুব নক্ষত্র ছিল না? ধ্রুব নক্ষত্র নিশ্চয় ছিল; কিন্তু তার হয়তো তখনো নামকরণ হয়নি।

দেবতারা নিজেদের গ্রহ ছেড়ে পৃথিবীতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই একটি আপাতঃ নিশ্চল নক্ষত্র আবিষ্কার করেছিলেন নিজেদের প্রয়োজনে। কারণ এই রকম একটি নক্ষত্র ছাড়া জ্যোতিশ্চক্রমার্গের পর্যবেক্ষণ প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাই আমাদের বিশ্বাস ধ্রুব জন্মের বহু পূর্বেই ধ্রুব নক্ষত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন দেবতারা। পরবর্তীকালে মহানুভব ধ্রুবর দিবি আরোহন ঘটল এবং স্বায়ম্ভুব মনু ব'শের উত্তরাধিকারী পরম ধার্মিক ধ্রুবের নামে সেই স্থির নক্ষত্রের নামকরণ করা হল। ধ্রুব সেই স্থান পেলেন, 'যাহা পূর্ব্বে অন্যে ভোগ করেন নাই।' সপ্তর্ষি ধ্রুবকে বিষ্ণুর উপাসনা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। এই সপ্তর্ষিদের বলা হয়েছে 'পূর্ব্বাগত'। এর মধ্যে কোন প্রতীকি ব্যাপার আছে বলেই আমাদের মনে হয়। খুব সম্ভবতঃ নিজেদের গ্রহের আকাশমণ্ডলের সপ্তর্ষি নক্ষত্রের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। দেবতাদের নিজেদের গ্রহের আকাশমণ্ডলেও ছিল আমাদের আকাশমণ্ডলের সপ্তর্ষির মত কোন তারকা-মণ্ডল। ব্যাপারটা মোটেও অসম্ভব নয়।

ধ্রুবর কাল খ্রীঃ পূঃ ৫১৬১ অব্দ অর্থাৎ প্রায় ৭২০০ বৎসর আগে।

অন্যান্য নক্ষত্র সম্বন্ধে

ভারতে জ্যোতিষ শাস্ত্রের আদি উৎস হচ্ছে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ। জ্যোতিষ শাস্ত্রকে বেদের চক্ষু বলা হয়েছে। 'সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মা, সমগ্র যে জ্যোতিষশাস্ত্র প্রথমতঃ ভগবান-হিরণ্যগর্ভ আদি পুরুষের নিকট জ্ঞাত হয়েন, নিখিল মুনিগণের প্রার্থনায় ললিতপদ বিন্যাসপূর্ব্বক পরে যাহা তিনি জগতে প্রচার করেন, যাহা নিত্য, যাহা দ্বারা সমগ্র বিশ্বের স্বরূপ প্রকাশিত হয়, যাহা অধ্যাত্মরূপ গুহ্যশাস্ত্র নামে অভিহিত, এবং যাহা দোষ রহিত, সেই জ্যোতিষশাস্ত্র, গ্রহ-উপগ্রহগণের স্বরূপবেত্তা পণ্ডিতমণ্ডলীর নির্মল জ্ঞানচক্ষুস্বরূপ।'

তিনখানি বেদাঙ্গ জ্যোতিষের খোঁজ পাওয়া গেছে। একটি ঋগ্বেদাঙ্গ জ্যোতিষ। এতে আছে ছত্রিশটি শ্লোক। অন্যটি যজুর্বেদীয় জ্যোতিষ। এতে ঋগ্বেদাঙ্গ জ্যোতিষের ত্রিশটি শ্লোক আছে, বাড়তি আছে আরো তেরটি শ্লোক। তৃতীয়টি হচ্ছে অথর্ববেদীয় জ্যোতিষ।

বেদাঙ্গ জ্যোতিষের পরবর্তীকালের জ্যোতিষ গ্রন্থ হচ্ছে জৈন-জ্যোতিষ। এর একটির নাম সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি, অন্যটির নাম চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি। সম্প্রতি ভদ্রবাহুর ভদ্রবাহবীয়

সংহিতা নামে আরও একখানি জ্যোতিষ গ্রন্থের কথা একালের গবেষকরা জানতে পেরেছেন।

এর পরবর্তী জ্যোতিষ গ্রন্থ হচ্ছে কয়েকখানি সংহিতা এবং প্রাচীন সিদ্ধান্ত গ্রন্থগুলি। সংহিতাগুলি বিলুপ্ত হয়েছে। পরবর্তীকালের বিভিন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের রচনায় কোন কোন সংহিতার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে গর্গ এবং পরাশর রচিত দুখানি সংহিতার নাম উল্লেখযোগ্য। এই দুখানি গ্রন্থ গর্গসংহিতা ও পরাশরসংহিতা নামে অভিহিত। এ দুখানি অত্যন্ত দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ।

জ্যোতিষ গ্রন্থগুলির মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রন্থগুলি সবথেকে উল্লেখযোগ্য। আজ পর্যন্ত যে সব সিদ্ধান্ত গ্রন্থের কথা ঐতিহাসিকরা জানতে পেরেছেন সেগুলি হল পিতামহ ব্রহ্মা, সূর্য, ব্যাস, বশিষ্ঠ, অত্রি, পরাশর, কাশ্যপ, নারদ, গর্গ, মরীচি, মনু, অঙ্গিরা, রোমক বা লোমশ, চ্যবন, যবন, ভৃগু ও শৌণক। এইসব সিদ্ধান্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটির অস্তিত্ব বর্তমান।

জ্যোতিষশাস্ত্র প্রধানতঃ তিনভাগে বা স্কন্দে বিভক্ত:

(১) সিদ্ধান্ত স্কন্দ বা গণিত জ্যোতিষ—এর সাহায্যে আকাশস্থ গ্রহগণের গতি, অবস্থান, দূরত্ব, পরিমাণ প্রভৃতি জ্ঞান অর্জন করা যায়।

(২) হোরাস্কন্দ বা ফলিত জ্যোতিষ এর সাহায্যে জাতকের শুভাশুভত্ব, গ্রহগণের গতি প্রভৃতি জানা যায়।

(৩) শাখাস্কন্দ বা মিশ্রস্কন্দ-এর দ্বারা গ্রহগণের বক্র ও উদয়াস্তাদি, যাত্রা, বিবাহ, গর্ভধারনাদি সংস্কার প্রভৃতি জানা যায়।

এইজন্য জ্যোতিষশাস্ত্রকে এককথায় ত্রিস্কন্দ বলা যায়।

এ বিদ্যা দুভাবে লাভ করা যেতে পারে : (১) গুরু পরম্পরাক্রমে শাস্ত্রজ্ঞানাদির মাধ্যমে, ও (২) স্বীয় তপশ্চর্য্যার সাহায্যে পূর্বজন্মার্জিত সুকৃতির মাধ্যমে। মহর্ষি পরাশর বলেছেন, 'ব্রহ্মা, সূর্য, নারদ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি আচার্য্যগণের উপদেশ পরম্পরা অনুসরণ করতঃ হে মৈত্রেয়, তোমাকে সর্ববিষয়ই বলা হইল।' আবার আর এক শ্রেণীর ঋষির (ভৃগু, গর্গ প্রভৃতি) কথা পাওয়া যায় যাঁরা স্বীয় তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করার পর এই শাস্ত্র লোকসমাজে প্রচার করেছিলেন। জ্যোতির্বিদদের লক্ষণ থেকেই জানা যায় বিষয়টি কিরকম বিজ্ঞাননির্ভর ছিল। 'শুভাশুভ ফল এবং কালের নির্ণায়ক জ্যোতিষশাস্ত্র স্বরূপ সমুদ্র যিনি পার হইয়াছেন অর্থাৎ যিনি ত্রিস্কন্দ জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, পাটীগণিত ও বীজগণিতে যাঁহার বুদ্ধি কুশাগ্রবৎ তীক্ষ্ণ, বিবিধ প্রকার সিদ্ধান্তস্ফুট গণনা বিষয়ে যিনি সুনিপুন, ভূগোল শাস্ত্রে যিনি পারদর্শী এবং যিনি কর্ম্মফল বিচারে অতি সুযোগ্য তিনি প্রকৃত গণক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।'

যাহোক, এই জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা করলে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা

হচ্ছে যে বেদে যে রাশি নক্ষত্রের কথা উল্লেখ আছে তা পরবর্তী কালের জ্যোতিষ গ্রন্থের রাশি নক্ষত্র নয়। ঋগ্বেদে সূর্য, সোম (পরবর্তীকালের চন্দ্র) উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ, মাস, বৎসর প্রভৃতির উল্লেখ আছে। তবে অধিকাংশ স্থলে সূত্রগুলি খুবই অস্পষ্ট, এমনকি অনেক অংশ আছে যার ভাবগ্রহণ করা বেশ কষ্টসাধ্য 'প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান' গ্রন্থে অরূপরতন ভট্টাচার্য বলেছেন, 'যজুর্বেদাঙ্গ জ্যোতিষ এবং ঋগ্বেদাঙ্গ জ্যোতিষ উভয় জ্যোতিষেই চান্দ্র তিথি সংক্রান্ত ২৭টি নক্ষত্রের উল্লেখ আছে। তবে সে নামোল্লেখ সম্পূর্ণ বা বিস্তৃত নয় সেখানে সংক্ষিপ্ত আকারে নামের আদ্যাক্ষর বা অন্ত্যাক্ষরের সাহায্যে নামটির নির্দেশ লক্ষ করা যায়। কোথাও কোথাও নক্ষত্রের পরিচয়ে নক্ষত্রের অধিদেবতার নামের আদ্যাক্ষর বা অন্ত্যাক্ষরও নেওয়া হয়েছে।'

ঋগ্বেদীয় নক্ষত্রের নামের সঙ্গে পরবর্তীকালের সৈদ্ধান্তিকে নামের বিশেষ কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে শ্রীমতী বেলাবাসীনি গুহ ও অহনা গুহ রচিত 'ঋগ্বেদ ও নক্ষত্র' গ্রন্থের উল্লিখিত অংশ তুলে দিচ্ছি, 'ইংরাজি নাক্ষত্রিক মানচিত্রের কল্পিত আকৃতি ও নামের সহিত ঋগ্বেদোক্ত তারকাস্তবক বা নক্ষত্রের আকৃতির অনেক পার্থক্য। যথা পাশ্চাত্য নাক্ষত্রিক মানচিত্রে Corona Borialis নামক স্তবকের দীপ্ত তারাটির নাম Alphecca, তার পরবর্তী স্তবকটির নাম Serpens এ দুইটি স্তবকের প্রথমটি ইন্দ্র এবং দ্বিতীয়টি অগ্নি, দুইটি স্তবক মিলিয়ে ঋগ্বেদে ইন্দ্রাগ্নি। এই দুইটি নক্ষত্র স্তবকেরই সৈদ্ধান্তিক নাম বিশাখা নক্ষত্র। বিশাখার দেবতা ইন্দ্রাগ্নি বলে সিদ্ধান্ত বিশাখার ঋগ্বেদীয় ইন্দ্রাগ্নি অঙ্গীকার করে নিয়েছে।'

বৈদিক নক্ষত্র সমূহের আকৃতি ও নামের সঙ্গে পরবর্তীকালের সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ গ্রন্থসমূহের নক্ষত্রসমূহের আকৃতি ও নামের বৈশাদৃশ্যের একটিই সহজ উত্তর আছে। তাহল বৈদিক নক্ষত্রমণ্ডল পৃথিবীর আকাশ থেকে দেখা নক্ষত্রমণ্ডল নয়। এ নক্ষত্রগুল হচ্ছে দেবতাদের গ্রহের আকাশ থেকে দেখা। পরবর্তীকালে দেবতারা যখন নেমে এলেন পৃথিবীতে তখন তাঁরা পৃথিবীর আকাশ পর্যবেক্ষণ করে আবিষ্কার করলেন ধ্রুব নক্ষত্র এবং নতুন নামকরণ করলেন নক্ষত্রমণ্ডলীর ও তারকাবীথির।

আমরা যদিও এখন বারটি রাশি গণনা করি বহু পুরাকালে নাকি আটটি রাশি গণনা করা হত। সুমেরদের প্রাচীন পুঁথিতে উল্লিখিত রাশির সংগে পরবর্তীকালের রাশিচক্রের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। George Michanowksy তাঁর 'The once and Future Star' গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'However, the neatly elaborated astrological zodiac of later periods was apparantly absent from Sumerian Star lore. Some constellations of the ecliptic are easily identifiable, others

are still the subject of debate and still others are conspicuously missing from the ancient cuniform texts that have been examined upto now.'

বৈদিক নক্ষত্রসমূহের আকৃতি ও নাম যেমন অস্পষ্ট এবং কোন কোন জায়গায় দুর্বোধ্য তেমনি সুমের সভ্যতার প্রাচীন কিউনিফর্ম লিপিতে লিখিত নক্ষত্রবীথি বা রাশিচক্রও পরবর্তীকালের রাশিচক্র থেকে ভিন্ন। এই সুমেরীয়ানরা দেব-গন্ধর্ব গোষ্ঠীরই একদল ভিনগ্রহবাসী একথা আলোচনা করেছি আমার প্রথম গ্রন্থে।

যাহোক এই বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁদের আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি বিভিন্ন দেশের প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে আর একবার নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে গবেষণা চালান। দেবতারা যে অন্য গ্রহ থেকে এই পৃথিবীতে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন তার অকাট্য প্রমাণ খুব সম্ভবতঃ লুকিয়ে রয়েছে বিভিন্ন দেশের প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রের মধ্যে। ভাবীকালের গবেষকদের গবেষণায় সে সত্য একদিন প্রকাশ পাবে বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

এক বিদ্রোহী রাজপ্রতিনিধির কথা

ধ্রুবর দশ পুরুষ পরে হচ্ছেন বেণ। এঁর সময়কাল হচ্ছে ৪৯১৯ খ্রীঃ পূঃ বা প্রায় ৭০০০ বৎসর পূর্বে। পরবর্তী আলোচনা শুরু করছি আমরা এই বেণ রাজাকে নিয়ে। চাক্ষুষ মনুর ছেলে উরু, তার ছেলে অঙ্গ। এই অঙ্গের স্ত্রী সুনীথার একমাত্র সন্তান হচ্ছেন বেণ। এই বেণ ঋষিগণ কর্তৃক রাজা নির্বাচিত হয়েই স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসলেন। বেণের পূর্ববর্তী পৃথিবীর রাজারা স্বাধীন ছিলেন না; তারা ছিলেন দেবরাজ ইন্দ্রের অধীন। ইন্দ্রের প্রতিভূ হিসেবে তারা রাজ্য শাসন করতেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীগিরীন্দ্র শেখর বসু মহাশয় তাঁর 'পুরাণ প্রবেশ' গ্রন্থে এ বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'ভারতবর্ষ পুরাকালে আদিতে ইলাবৃতবর্ষাধিপতি ইন্দ্রের অধীন ছিল। স্বায়ম্ভুব হইতে আরম্ভ করিয়া চাক্ষুষ মনুকাল পর্যন্ত ভারতে কোন স্বাধীন নৃপতি ছিলেন না বলিয়া মনে হয়। এই কালান্তর্গত সমস্ত রাজাই ইন্দ্রের প্রতিভূরূপে ভারত শাসন করিয়াছিলেন এই জন্য যজ্ঞে সম্রাট ইন্দ্রই যজ্ঞপুরুষ কল্পিত হইতেন। বেণ রাজাই সর্বপ্রথম ইন্দ্রের বশ্যতা অস্বীকার করেন।' বেণ রাজা হয়েই ঘোষণা করলেন, 'কেহ যজ্ঞ করিতে পারিবে না, হোম করিতে পারিবে না, এবং কেহ কদাচ দান করিবে না। আমিই ত যজ্ঞপতি প্রভু।' ঋষিরা বললেন, 'আমরা হরিকে পূজো করি।' বেণ বললেন, 'কে হরি? আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আরাধ্য আর কেউ নেই। ব্রহ্মা, জনার্দন, শম্ভু, ইন্দ্র, বায়ু, যম, রবি, হুতভুক্

বরুণ, ধাতা, পূষা, ভূমি, নিশাকর এবং অন্য যেসব দেবতা তারা সকলেই রাজার শরীরে। রাজা সর্বদেবময়। ঋষিগণ তোমরা আমার আদেশ পালন কর।'

বিষ্ণুপুরাণ বলেন, 'ঋষিগণ কহিলেন, হে মহারাজ! আজ্ঞা কর, ধর্ম্মসংক্ষয় না হউক, যেহেতু হবির পরিণামই এই অখিল জগৎ পরাশর কহিলেন, পরমর্ষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে বিজ্ঞাপ্যমান ও পুনঃ পুনঃ প্রোক্ত হইয়াও যখন অনুজ্ঞা দিলেন না, তখন মুনি সকল কোপামর্ষসমন্বিত হইয়া পরস্পর বলিয়া উঠিলেন, হনন কর, এই পাপকে হনন কর। যে অধমাচার যজ্ঞপুরুষ দেব অনাদি অনন্ত প্রভুকে নিন্দা করিতেছে সে ভূপতির যোগ্য নহে। মুনিগণ এইরূপ কহিয়া ভগবন্নিন্দনাদি দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই নিহত নৃপকে মন্ত্রপূত কুশ দ্বারা নিহত করিয়া ফেলিলেন।'

দেবরাজ প্রতিনিধি নির্বাচনে মুনিরাই সর্বেসর্বা ছিলেন। খুব সম্ভবতঃ এই মুনিরা লক্ষ রাখছিলেন যাতে পার্থিব ঔপনিবেশিক রাজশক্তি স্বর্গের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা না করে বসে। কিন্তু দেখা গেল বহুকাল বাদে রাজা বেণ নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে বসলেন। মুণিরা যে ভয় করেছিলেন অবশেষে তাই ঘটল। তারা বেনকে সাবধান করা সত্বেও বেন মুনিদের কথায় কর্ণপাত করলেন না। মুনিরা তখন বেণকে হত্যা করলেন। শাসনকর্তার অভাবে দেখা দিল অরাজকতা। পুরাণকাররা কত সংক্ষেপে রহস্যময় ভাষায় দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করতে অভ্যস্ত ছিলেন তার উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় এখানে। বেণ নিহত হলেন, 'তদনন্তর চারিদিকে রেণু দেখিতে পাইয়া তাহারা নিকটস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা কি? তাহারা আতুরভাবে তাঁহাদিগকে কহিল অরাজক রাজ্য চৌরগণ কর্ত্তৃক পরস্বগ্রহণ আরব্ধ হইয়াছে। হে মুনিসত্তমগণ! পরবিত্তাপহারী উদ্ধতগতি সেই চৌরদিগের এই সুমহান পদরেণু দেখা যাইতেছে।'

রাজাহীন রাজ্যে অরাজকতার কি নিপুন ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। 'পরে মুনি সকল মন্ত্রণা করিয়া পুত্রের নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক ঐ নিঃসন্তান ভূপতির উরু মন্থন করিলেন। তখন মথ্যমান উরু হইতে দগ্ধ স্থূণা (স্তম্ভ বা খুটি) সদৃশ খর্ব্বমুখ অতিহ্রস্বকায় এক পুরুষ উত্থিত হইয়া কহিল, কি করিব? তাঁহারা কহিলেন, 'নিষীদ' (উপবেশন কর) এজন্য সে নিষাদ হইল। হে মুনিশার্দ্দূল! পরে তৎসন্তানেরা বিন্ধ্যশৈলনিবাসী পাপকর্ম্মোপলক্ষণ নিষাদ হইল। সেই নিষাদরূপে ভূপতির পাপ নির্গত হইয়াছিল, এজন্য তাহার বেণকল্মষনাশন নামে খ্যাত। তদনন্তর দ্বিজগণ তাঁহার দক্ষিণহস্ত মন্থন করিলে তাহাতে প্রতাপবান দীপ্যমানবপুঃ সেই বৈণ্য পৃথু সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে পাইতে জন্মিলেন। তখন আজগব নামে আদ্যধনুঃ দিব্যশর ও কবচ আকাশ হইতে পতিত হইল। তিনি জন্মিলে সকলেই আহ্লাদিত হইয়াছিল। সেই সুমহাত্মা সৎপুত্রের জন্ম হওয়াতে বেণও পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ পাইয়া ত্রিদিবে গমন করিলেন।'

এই অবাস্তব ঘটনার সুন্দর যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় তাঁর 'পুরাণ প্রবেশ' গ্রন্থে। 'আমরা এখন যেমন ইংরেজীতে body politic বলি, পুরাকালেও সেইরূপ রাজাকে দেহের সহিত তুলনা করা হইত। রাজসৈন্য রাজার বাহু, প্রজাগণ রাজার উরু, কারণ প্রজাদের সাহায্যেই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত; রাজার নিকটসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণ রাজার উদর, চরগণ রাজার চক্ষু ইত্যাদি। বেণের উরুমন্থন করিবার ফলে নিষাদরাজ জন্মিয়াছিল। নিষাদগণকে বিন্ধশৈলবাসী বলা হইয়াছে। ঋষিগণের হস্তে বেণের মৃত্যু ঘটিলে বেণরাজ্য অরাজক হয়, তখন বেণের ভূতপূর্ব প্রজা নিষাদগণ রাজ্য অধিকার করে, উরুমন্থন রূপকের ইহাই বক্তব্য। পরে বেণের দক্ষিণহস্ত মন্থন করিবার ফলে পৃথু জন্মগ্রহণ করেন অর্থাৎ বেণের সেনাপতিগণের মধ্যে সন্ধান করিয়া ঋষিগণ পৃথুকে মনোনীত করিয়া রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন।'

পৃথিবীর প্রথম রাজচক্রবর্তী সম্রাট ও পরবর্তী কাহিনী

পৃথুই প্রথম স্বাধীন একচক্রবর্তী সম্রাট হন এবং এই উপলক্ষে তিনি পৈতামহ যজ্ঞ করেন। যজ্ঞে সামগান কালে ইন্দ্র-স্তুতি কীর্তন না হয়ে তাঁরই স্তুতিগান করা হয়েছিল।' 'পুরাণ-প্রবেশ' গ্রন্থে শ্রীগিরীন্দ্র শেখর বসু মহাশয় লিখেছেন, 'তখন পর্যন্ত ইন্দ্র দেবতা হন নাই।' ঋক্‌বেদের পুরাতন ঋক্‌গুলিতে ইন্দ্র এক শূর বীর শত্রুহন্তারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। পরবর্তীকালে দিবি আরোহণের ফলে ইন্দ্র সূর্য ও বৃষ্টিকারী দেবরূপে পরিগণিত হন এবং এই কল্পিত ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে তখন যজ্ঞে হবি প্রদত্ত হইতে থাকে।'

পৃথুর অভিষেকক্রিয়া হল। বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনা তুলে ধরতে পারি। 'সমুদ্র ও নদী সকল সর্ব্বপ্রকার রত্ন ও অভিষেকার্থ জল গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার (পৃথুর) নিকট উপস্থিত হইলেন। অঙ্গিরস দেবগণের সহিত ভগবান পিতামহ ও স্থাবর জঙ্গম সকল সমাগত হইয়া নরাধিপ বৈণ্যকে স্নান করাইলেন। পিতামহ দক্ষিণহস্তে চক্র দৃষ্টি করিয়া পৃথুকে বিষ্ণুর অংশ বিবেচনা করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। চক্রবর্ত্তীদিগের মধ্যে যাঁহার প্রভাব দেবতারাও খর্ব্ব করিতে পারেন না, তাঁহারই হস্তে বিষ্ণুচিহ্ন চক্র থাকে। বিধিবৎধর্ম্মকোবিদগণ, মহাতেজা প্রতাপবান সেই বৈণ্য পৃথুকে মহৎ রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।' পৃথুকে প্রথম রাজা বলে অভিহিত করা হল। আমরা পূর্বেই বলেছি যে বেণের পূর্ববর্তী শাসনকর্ত্তাগণ ইন্দ্রের প্রতিভূ হিসেবে রাজ্যশাসন করতেন, তাঁরা কেউ রাজা ছিলেন না। বিষ্ণুপুরাণ বলছেন' 'পিতার অপরঞ্জিত প্রজাবর্গ তৎকর্তৃক অনুরঞ্জিত হইল। অনুরাগ হেতু তাঁহার নাম 'রাজা' হইল।'

আমরা আগে সূত ও মাগধ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। রাজা মাগধ বা ইতিবৃত্তকার নিয়োগ করতেন। মাগধরা সেই রাজা ও রাজবংশের ইতিবৃত্ত বা history

লিপিবদ্ধ করতেন। যেহেতু এতদিন পৃথিবীতে কোন রাজা ছিলেন না সুতরাং কোন মাগধ বা সূত ও ছিল না। পৃথু স্বাধীন রাজা হয়ে সূত ও মাগধ নিয়োগ করলেন। বিষ্ণুপুরাণে পরিষ্কার ভাষায় তার বর্ণনা রয়েছে। তিনি (পৃথু) জন্মমাত্র পৈতামহ যজ্ঞ করেন, তাহাতে সেই দিনেই সূতিতে (ঐ যজ্ঞের অন্তর্গত সোমযজ্ঞ ভূমিতে) মহামতি সূত ও ঐ মহাযজ্ঞে প্রাজ্ঞ মাগধ উৎপন্ন হন।' এখানে আরও একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে 'বেনের সেনাপতিগণের মধ্যে সন্ধান করিয়া ঋষিগণ পৃথুকে মনোনীত করিয়া রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন।' তা নাহলে জন্মমাত্রই কোন ব্যক্তি যজ্ঞ করতে পারেন না। পৃথু নির্বাচিত রাজা ছিলেন বলেই জন্মমাত্র অর্থাৎ নির্বাচিত হওয়ামাত্র পৈতামহ যজ্ঞ সম্পাদন করতে পেরেছিলেন। যাহোক মুণিগণ এবার মাগধ ও সূতকে পৃথুর স্তুতিগান করতে বললেন। তখন সূত ও মাগধগণ বললেন, 'অদ্যজাত এই মহীপতির কর্ম্ম বা গুণ জানা যাইতেছে না এবং ইহার যশও প্রথিত নাই, অতএব কি আশ্রয় করিয়া আমরা ইঁহার স্তব করিব বলুন।' তখন মুনিগণ বললেন, 'রাজচক্রবর্তী পৃথু যে সকল কর্ম করিবেন তোমরা তাহাই কীর্তন কর।' অর্থাৎ সোজাকথায় একজন রাজচক্রবর্তী রাজার করণীয় কাজ কি কি তাই বর্ণনা করতে বললেন মুণিরা। পৃথিবীতে রাজচক্রবর্তী সম্রাট কর্তৃক সূত ও মাগধ নিয়োগের পূর্বেও সূত ও মাগধ এর অস্তিত্ব ছিল, রাজচক্রবর্তী সম্রাটও ছিলেন। তা নইলে সদ্যজাত সূত ও মাগধের পক্ষে একজন রাজচক্রবর্তী সম্রাটের করণীয় কর্ম বর্ণনা করা সম্ভব কি? সূত ও মাগধ ও রাজচক্রবর্তী সম্রাট পৃথিবীতে পূর্বে ছিল না ঠিকই কিন্তু দেবতাদের নিজেদের গ্রহে নিশ্চয় ছিল।

বিষ্ণুপুরাণ এর পরে বলছেন, 'পরাশর কহিলেন, তদনন্তর নৃপতি তাহা শুনিয়া পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। বিবেচনা করিলেন, লোকে সদগুণ দ্বারা শ্লাঘ্যতা প্রাপ্ত হয় এবং ইঁহারা আমার গুণের স্তব করিবেন, অতএব অদ্য স্তোত্রে যেরূপ গুণ নির্ব্বর্ণন করিবেন, আমি সমাহিত হইয়া তাহাই করিব। যে বিষয় বর্জ্জনীয় বলিবেন তাহা বর্জ্জন করিব। অনন্তর সেই সূতমাগধ, ধীমান বৈণ্য পৃথুর ভবিষ্যকর্ম্ম দ্বারা সম্যক সুস্বরে স্তব করিতে লাগিলেন। এই নরেশ্বর নৃপ সত্যবাক, দানশীল, সত্যসন্ধ, লজ্জাশীল, মৈত্র, ক্ষমাশীল, বিক্রান্ত, দুষ্টশাসন, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, দয়াবান, প্রিয়ভাষক, মান্যমানয়িতা, যজ্ঞরত, ব্রহ্মণ্য, সাধুসম্মত, শত্রুমিত্রে সমদর্শী এবং ব্যবহারে স্থিত।'

অর্থাৎ পৃথিবীতে স্বাধীন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল এবং রাজার আদর্শ নিয়ন্ত্রিত হল নিজেদের গ্রহের রাজাদর্শে। পৃথু এই আদর্শ মেনে রাজ্যশাসন করেছিলেন। পৃথুর রাজত্বকালে দেবতাদের উপনিবেশ চরম উন্নতি লাভ করেছিল। কৃষিকার্য, বাণিজ্য, চলাচল ব্যবস্থা, বাসস্থান ইত্যাদি প্রভৃত উন্নতি লাভ করে। এই কাহিনীও

পুরাণকারেরা তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ কৌশলে বর্ণনা করেছেন; বিষ্ণুপুরাণ থেকে আমরা তুলে দিচ্ছি।

'অরাজক কালে সমস্ত ওষধি প্রনষ্ট হইলে প্রজাগণ ক্ষুধার্দ্দিত হইয়া সেই পৃথিবীনাথের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তৎকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তথায় গমন কারণ বলিতে লাগিলেন। প্রজাগণ কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ প্রজেশ্বর। অরাজক হইলে ধরিত্রী সকল ওষধি গ্রাস করিয়াছে, তাহাতে সমস্ত প্রজা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। বিধাতা তোমাকে আমাদের সমস্ত বৃত্তিপদ প্রজাপালক নিরূপণ করিয়াছেন, আমাদের ক্ষুধার্ত্ত প্রজাগণকে জীবনৌষধি দান কর। পরাশর কহিলেন, অনন্তর নৃপতি কুপিত হইয়া দিব্য আজগব ধনু ও শর সকল গ্রহণপূর্ব্বক বসুধার অনুধাবন করিলেন। বসুন্ধরা শীঘ্র গোরূপ হইয়া পলায়ন ও ত্রাসহেতু ব্রহ্মলোকাদিতে গমন করিলেন। ভূতধারিণী দেবী যে যে স্থানে গমন করিলেন, সেই সেই স্থানেই উদ্যতশস্ত্র বৈণ্যকে দেখিতে পাইলেন। তৎপরে বসুধা কম্পিতা ও তদ্বাণ হইতে পরিত্রাণ পরায়ণা হইয়া পৃথুপরাক্রম পৃথুকে বলিলেন, হে নরেন্দ্র নৃপ। তুমি কি স্ত্রীবধে মহাপাপ দেখিতেছ না? তাই আমাকে বিনষ্ট করিবার জন্য উদ্যম করিতেছ? পৃথু কহিলেন ওরে দুষ্টকারিণি। যেখানে একজন নিধন প্রাপ্ত হইলে অনেকের রক্ষা হয়, সেখানে সেই একেরই বধ পুণ্যপ্রদ। পৃথিবী কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ। তুমি প্রজাগণের উপকারের নিমিত্ত যদি আমাকে বধ কর, তবে তোমার প্রজাদের আধার কে হইবে? পৃথু কহিলেন, বসুধে। তুমি আমার শাসনপরাঙ্মুখী, তোমাকে বাণ দ্বারা হত করিয়া আমি আত্মযোগবলে এই সকল প্রজাধারণ করিব। পরাশর কহিলেন, তখন বসুধা কম্পিতাঙ্গী ও পরম ভীতা হইয়া রাজাকে প্রণামপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। পৃথিবী কহিলেন, উপায়ানুসারে কার্য্য করিলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়, অতএব তোমাকে উপায় বলিতেছি, যদি ইচ্ছা হয় কর। হে নরনাথ। সমস্ত ওষধি জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, যদি ইচ্ছা কর, তবে এই সকল ক্ষীর পরিণামিনী ওষধি আমি দিব। হে ধর্ম্মভৃতাংবর। প্রজাহিতার্থ আমাকে বৎস প্রদান কর, তাহাতে আমি বৎসলা হইয়া ক্ষরণ করি। হে বীর! আমাকে সমস্ততঃ সর্বত্র সম কর, তাহাতে বনৌষধির বীজভূত ক্ষীর সর্ব্বত্র ধারণ করি। পরাশর কহিলেন, তদনন্তর বৈণ্য ধনুঃ কোটি দ্বারা শত সহস্র শৈল উৎসারিত করিলেন, তাহাতেই শৈল সকল বিবর্দ্ধিত হইয়াছে। পূর্ব্ব সৃষ্টিতে বিষম পৃথিবীতলে পুর বা গ্রামের প্রবিভাগ, শস্য, গোরক্ষ, কৃষি ও বণিকপথ ছিল না। হে মৈত্রেয়। বৈণ্য হইতেই এ সকল সম্ভব। ভূমির যে যে স্থল সম ছিল, নরাধিপ সেই সেই স্থানে প্রজাদিগের নিবাস কল্পনা করিলেন। ওষধি সকল প্রনষ্ট হইলে তখন ফলমূল মাত্র প্রজাদের আহার হইয়াছিল, তাহাও অতি কষ্টে। পৃথিবীনাথ প্রভু পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বহস্তে পৃথিবী দোহন

করেন, তাহাতে তাঁহার প্রজাগণের হিতকামনায় শস্য সকল জন্মিল। হে তাত! প্রজাবর্গ অদ্যাপি সেই অন্নে জীবন ধারণ করিতেছে। প্রাণ প্রদান হেতু পৃথু, ভূমির পিতা হইয়াছিলেন, এজন্য অখিলভূত ধারিণী, পৃথিবী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তৎপরে দেব, মুনি, দৈত্য, অদ্রি, গন্ধর্ব্ব, উরগ, যক্ষ ও পিতৃগণ স্বাভিমত পাত্র গ্রহণে ভূমি হইতে স্বাভিমত বস্তু দোহণ করিলেন।'

এই কাহিনী থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে ৭০০০ বছর আগে দেবতাদের উপনিবেশ বেশ উন্নত হয়ে উঠেছিল।

পৃথুর দুই ছেলে অন্তর্দ্ধি ও পালী। অন্তর্দ্ধানের স্ত্রী শিখণ্ডিনী তাদের ছেলে হবির্দ্ধান। হবির্দ্ধানের স্ত্রী আগ্নেয়ী ধিষণা। এদের ছয় ছেলে প্রাচীনবর্হিঃ, শুক্র, গয়, রজ ও অজিন। প্রাচীনবর্হিঃ ছিলেন প্রজাপতি। যদ্দারা প্রজাবর্গ সংবর্দ্ধিত হয়। এঁর রাজত্বকালে প্রাচীনাগ্র কুশে পৃথিবী ভরে গিয়েছিল। অর্থাৎ প্রজাসকল ধ্বংস হয়েছিল। সমুদ্রতনয়া সবর্ণার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এদের প্রচেতা নামে ধনুর্বেদ পারঙ্গম দশ ছেলে হয়। তাঁরা একসঙ্গে বহুকাল সমুদ্রসলিলবাস হয়ে তপস্যা করেন। প্রচেতাগণের পিতা প্রাচীনবর্হিঃ প্রচেতাগণকে বললেন 'প্রজাপতি আমাকে প্রজা সংবর্দ্ধন কর এইরূপ আদেশ করায় আমি তথাস্তু বলিয়াছি। অতএব পুত্রগণ! তোমরা আমার প্রীতির নিমিত্ত অতন্দ্রিত হইয়া প্রজাবৃদ্ধি কর।' বিষ্ণুর আরাধনা করলেই প্রজাবৃদ্ধি হবে এইকথা শুনে প্রচেতাগণ সমুদ্রজলের মধ্যে বিষ্ণুর তপস্যা করেছিলেন। বিষ্ণু সন্তুষ্ট হয়ে তাদের প্রার্থিত বর দিলে তাঁরা সমুদ্রের জল থেকে উঠে আসেন।

প্রচেতাগণ যখন তপস্যা করছিলেন তখন আবার প্রজাক্ষয় হতে শুরু করে এবং জঙ্গল ও অরণ্যাণিতে দেশ ছেয়ে যায়। প্রচেতাগণ তপস্যা থেকে ফিরে এসে এইসব দেখে অরণ্য ধ্বংস করতে লেগে গেলেন। তাঁরা আগুন লাগিয়ে জঙ্গল সাফ করতে আরম্ভ করলেন। তখন বৃক্ষের রাজা সোম মরিষা নামে কণ্ডুমুনির পরিত্যাক্তা মেয়ের সঙ্গে প্রচেতাগণের বিয়ে দিলেন। এই কন্যা অরণ্যে বর্দ্ধিত হয়েছিল বলে তাকে বৃক্ষের কন্যা বলা হত এবং এইভাবে অরণ্যের সঙ্গে প্রচেতাদের সন্ধি হল ও এই কন্যার গর্ভে ও প্রচেতাদের ঔরসে জন্ম নিলেন প্রজাপতি দক্ষ।

আমরা পুরাণ থেকেই এ কথা জানি যে দক্ষ ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং তাঁর থেকেই প্রজাসকল সৃষ্টি হয় তাই তাঁর প্রজাপতি নাম। যাহোক এখানে অনেক পরবর্তী কালে তাঁকেই আবার দেখতে পাচ্ছি প্রচেতা ও মারিষের পুত্র হিসেবে। এখানেও তিনি প্রজাপতি। মৈত্রেয়র মনেও প্রশ্ন জেগেছিল, তিনি পরাশরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহামুনে! (ব্রহ্মার) দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের জন্ম হয় পূর্ব্বে শুনিয়াছি, তিনি পুনর্ব্বার প্রাচেতস কিরূপে হইলেন?' পরাশর তখন একটু দার্শনিক জ্ঞান

দিলেন আসল রহস্য না ভেঙেই। বললেন, 'ভূতগণের মধ্যে উৎপত্তি ও নিরোধ নিত্য, দিব্যচক্ষু ঋষিগণ এ বিষয়ে মুগ্ধ হন না। এই দক্ষাদি মুনিসত্তমগণ যুগে যুগে হইয়া থাকেন এবং পুনশ্চ নিরুদ্ধ (লীন) হন। বিদ্বান ব্যক্তি ইহাতে মোহপ্রাপ্ত হন না।'

যাহোক 'দক্ষ সৃষ্টি ও আত্ম-প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত বহুপুত্র উৎপাদন করেন। দক্ষ ব্রহ্মার আদেশে সৃষ্ট্যর্থ সমুপস্থিত হইয়া, মনের দ্বারা চর, অচর, দ্বিপদ, চতুষ্পদ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া পশ্চাৎ ষষ্টি (৬০) কন্যা সৃজন করেন। তিনি ধর্মকে দশ, কশ্যপকে ত্রয়োদশ কন্যা দিয়াছিলেন। কাল পরিবর্ত্তনে নিযুক্ত কৃত্তিকাদি সপ্তবিংশতি কন্যা ইন্দুকে দেওয়া হয়। এই সকল কন্যাতে দেব, দৈত্য, নাগ, গো, খগ, গন্ধর্ব, অপ্সর ও দানবাদির জন্ম। হে মৈত্রেয়! তদবধি প্রজাসকল মৈথুনসম্ভব হইতে লাগিল। পূর্বে সঙ্কল্প, দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা এবং অত্যন্ত তপস্বী সিদ্ধগণের তপোবিশেষ দ্বারা প্রজাসৃষ্টি হইত।' বিষ্ণুপুরাণ আরো বলছেন 'দক্ষ প্রথমে মন হইতে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব, অসুর ও পন্নগের সৃষ্টি করেন। হে দ্বিজ! যখন তাঁহার ঐ সকল মানসী প্রজা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বর্দ্ধিত হইল না, তখন তিনি সৃষ্টির নিমিত্ত বিবেচনাপূর্বক মৈথুন-ধর্ম দ্বারা প্রজাসিসৃক্ষু হইয়া বীরণ প্রজাপতির সুতা সুতপস্বিনী লোকধারিণী অসিক্লী নাম্নী মহতি কন্যাকে বিবাহ করেন।'

প্রাচীনবর্হিঃর সময় থেকে আমরা লক্ষ করছি প্রজাক্ষয় হচ্ছে। এরপর প্রচেতাদের সময় আরো প্রজাক্ষয় হল। দক্ষ তখন প্রজাপতি হয়ে প্রজা সৃষ্টির জন্য মৈথুন ধর্ম্ম প্রবর্তন করলেন। তার আগে সঙ্কল্প, দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা এবং অত্যন্ত তপস্বী সিদ্ধগণের তপোবিশেষ দ্বারা প্রজা সৃষ্টি হইত।

ব্যাপারটা এবার একটু আমাদের মত করে ব্যাখ্যা করতে চাই। পুরাণকারেরা অনেক সময় সহজ কথা সহজভাবে বলেন নি কিংবা গল্পোচ্ছলে সর্বসাধারণের জন্যে আসল কথাটি বলেছেন।

এতক্ষণ আমরা পুরাণ থেকে আলোচনা করে দেখিয়েছি যে হিরণ্যকশিপুর সময়ে স্বায়ম্ভুব মনুকল্পের গোড়ায় দেবতা এবং দেবজনেরা পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন। কোন এক জায়গায় তারা উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। আমার প্রথম গ্রন্থে বলেছি যে পৃথিবীতেও বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সেই সময় আদিম মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল। দেবতারা তাদের কথা কিছু পরিষ্কার করে লেখেন নি। ভিন্ন পরিবেশে নিজেদের উপনিবেশে তাঁরা নিশ্চয় প্রজাবৃদ্ধি করতে পারছিলেন না। প্রথম দিকে কোন মতে চলে যাচ্ছিল এবং আমরা দেখেছি পৃথুর রাজত্বকালে এই উপনিবেশ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক নিজেদের গোষ্ঠিবর্গ বিরাটভাবে বিস্তারলাভ করছিল না। তাই খুব সম্ভবতঃ তাঁরা স্থানীয় আদিম

অধিবাসীদের উন্নত করার চেষ্টা করছিলেন নিজেদের গ্রহের বৈজ্ঞানিক প্রথায় যার ইঙ্গিত রয়েছে এই কাহিনীর মধ্যে। আগে শুধু সংকল্প, দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা প্রজা সৃষ্টি হয়েছে বলে তো আমরা জানি না। আমরা দেখেছি রাজারা বিয়ে করছেন। তাদের ঔরসে তাঁদেব পত্নিদের গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হচ্ছে। তাহলে হঠাৎ এরকম একটি মন্তব্য করার কি প্রয়োজন ঘটল পুরাণকারের?

তাহলে দেবতারা কি কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে পৃথিবীর আদিম সন্তানদের উন্নত করার চেষ্টা করছিলেন 'অত্যন্ত তপস্বী সিদ্ধগণেব তপোবিশেষ দ্বারা।' আমরা যে অর্থে জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারীং বলি সেই ধরণের চেষ্টা করে কি দেববিজ্ঞানীরা সফল হতে পারছিলেন না? আমাদেব বিজ্ঞানীরাও তো সেই ধরণেব সন্দেহ পোষণ করেন যে জেনেটিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারীং এর সাহায্যে প্রাণীর উন্নতি ঘটালেও তা হয়তো বংশপরম্পবায় স্থায়ী ছাপ ফেলতে পারবে না। আর তাই খুব সম্ভবতঃ ঘটেছিল। এবং শেষ পর্যন্ত প্রজাপতি দক্ষ বহুবার চেষ্টার পর আবিষ্কার করলেন যে মৈথুনের সাহায্যে প্রজা সৃষ্টি সম্ভব। তাই কি বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বেও একই সুরের প্রতিধ্বনি দেখতে পাই: There were giants in the earth in those days, and after that, when the Sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown (Genesis 6 : 4)

রামায়ণে আমরা দেখি ব্রহ্মা দেবতাদেব বলছেন, 'তোমরা বানররূপী হইয়া মুখ্য মুখ্য অপ্সরা, গন্ধর্বী, যক্ষী, পন্নগী, ভল্লুকী, বিদ্যাধরী, কিন্নরী ও বানরীতে স্বতুল্য পরাক্রমসম্পন্ন পুত্র নিচয় উৎপন্ন কর।'

এ প্রসঙ্গে আগেকার অধ্যায়ে আলোচিত Scott-Eliot এর বক্তব্য স্মরণ করুন। লেমুরিয়াবাসীরা যখন পঞ্চম উপজাতিতে বিবর্তিত হল তখন তারা যৌনক্রিয়ার সাহায্যে বংশবৃদ্ধি করতে শিখল। কিন্তু এই সময় তারা পশুদের সঙ্গেও সঙ্গমক্রিয়ায় রত হতে লাগল এবং বানর ও অন্যান্য কদাকার পশুর জন্ম দিতে শুরু করল।

এসব কাহিনী কি একটি বিশেষ সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না?

মনু ও জলপ্লাবন

এরপর আসছি আমরা সপ্তম ও শেষ মনু বৈবস্বতের কাহিনীতে। পুরাণে চোদ্দজন মনুর কথা থাকলেও আসলে দেখা যায় সপ্তম মনু বৈবস্বত মনুর পরই মনু গণনা বন্ধ হয়ে গেছে; এই বৈবস্বত মনুর কালকেই কল্পশেষ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। 'পুরাণ প্রবেশ' গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় এ সম্বন্ধে বলেছেন, 'মনুগণনা সপ্তম মনুকাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, পরে ইহা রহিত হয় ও পুরাণকার

কালনির্দেশের জন্য পৈত্র যুগমানই প্রয়োগ করেন। বৈবস্বত মনু সপ্তম মনু। তাঁহার পরে সাবর্ণি মনু ও পর পর অন্যান্য মনুগণের আসা উচিৎ ছিল কিন্তু তাঁহারা আসেন নাই। তাঁহাদের নাম পাওয়া যাইলেও তাঁহারা ভবিষ্য মনুই থাকিয়া গিয়াছেন ও বৈবস্বত মনুকাল কল্পশেষ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। মনুসংহিতায় ১৪ মনু নাই, মাত্র সপ্ত মনুর নাম আছে, যথা,

স্বায়ম্ভুবস্যাস্য মনোঃ ষড়্‌বংশ্যা মনবোঽপরে।
সৃষ্টবন্তঃ প্রজাঃ স্বাঃ স্বা মহাত্মানো মহৌজসঃ॥
স্বারোচিষশ্চৌত্তমিশ্চ তামসো রৈবতস্তথা।
চাক্ষুষশ্চ মহাতেজা বিবস্বৎসুত এব চ।
স্বায়ম্ভুবাদ্যাঃ সপ্তৈতে মনবো ভূরিতেজসঃ।
স্বে স্বেঽন্তরে সর্ব্বমিদমুৎপাদ্যাপুশ্চরাচরং॥

মনু। ১। ৬১-৬৩॥

'অর্থাৎ এই স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে মহাবীর্যবান মহাত্মা অপর ছয়জন মনু জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা আপন আপন অধিকারকালে প্রজাসকল সৃষ্টি করেন। ইঁহাদের নাম স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, মহাতেজা, চাক্ষুষ এবং বিবস্বতপুত্র। প্রবল তেজসম্পন্ন স্বায়ম্ভুবাদি এই সপ্তমনু নিজ নিজ অধিকার কালে এই সমস্ত উৎপাদন করিয়া চরাচর প্রতিপালন করেন।'

মনুসংহিতার লেখক হচ্ছেন বৈবস্বত মনু। পুরাণে চোদ্দজন মনুর উল্লেখ থাকলেও দেখা যাচ্ছে সপ্তম মনু বৈবস্বতের পর আর কোন মনু গণনা হয় নি। পরবর্তী মনুগণ থেকে গেছেন ভবিষ্য মনু। বৈবস্বত মনুর নিজের লেখা মনুসংহিতায় সাতজন মনুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী ভবিষ্য মনুগণের কোন উল্লেখ পর্যন্ত নেই। এ থেকে আমরা স্বাভাবিকভাবেই একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে বৈবস্বত মনুকালে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল যার জন্যে পুরাণকাররা মনুকাল গণনা শেষ করে আর এক নতুন কাল গণনা (পৈত্র) শুরু করেছিলেন। কি সেই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঘটনা যা প্রাচীন ইতিহাসকাররা এভাবে চিহ্নিত করে রেখেছেন? এই বৈবস্বত মনুর কালেই ঘটে মহাপ্লাবন। এই প্লাবন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 'বহু বৎসর কাল' সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বৈবস্বত মনু এসে উপস্থিত হন হিমালয়ে। বহুবৎসর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে কোথা থেকে হিমালয়ে এসে পৌঁছেছিলেন বৈবস্বত মনু সে সম্বন্ধে অবশ্য স্পষ্ট কোন স্থানের বা ভূখণ্ডের নাম পাওয়া যায় না। তবে পরোক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণ যুক্তিতর্কের সাহায্যে সেই ভূখণ্ড যে লেমুরিয়া তা বোধহয় আমরা প্রমাণ করতে পারব। মনু ও মৎস্য অবতারের কাহিনী ভাগবত, স্কন্দ, মৎস্য, অগ্নি, গরুড় এবং পদ্মপুরাণে দেখতে পাওয়া যায়। যাহোক এ কাহিনী আছে

মহাভারতের বনপর্বে। সেখান থেকে আমরা কাহিনীটি তুলে ধরছি কৌতুহলী পাঠকদের জন্য।

'বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, আপনি এক্ষণে বৈবস্বত মনুর চরিত কীর্ত্তন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে মহারাজ নর-শার্দ্দূল! বিবস্বানের পুত্র, প্রজাপতি তুল্য তেজস্বী, মনু নামে এক মহর্ষি অতি প্রতাপ-শালী রাজা ছিলেন। তিনি বল, তেজ, কান্তি, দীপ্তি ও তপস্যা দ্বারা স্বকীয় পিতৃ-পিতামহকে বিশেষরূপে অতিক্রম করেন। সেই নরপতি বিশালা বদরীতে একপদে স্থিত ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সুমহৎ কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি অধোমস্তক হইয়া অনিমেষনেত্র অযুতবর্ষকাল ঘোর তপস্যা করেন' তিনি চারিণী নদীতীরে জটাধারী হইয়া আর্দ্রবস্ত্রে তপস্যায় রত আছেন, সেই সময়ে একটি মৎস্য তথায় আসিয়া তাঁহাকে বলিল, হে ভগবন্ সুব্রত! আমি ক্ষুদ্র মৎস্য, আমার প্রবল মৎস্য-গণ হইতে ভয় হইতেছে, অতএব আপনি আমাকে তাহাদিগের ভয় হইতে রক্ষা করুন। বিশেষত আমাদিগের মীন জাতির চিরকাল এই রীতি বিহিত আছে যে, বলবান্ মৎস্যেরা দুর্ব্বল মৎস্যকে সর্ব্বদা ভক্ষণ করিয়া থাকে; অতএব আমি মহা ভয়ার্ণবে মগ্ন হইয়াছি, আপনি আমাকে তাহা হইতে উদ্ধার করুন; আপনি এই কার্য্যটি করিলে আমি আপনার প্রত্যুপকার করিব। বৈবস্বত মনু মৎস্য বচন শ্রবণে কৃপাসলিলে অভিষিক্ত হইয়া সেই মৎস্যকে হস্তদ্বারা স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি সেই চন্দ্রাংশুপ্রভ মৎসকে উদক হইতে তীরে আনয়ন করিয়া এক অলিঞ্জরে—জলাধার পাত্রবিশেষে—প্রক্ষেপ করিলেন। সেই মীন মনু-স্নেহে সংকৃত হইয়া অলিঞ্জরে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; মনুও তাহার প্রতি বিশেষরূপে পুত্রবাৎসল্য ভাব করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই মৎস্য দীর্ঘকালে এমন সুমহান্ হইয়া উঠিল যে, সে অলিঞ্জরে তাহার দেহের সমাবেশ হইল না। পরে সেই মৎস্য মনুকে দেখিয়া পুনর্ব্বার কহিল; ভগবন্! আপনি এক্ষণে আমার নিমিত্ত কোন উত্তম স্থান নিরূপণ করুণ। তখন পরপুরঞ্জয় ভগবান্ মনু ঐ মৎস্যকে সেই অলিঞ্জর হইতে উদ্ধৃত করিয়া এক মহতী বাপী সমীপে আনয়ন পূর্বক তাহাতে প্রক্ষেপ করিলেন। তাহাতে সেই মৎস্য বহু বর্ষ পর্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সেই বাপীর দীর্ঘতা দুই যোজন ও বিস্তার এক যোজন ছিল, কিন্তু মৎস্য এতাদৃশ বর্দ্ধিত হইল যে, তাহাতেও তাহার শরীর সঞ্চারণে সমাবেশ হইল না। হে কুন্তীনন্দন! তখন সে মনুকে দেখিয়া পুনর্বার কহিল, হে তাত! আমাকে সমুদ্রের প্রিয় মহিষী গঙ্গাতে লইয়া চলুন, আমি তথায় বসতি করিব, নতুবা আপনি যাহা বিবেচনা করেন করুন। আমি অসূয়ারহিত হইয়া আপনার নির্দেশানুসারেই থাকিব; কেননা আমি আপনার নিমিত্তই পরম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বৃহৎকায় হইতেছি। মৎস্য ভগবান প্রভু মনুকে এইরূপ কহিলে মনু মৎস্যকে গঙ্গা

নদীতে লইয়া গেলেন এবং তথায় প্রক্ষেপ করিলেন। হে অরিন্দম। সেই মৎস্য তথায় কিছুকাল থাকিয়াই বর্দ্ধিত হইল এবং পুনর্বার মনুকে দেখিয়া কহিল হে প্রভো! আমার বৃহৎকায় হেতু গঙ্গাতেও শরীর চালনা করিতে পারিতেছি না, অতএব হে ভগবান্। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাকে সমুদ্রে লইয়া চলুন। পরে মনু স্বয়ং তাহাকে গঙ্গা সলিল হইতে উদ্ধৃত করিয়া সমুদ্রে আনয়ন করিলেন এবং তথায় পরিত্যাগ করিলেন। তখন সেই প্রকাণ্ড বৃহৎ মৎস্যকে বহন কবিয়া লইয়া যাইতে তাহার ভার বৈবস্বত মনুর অভিলাসানুযায়ীই হইল এবং তাহার স্পর্শ গন্ধও সুখকর হইল। যখন মনু ঐ মৎস্যকে প্রক্ষেপ করিলেন, তখন এই কার্য্য হেতু সেই মৎস্য ঈষৎ হাস্যপূর্বক কহিল হে ভগবান্! আপনি আমাকে বিশেষরূপে সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছেন, অতএব উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে আপনার যাহা কর্তব্য, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। হে ভগবন্! মহাভাম! লোক প্রক্ষালনের সময় উপস্থিত হইয়াছে, অবিলম্বেই এই পৃথিবীর স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় পদার্থ প্রলয়প্রাপ্ত হইবে। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কি জড়, কি চেতন, সকলেরই মহাভীষণ কাল সমাগত হইয়াছে। অতএব আপনার যাহা বিশেষ হিতকর, তাহা অদ্য আপনাকে জানাইতেছি। আপনি একখানি রজ্জু সংযুক্ত সুদৃঢ় নৌকা নির্মাণ করাইবেন এবং তাহাতে সপ্ত ঋষির সহিত আরোহণ করিবেন। হে আয়ুষ্মন্! পূর্বে দ্বিজগণ যে সমস্ত বীজের কথা কহিয়াছিলেন, সেই সকল বীজ ঐ নৌকাতে উত্তোলন পূর্বক বিভাগক্রমে সুরক্ষিত করিবেন এবং আপনি নৌকাতে থাকিয়া আমার প্রতীক্ষা করিবেন। হে মুনিজনপ্রিয় তাপস। তখন আমি শৃঙ্গযুক্ত হইয়া আসিব, আপনি আমার শৃঙ্গ দেখিলেই আমাকে জানিতে পারিবেন। আমি যেরূপ কহিলাম, আপনি তাহাই করিবেন, কারণ আপনি আমা ব্যতিরেকে তাদৃশ জলার্ণব উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না। এক্ষণে আপনাকে সম্ভাষণ করিতেছি, আমি গমন করি। হে বিভো! আমার এই কথায় কোন আশঙ্কা করিবেন না। বৈবস্বত মনু 'এইরূপ করিব' বলিয়া মৎস্যকে সম্ভাষণ করিলেন। পরে মনু ও মৎস্য পরস্পর অনুজ্ঞাত হইয়া যথাভিলষিত স্থানে গমন করিলেন।

'মহারাজ! তদনন্তর মনু, মৎস্য যেরূপ কহিয়াছিল, তদনুসারে সর্ব্ব প্রকার বীজ লইয়া এক শুভ নৌকারোহণে মহাতরঙ্গবিশিষ্ট উদধিতে ভাসমান হইলেন এবং মৎস্যকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন সেই মৎস্য তাঁহার চিন্তা অবগত হইয়া শৃঙ্গিরূপে তৎক্ষণাৎ তথায় সমাগত হইল। মনু সেই জলার্ণবে মৎস্যকে তদুক্ত রূপানুযায়ী শৃঙ্গিরূপে পর্ব্বতের ন্যায় উচ্ছ্রিত দেখিয়া তাহার মস্তকস্থ শৃঙ্গে বটারকময় পাশ বন্ধন করিলেন। মৎস্য সেই পাশ দ্বারা সংযত হইয়া তরঙ্গাবলিতে নৃত্যমান ও জলরাশিতে গর্জমান, সেই সমুদ্র হইতে মনু প্রভৃতি সকলকে নৌকা দ্বারা উত্তীর্ণ

করিবে বলিয়া মহাবেগে ঐ তরণীকে লবণ জলমধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সেই তরণী তাদৃশ মহার্ণবমধ্যে প্রচণ্ড সমীরণে ক্ষোভ্যমাণ হইয়া মত্ত চপলা স্ত্রীর ন্যায় ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল। তৎকালে ভূমি বা দিক্‌বিদিক্ কিছুই দৃষ্টিগম্য রহিল না; অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকসকলই জলময় হইয়াছিল। হে ভরতপুঙ্গব! লোকসকল এবম্ভূত জলাকীর্ণ হইলে কেবলমাত্র মৎস্য, মনু ও সপ্ত-ঋষি দৃষ্টিগোচর রহিলেন। মহারাজ! এইরূপে সেই মৎস্য নিরলস হইয়া বহু বৎসর কাল তাদৃশ জলসমূহ মধ্যে সেই নৌকা আকর্ষণ করিল। পরিশেষে হিমালয় গিরির যে শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গ, তাহার সমীপে আকর্ষণ করিয়া আনিল। অনন্তর সেই মীন ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক ঋষিদিগকে কহিল, আপনারা এই হিমালয়-শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করুন, বিলম্ব করিবেন না। তখন ঋষিরা মৎস্যের কথা শুনিয়া সত্বর হইয়া সেই হিমালয়-শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিলেন। হে ভরতকুলপ্রদীপ কুন্তিনন্দন! অদ্যাপি সেই হিমাচলের শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গ নৌকাবন্ধন নামে বিখ্যাত রহিয়াছে জানিবেন।'

আমাদের তত্ত্বের স্বপক্ষে সাক্ষ্য হিসেবে এই কাহিনীটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কাহিনীর মধ্যে যে বক্তব্যগুলি রয়েছে তা একটু বিশদভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে:

(এক) নরপতি বৈবস্বত মনু বিশালা বদরীতে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। এই বিশালা বদরী বর্তমানের হিমালয়ের বুকের বদরীনাথ নয়। কারণ হিমালয়ের বুকের বদরীনাথ থেকে হিমালয়ের নৌকোবন্ধনে পৌঁছুতে নিশ্চয় সমুদ্রে জাহাজ ভাসাতে হয় না, আর তার জন্য কয়েক বৎসর সময়েরও প্রয়োজন হয় না। বৈবস্বত মনু চীরিনী নদীতীরে তপস্যা করার সময় প্রথম মৎস্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। মৎস্য মাৎস্যন্যায়ের আভাস দেয়। আর মৎস্যের দেহ বৃদ্ধি পাওয়ার গল্পটা আজগুবি মনে হলেও এর একটা সহজ ব্যাখা আছে, তা হচ্ছে ক্রমশঃ জল বর্দ্ধিত হয়ে একটি ভূখণ্ডকে গ্রাস করে ফেলছিল। ব্যাখ্যাটা হয়তো কষ্ট কল্পিত নয়। এখানে যে গঙ্গানদীর উল্লেখ করা হয়েছে তা স্বাভাবিক কারণেই আমাদের বর্তমান গঙ্গা নদী হতে পারে না।

(দুই) এই কাহিনীর মধ্যে জলপ্লাবনের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও একটা কথা স্পষ্ট তা হচ্ছে এই জলপ্লাবন হঠাৎ কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার নয়। আগেই বলেছি মৎস্যের দেহবৃদ্ধি ব্যাপারটা একটা প্রতীকি ব্যাপার। আসল কথা সমুদ্র ধীরে ধীরে একটি ভূখণ্ডকে গ্রাস করছিল। পুরাণকাররা কৌশলে সে কথা বর্ণনা করেছেন, 'ভগবান মনু ঐ মৎস্যকে সেই অলিঞ্জর হইতে উদ্ধৃত করিয়া এক মহতী বাপী সমীপে আনয়ন পূর্বক তাহাতে

প্রক্ষেপ করিলেন। তাহাতে সেই মৎস্য বহুবর্ষ পর্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।' ইত্যাদি।

আর বলা হয়েছে, 'লোক প্রক্ষালনের সময় উপস্থিত হইয়াছে।' প্রক্ষালন অর্থে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলা বোঝায়। অর্থাৎ জলপ্লাবনে লোকক্ষয়ের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। জলপ্লাবনের কোন ভয়াবহ চিত্র অবশ্য এ কাহিনীতে উপস্থিত নেই তবে জলপ্লাবিত দেশ থেকে মাইগ্রেসানের কথা খুবই স্পষ্ট। মনু জাহাজ তৈরী করে পূর্বে দ্বিজগণ যে সমস্ত বীজের কথা কহিয়াছিলেন, সেই সকল বীজ ঐ নৌকাতে উত্তোলনপূর্বক বিভাগক্রমে সুরক্ষিত করে রেখেছিলেন পরবর্তী উপনিবেশে কাজে লাগাবার জন্যে। মনুর সঙ্গে জাহাজে বা নৌকায় ছিলেন সাতজন ঋষি। এই ঋষিরা রক্তমাংসের মানুষও হতে পারেন অথবা দুস্তর সাগর পাড়ি দেওয়ার সময় সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাহায্যে ধ্রুবতারা নীরিক্ষণ করে দিগনির্ণয়ও হতে পারে।

এই বৈবস্বত মনুর কাল হচ্ছে প্রায় ৬০০০ বৎসর আগে। এই সময়ের কিছু আগে পরে দেবতারা লেমুরিয়া ছেড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলেন ও নতুন নতুন সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন। ভাগবতে এই মনু কাহিনী অন্য ভাবে বর্ণিত আছে সেখানে 'দ্রাবিড় দেশের কৃতমালা নদী এই আখ্যানের সহিত যুক্ত এবং সেই দেশের রাজা সত্যব্রতই মনুর পরিবর্তে এই 'কাহিনীর নায়করূপে চিত্রিত।' (পুরাণ-পরিচয়) ভাগবতে হঠাৎ খাপছাড়াভাবে দ্রাবিড় দেশের রাজার কাহিনী এল কেন? এর মধ্যে কি কোন প্রাচীন স্মৃতি কাজ করছে?

যাহোক আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করে আমরা এ অধ্যায়ের ইতি টানব। মনুর কাহিনীর শেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মনু বৈবস্বতকে আবার নতুন করে প্রজা সৃষ্টি করতে হল। দ্বিতীয় উপনিবেশ হিমালয়ে মনু নতুন করে প্রজা সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করলেন। 'তখন মৎস্য সেই সমবেত ঋষিদিগকে কহিল, আমি প্রজাপতি ব্রহ্মা, আমা ব্যতীত অন্য কেহ আর জ্ঞেয় নাই, আমি মৎস্যরূপ হইয়া এই মহাভয় হইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিলাম। মনু সুরাসুর, মানুষ প্রভৃতি সর্বপ্রকার প্রজা কি জড় কি চেতন সমস্তই সৃষ্টি করিবেন। ইঁহার তীব্র তপোবলে প্রজা সৃষ্টি বিষয়ে প্রতিভা হইবে এবং আমার প্রসাদে ইনি প্রজা সৃষ্টি বিষয়ে মোহ প্রাপ্ত হইবেন না। মৎস্য এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ অদর্শন হইল। তদনন্তর বৈবস্বত মনু স্বয়ং প্রজা স্রষ্টুকাম হইলেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে অত্যন্ত মোহপ্রাপ্ত হইলেন; এই নিমিত্ত মহৎ তপস্যা আরম্ভ করিলেন। হে ভরতর্ষভ। তিনি স্বয়ং মহাতপস্যাতে সংযুক্ত হইয়া সমুদায় প্রজা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।'

বৈবস্বত মনু ৬০০০ বৎসর আগে লেমুরিয়া ছেড়ে ভারতের উত্তরখণ্ডে এসে রাজত্ব স্থাপন করলেন। হিমালয়ের বুকে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা চালালে একদিন না একদিন

এইসব প্রাচীন সভ্যতার ভগ্নাবশেষ বা কোন বিচ্ছিন্ন অংশ আবিষ্কার হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। শ্রী রানী চন্দর লেখা 'হিমাদ্রি' গ্রন্থে পাই, 'মন্দাকিনীর উৎপত্তি স্থানের দুমাইল উপরে চোরাবারি নামে অনন্ত বরফের সমুদ্র। তা থেকে কঠিন বরফ স্তর প্রতিনিয়ত নীচে গড়িয়ে পড়ছে। মধুগঙ্গার উপরে তিনচার মাইল বিস্তৃত নির্মল জল পরিপূর্ণ বাসুকি সাগর। চার দিক কোন এক সময়ে প্রস্তরে বাঁধানো ছিল। লম্বা লম্বা প্রস্তর ভগ্নাবস্থায় এখনো নাকি দেখা যায় সাগর তীরে। সাপের মত জল-তরঙ্গ নিয়ত উঠছে ঐ জলাশয়ে, তাই তার নাম বাসুকি সাগর। এই প্রদেশই নাগলোক।' রামায়ণ থেকে আমরা জানি যে নাগরা ঋষভ পর্বতে (ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপে—আমাদের মতে লেমুরিয়ার বিচ্ছিন্ন অংশ) বাস করত তারা পরবর্তীকালে দেবতাদের পক্ষে যোগ দেয় এবং হিমালয়ে চলে আসে। তারা কি এই বাসুকি সাগরের কূলে বসবাস করতে শুরু করেছিল, তাই এই প্রদেশের নাম নাগলোক? এসব নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা হওয়া উচিত বলেই আমরা মনে করি। রানী চন্দর গ্রন্থে আরও একটা কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী আছে—'পাণ্ডা বললে, মন্দাকিনী আর স্বর্গারোহিনী যেখানে মিলিত হয়েছে সেখান থেকে স্বর্গারোহিনীর ধারা ধরে পূব দিকে কতকটা উঠে দক্ষিণে এগিয়ে গিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দু'মাইল পাথর আঁকড়ে উঠে আবার এক মাইল পর্বতের ওদিকে নেমে অর্ধ-চন্দ্রশিলায় পৌঁছানো যায়। অর্ধচন্দ্রাকার একখানি দশ-পনেরো হাত লম্বা ও সাত আট হাত উঁচু প্রস্তরখণ্ড। এখান থেকেই ঠিক উত্তর-পূর্বে বদরিকাশ্রম। বহুকাল আগে এই পথেই কেদারবদরী চলাচল হত। এখন ঘুরে যায় সকলে, বহু মাইল পথ মাড়িয়ে। শুনেছি, অর্ধচন্দ্রশিলার গায়ে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা আছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কেউ তার অর্থ বুঝতে পারেন নি।'

আমাদের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ ওই এলাকাটি একটু নাড়াচাড়া করে দেখুন না, বরফের রাজ্য থেকে কোন লুপ্ত তথ্য উদ্ধার করতে পারেন কিনা।

যাহোক পূর্ব কথায় ফিরে আসি। বৈবস্বত মনু যে রাজবংশ স্থাপন করলেন তার নাম ইক্ষাকুবংশ। ইক্ষাকু হচ্ছেন মনু বৈবস্বতের পুত্র। এই রাজবংশ হচ্ছে সূর্যবংশ। মজার কথা এই যে পৃথিবীর প্রাচীন রাজবংশগুলির মধ্যে অনেকেই সূর্য বংশের সন্তান। মায়ারা সূর্যবংশোদ্ভূত। জাপানের সম্রাটরা সূর্যের সন্তান। অ্যানড্রু টমাস তাঁর 'আমরাই কি প্রথম?' গ্রন্থে বলেছেন 'নক্ষত্রলোকের জীবরাই হয়তো পৃথিবীর প্রথম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, সূর্যসম্রাটরূপে সেই সাম্রাজ্য শাসন করতে থাকে এবং শেষে একদিন তাদের পার্থিব উত্তরাধিকারীদের হাতে সূর্যবংশের উত্তরাধিকার দান করে যায়। এই সম্ভাবনার অনুমোদন পাওয়া যায় মিশর, ভারত, চীন, গ্রীস, মেক্সিকো এবং পেরুর পুরাকাহিনীতে। এতে দেখা যায় যে একসময়ে

দেবতারা পৃথিবীর মানুষকে শাসন করতো।'

রামায়ণ যে দেবতাদের গোষ্ঠী যুদ্ধের ইতিহাস সে কথা আমার প্রথম গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় বলেছি। লঙ্কার অস্তিত্ব প্রমাণ করে আমরা সেই কথায় আর একবার জোর দিয়ে বলতে চাই। রাম রাবণ কেউই কাল্পনিক ব্যক্তি নন।

সূর্যোবংশোদ্ভব রাম যে কাল্পনিক ব্যক্তি নন তা প্রমাণ করেছেন সিমলার ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড্ স্টাডির ডিরেক্টর অধ্যাপক বি, বি, লাল। সম্প্রতি তাঁর নেতৃত্বে একদল প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য শেষে ঘোষণা করেন যে রাম অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন এবং অযোধ্যা নিশ্চিতভাবে রাজা দশরথের রাজধানী ছিল। অধ্যাপক লাল রামায়ণের রচনাকাল আজ থেকে ২৮০০ বৎসর পূর্বে বলে মনে করেন। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭।৪।৮০)।

রামায়ণের রাম চরিত্র সত্যি হলে রাবণ চরিত্রও নিশ্চয় সত্য। কারণ একজন বাস্তব মানুষ একজন কাল্পনিক মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এই ব্যাপারটাই অবাস্তব। বাল্মীকি কোন কাল্পনিক কাব্য লেখেন নি, তিনি লিখেছিলেন ইতিহাস। দেবতা (আর্য) আর রাক্ষস (অনার্য) দের গোষ্ঠী যুদ্ধের ইতিহাস। তাই আমরা একথা বলতে চাই 'রাবণ সত্য, লঙ্কা সত্য'। লঙ্কা যে সত্য এবং মানুষের অতীতের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের এক প্রয়োজনীয় চাবিকাঠি তা আমাদের আগের আলোচনা থেকেই প্রমাণিত। রাবণও একজন বেদবিশারদ, প্রজ্ঞাবান দ্রাবিড় রাজা ছিলেন ; তিনি মোটেও কাল্পনিক ব্যক্তি নন।

'হিন্দু রসায়ণ শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' (১ম ভাগ), গ্রন্থের রচয়িতা রাজবৈদ্য ডক্টর শ্রী প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় রাবণ সম্পর্কে লিখেছেন :

'রসায়ন-শাস্ত্র ও পদার্থ-বিজ্ঞান এই উভয় শাস্ত্রনিষ্ণাত লঙ্কেশ্বর রাবণ বণৌষধি সম্ভূত ভেষজদ্রব্যের আণবিক শক্তির বিচিত্র প্রভাব সর্ব্বপ্রথমে অবগত হইয়াছিলেন।

'পুলস্ত্যপৌত্র রাবণ অশ্মরী রোগাধিকারে কুশ এবং বরুণের অর্কপ্রয়োগের বিধি লিপিবদ্ধ করিয়া আধুনিক যুগের আবির্ভাবের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের অগ্রগতি কুশমূলের শীতকষায় হইতে বহুলাংশে বৃদ্ধি করিয়া বর্ত্তমান সময়ের রাসায়নিকগণের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছেন।'

'আধুনিক কালের বিভিন্ন প্রকার মৃতসঞ্জীবনী সুরার ব্যবহার সর্ব্বশ্রেণীর চিকিৎসকের মধ্যে প্রচলিত আছে। রাবণকৃত মদ্য নির্মাণ প্রণালী বিচিত্র এবং অপূর্ব্ব রণোৎসাহপ্রদ, বলপুষ্টি, তুষ্টিকারক ও বিশেষভাবে উৎসাহবর্দ্ধক। রাবণ প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে মদ্য প্রস্তুত করিলে ভারতের বাজারে বিলাতী মদ্যের আমদানী বন্ধ হইয়া যাইবে। মদ্য নির্ম্মাণের কথা ছাড়িয়া দিলেও সকল প্রকার ব্যাধি চিকিৎসায় রাবণকৃত অর্কপ্রকাশে লিখিত নিয়মানুযায়ী অর্ক প্রস্তুত করিয়া চিকিৎসা করিলে

দরিদ্র ভারতবাসী চিকিৎসাকার্য্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অপেক্ষাও অল্পমূল্যে ঔষধ পাইতে পারিবেন। রাবণকৃত অর্কপ্রকাশ বঙ্গদেশে দুস্প্রাপ্য নহে।'

'হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের অগ্রগতির ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসে মৃত সঞ্জীবনীর স্থান অতি উচ্চে। হিন্দু রসায়ন কথিত এই একটি ঔষধ লঙ্কেশ্বর রাবণ প্রদর্শিত নিয়মানুযায়ী নির্ম্মিত হইয়া বিক্রীত হইলে খাদ্য প্রাণবিহীনতার জন্য বিভিন্নপ্রকার দুঃসাধ্য রোগাক্রান্ত ভারতীয় জনগণ বহুপ্রকার তথাকথিত অপুষ্টিজনিত রোগনিচয় হইতে মুক্তিলাভ করিবেন।'

'মহারাজ রাবণ বিজ্ঞান শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। রামচন্দ্র এবং তাঁহার সৈন্য ও সেনাপতিগণ লঙ্কা হইতে চিকিৎসা এবং রসায়ন শাস্ত্র বিষয়ে বহু তথ্য ভারতে আনয়ণ করিয়াছিলেন।'

এরপরও কি বলা যায় যে রাবণ একজন কাল্পনিক ব্যক্তি ছিলেন?

জলপ্লাবনের গল্পের দাবীদার সবাই

মানব সভ্যতার উন্মেষকালে এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগে সারা পৃথিবী নাকি কেঁপে উঠেছিল। আকাশে দেখা দিয়েছিল লেলিহান অগ্নিশিখা। মানুষ ভয়ে আতঙ্কে ছুটেছিল নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। যারা পালাতে পারে নি তারা ধ্বংস হয়েছিল দলে দলে। আকাশ কালো হয়ে উঠেছিল। শুরু হয়েছিল ভয়াবহ বারি বর্ষণ। কোন কোন জায়গায় বৃষ্টির জলের বদলে পড়েছিল তাজা রক্ত। কোন কোন জায়গায় আকাশ থেকে পড়েছিল পাথরের টুকরো। কোথাও শুরু হয়েছিল প্রবল ঝঞ্ঝা। আকাশ থেকে অগ্নি বৃষ্টিও হয়েছিল কোথাও কোথাও। সারা পৃথিবীর সব কিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। মানুষ-পশু সব ভেসে গিয়েছিল সেই ভয়াবহ প্লাবনে। ধ্বংস হয়েছিল অরণ্যানী। যারা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল তারাও রেহাই পায় নি। অন্ধকার গ্রাস করেছিল পৃথিবীকে। পর্বতসমূহ ভেঙে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। ভূমিকে গ্রাস করেছিল সমুদ্র। প্রভঞ্জন দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল সারা পৃথিবী জুড়ে। প্রলয়ঙ্করী সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়তে শুরু করেছিল তটভূমিতে। বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণে ভূগর্ভ থেকে উঠে এসেছিল গলিত উত্তপ্ত লাভাস্রোত। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে কাতর হয়ে পড়েছিল পৃথিবী। কোন কোন জায়গার সমুদ্রের জল ফুটতে শুরু করেছিল।

এই ভয়াবহ জলপ্লাবনের ও দুর্যোগের কাহিনী পৃথিবীর প্রায় সব দেশের পুরাণ, ধর্মগ্রন্থ ও লোকগাঁথার মধ্যে বেঁচে রয়েছে। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে এইসব বিভিন্ন দেশের কাহিনীর মধ্যে একটা গভীর মিল আছে; এমনকি বহু কাহিনীর বিশদ বিবরণের মধ্যেও বেশ মিল চোখে পড়ে। তাই মনে হয় একটি বিশেষ ঘটনাই

যেন এইসব বিভিন্ন দেশের কাহিনীগুলির আদি উৎস। সারা পৃথিবী জুড়ে এরকম ভয়াবহ দুর্যোগ একই সময়ে ঘটেছিল একথা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয় বলেই পণ্ডিতরা মনে করেন। এমন ভয়াবহ দুর্যোগ একই সঙ্গে সারা পৃথিবীর বুকে ঘটেছিল তখন, যখন পৃথিবী আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। ভূবিজ্ঞানীদের মতে সেইকালে পৃথিবী জুড়ে অবিশ্বাস্য রকমের ভয়াবহ ঘটনা সব ঘটত, ভূমিকম্প, বজ্রনির্ঘোষ, বারি বর্ষণ, অগ্ন্যুৎপাৎ ইত্যাদি। কিন্তু তখন তো পৃথিবীর বুকে জীবনের কোন চিহ্নই ছিল না। সুতরাং সেই আদিকালের ঘটনা নিশ্চয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পুরাণ, ধর্মগ্রন্থ, লোকগাথার মধ্যে থাকার কথা নয়। তাহলে নিশ্চয় মানুষের ঐতিহাসিক কালে এমন কোন ভয়ানক দুর্যোগ ঘটেছিল যা সারা পৃথিবী জুড়ে একই সঙ্গে না ঘটলেও তার impact ছিল সাংঘাতিক। যার স্মৃতি মানুষ হাজার চেষ্টা করেও ভুলতে পারেনি। তাই সেই দুঃস্বপ্নের বোঝা তাকে যুগ যুগ ধরে বয়ে বেড়াতে হয়েছে।

সেই ভয়াবহ দুর্যোগ আমাদের মতে লেমুরিয়া ধ্বংসের কাহিনী। সমুদ্র গ্রাস করছে লেমুরিয়া। সভ্যতা ধ্বংস হচ্ছে। দলে দলে মরছে ভিনগ্রহবাসী মানুষ বা দেব-গন্ধর্বরা। বাসস্থান ছেড়ে আবার অনির্দেশের পথে যাত্রা। জাহাজে, নৌকায় বিমানে করে যারা বেরিয়ে পড়ল নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে তারা তো মুষ্টিমেয়।
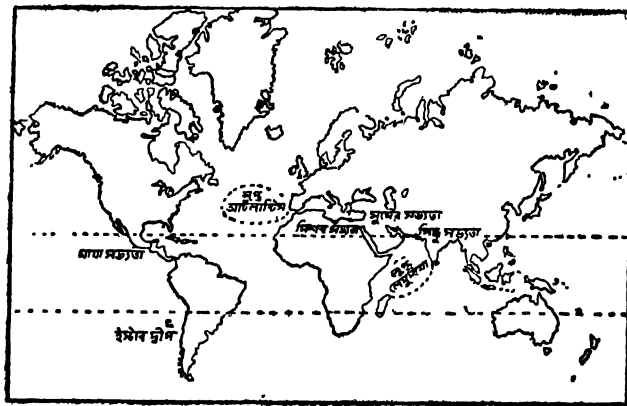
পৃথিবীর প্রাচীন রহস্যময় সভ্যতাগুলির ভৌগোলিক অবস্থান—লেমুরিয়া থেকে ছড়িয়ে পড়ে দেব-গন্ধর্বরা এইসব রহস্যময় সভ্যতাগুলি গড়ে তুলেছিলেন

হতাশা, অনিশ্চয়তা ও স্বজন পরিজনের ধ্বংসের কথা তারা কিছুতেই ভুলতে পারল না। এই ভয়াবহ ধ্বংসের কথা তথা জলপ্লাবনের কথা জেগে রইল মানুষের স্মৃতিতে। পরবর্তীকালে লিখিত ও অলিখিতভাবে যা স্থান পেল বিভিন্ন দেশের পুরাণ, ধর্মগ্রন্থ, কাব্য ও লোক গাথায়। এই ঘটনা ঘটেছিল ৬000 বৎসরের কিছু আগে ও পরে।

মনে রাখা দরকার যে শুধুমাত্র জলপ্লাবনের কাহিনীই নয় এর সঙ্গে জড়িয়ে

রয়েছে নতুন সৃষ্টির কাহিনীও। 'জলপ্লাবনের ফলে সংসারে পূর্বসৃষ্ট সকল পদার্থই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং নতুন সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল।' (পুরাণ-পরিচয়)

সুমের সভ্যতার এই জলপ্লাবনের কাহিনীটি আছে গিলগামেস কাব্যে। আমার প্রথম গ্রন্থে সে কাহিনী দেওয়া হয়েছে তাই এখানে তার উল্লেখ করা হল না। এই মহাকাব্যটি প্রায় ৪৫০০ বৎসরের পুরাতন ; কিন্তু জলপ্লাবনের কাহিনীটির বয়স আরো বহু প্রাচীন বলেই পণ্ডিতদের অনুমান।

খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীর গ্রীক কবি Hesiod স্বর্গ ও মর্ত নিয়ে লিখেছেন কাব্য। তিনি লিখেছেন সাপের মত একটি জীব আকাশ পথে অগ্নি উদ্গীরণ করতে করতে পৃথিবী ধ্বংস করে ফেলল। এই ভয়ঙ্কর জীবটি মানুষ ও দেবতাদের থেকেও শক্তিশালী ছিল।

স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার প্রাচীন গাথা 'Poetic Edda' থেকে আমরা এইরকম ভয়াবহ দুর্যোগের কথা জানতে পারি :

Mountains dash together,
Heroes go the way to Hell,
and heaven is rent in twain…
The Sun grows dark
The earth sinks into the sea,
The bright stars from heaven vanish ;
Fires rages,
Heat blazes,
And high flames play,
'Gainst heaven itself.'

পশ্চিম ব্রাজিলের আদিম মানুষদের উপকথা সেইসময়ের কথা বলে যখন, 'বিদ্যুতের চমক ও বজ্রের নির্ঘোষে সবাই ভীত হয়ে পড়েছিল। তখন স্বর্গ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল এবং তারই টুকরো টুকরো অংশ এসে পড়েছিল পৃথিবীর বুকে এবং সবাই নিহত হয়েছিল সবাই-সবকিছু। স্বর্গ ও মর্ত স্থান পরিবর্তন করেছিল। প্রাণ বলে কিছুর অস্তিত্ব ছিল না পৃথিবীতে।'

উত্তর আমেরিকার ওকলাহোমার চোকটাউ ভারতীয়দের উপকথা একটা সময়ের কথা বলে যখন, 'পৃথিবী বহুদিন অন্ধকারাবৃত হয়েছিল। উত্তর দিকে একটি উজ্জ্বল আলোর উদয় হয়েছিল কিন্তু আসলে তা ছিল পর্বত প্রমাণ ঢেউ, যা দ্রুত এগিয়ে আসছিল।'

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের আদিম অধিবাসীদের উপকথা বলে, 'তখন গন্ধ উত্থিত

হল…সেই গন্ধ পরিণত হল ধোঁয়ায়, সেই ধোঁয়া পরিণত হল মেঘে। সমুদ্র উত্থিত হল এবং সেই মহাদুর্যোগে সব জমি ডুবে গেল সমুদ্রের তলায়। নতুন পৃথিবীর জন্ম হল প্রাচীন পৃথিবীর গর্ভ থেকে।'

বাইবেলের নোয়ার কাহিনী সবারই জানা, তাই নতুন করে উল্লেখ করা হল না। এই প্রসঙ্গে বাইবেলে আছে…'Then the earth Shook and trembled ; the foundations also of the hills moved and were shaken…The Lord also thundered in the heavens, and the Highest gave his voice ; hail stones and coals of fire…Then the channels of waters were seen, and the foundations of the world were discovered…'

মিশরের প্রাচীন পুঁথি, ভারতের পুরাণ, চীনা প্রাচীন সাহিত্য, গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সাহিত্য, মায়া ও এ্যাজটেকদের উপকথা, বাইবেল, কোরাণ, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড, ইরান, ব্যাবিলন বা সুমের এর পুরাণ ও উপকথা এই একই কাহিনীর কথা বলে। নিউজিল্যাণ্ডের মাওরিদের উপকথা যেমন এ কাহিনীই বর্ণনা করে তেমনি সুদূর ব্রিটেনের কেল্ট সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই একই কাহিনী প্রচলিত। কেন এমনটি হল—তার উত্তর আমরা আগেই দিয়েছি।

সুমেরিয়ান মৎস্য অবতার!

আমাদের বৈবস্বত মনু ও মৎস্য অবতারের কাহিনীর সঙ্গে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা সুমের সভ্যতার দেবতা ওয়ানেস (Oannes) এর অদ্ভুত মিল দেখতে পাওয়া যায়।

সুমের সভ্যতা সৃষ্টিকারীদের পূর্ব ইতিহাস অজানা। কোথা থেকে তারা সুমের দেশে এসেছিলেন, কিভাবে এই বিস্ময়কর সভ্যতা গড়ে উঠল সে সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্যই আমরা আজো জানিনা। প্রাচীন গুহা মানব থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে এরা সুসভ্য জাতিতে পরিণত হয়েছিলেন এমন কোন জোরালো প্রমাণ বিজ্ঞানীরা এখনও আবিষ্কার করতে পারেন নি। তাহলে এরাও কি অন্য কোন ভূখণ্ড থেকে সুমের বা ব্যাবিলনে এসেছিলেন?

আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের সমসাময়িক কালে একজন ঐতিহাসিক পুরোহিত ছিলেন। নাম তাঁর বেরোসাস্ (Berossus)। তিনি গ্রীক ভাষায় মেসোপটেমিয়ার একখানি ইতিহাস লিখেছিলেন। বেরোসাস্এর বহুকাল পূর্বেই অবশ্য সুমের সভ্যতা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ব্যাবিলনের প্রাচীন ইতিহাস ঐশ্বর্যপূর্ণ ছিল একথা প্রমাণ করবার জন্যই যেন বেরোসাস্ কলম ধরেছিলেন। এই ইতিহাস রচনার মালমশলা জোগাড় করেছিলেন তিনি প্রচলিত কাহিনী, গল্পকথা ইত্যাদি থেকে।

বেরোসাসের রচিত ইতিহাস অবশ্য আমাদের হাতে এসে পৌঁছোয়নি। তাঁর পরবর্তীকালের প্রাচীন লেখকদের রচনায় বেরোসাস্ এর ইতিহাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ইতিহাসের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে দেবতা ওয়ানেসের কাহিনী। ওয়ানেস বা ইয়া-হান নামে এক সর্বশাস্ত্রবিদ দেবতা নাকি পারস্য উপসাগর থেকে উঠে আসেন এবং তিনিই অসভ্য ব্যাবিলনবাসীদের লেখা-পড়া, কলা-বিজ্ঞান, আইন-কানুন, কৃষিবিদ্যা, ধর্ম ইত্যাদি সব শেখান। এই দেবতার চেহারা ছিল অদ্ভুত ধরনের। তার সারা দেহ ছিল মাছের মত। কিন্তু মাথা ও হাত-পা ছিল মানুষের মত। অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক মৎস্য এই হচ্ছেন দেবতা ওয়ানেস। মনু ও মৎস্য অবতার মিলে মিশে সৃষ্টি হয় নি তো দেবতা ওয়ানেসের? তবে সর্বশাস্ত্রবিদ দেবতা ওয়ানেস যে লেমুরিয়া থেকে মেসোপটেমিয়ায় গিয়ে উঠেছিলেন এবং সুমের সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন তাতে সন্দেহ করার কোন কারন আছে বলে আমরা মনে করি না।

আমরা আগেই বলেছি যে লেমুরিয়া ডুবতে শুরু করলে দেবতা ও দেবজনেরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন এবং পরবতাকালে বিস্ময়কর সব সভ্যতা গড়ে তোলেন। এরই প্রমাণ মেলে বৈবস্বত মনু ও দেবতা ওয়ানেসের গল্পে। আরো প্রমাণ মেলে যখন আমরা লক্ষ করি সুমের সভ্যতা ও সিন্ধু সভ্যতার মধ্যে অনেক মিল। সুমের ও সিন্ধু সভ্যতার ভাষার সঙ্গে যে দ্রাবিড় ভাষার যথেষ্ট মিল তা পণ্ডিতরাই বলে থাকেন। সিন্ধু সভ্যতার লিপির সঙ্গে ইস্টারদ্বীপের লিপির অদ্ভুত মিল রয়েছে তাও প্রমাণ দিয়েছি আমার প্রথম গ্রন্থে। সিন্ধু-সভ্যতা যে গন্ধর্ব সভ্যতা এবং এদের পূর্ব-পুরুষরা যে লেমুরিয়া থেকে এসেছিলেন রামায়ণের উদ্ধৃতি দিয়ে সেকথাও আলোচনা করেছি আমার প্রথম গ্রন্থে। পণ্ডিতরা বলেন আধুনিক মালাগাসি দ্বীপ হচ্ছে লেমুরিয়ারই অংশ। ইস্টারদ্বীপের ভাষার সঙ্গে এই মালাগাসির ভাষার যে আবার অদ্ভুত আত্মীয়তা। অথচ মালাগাসির ভাষার সঙ্গে তার নিকটবর্তী মহাদেশ আফ্রিকার ভাষার মিল হওয়াই তো স্বাভাবিক ছিল। তা না হয়ে পৃথিবীর অপর প্রান্তের একটা ছোট্ট দ্বীপ যেখানে এক বিস্ময়কর জাতি বাস করত বলে পণ্ডিতরা মনে করেন, তার ভাষার সঙ্গে মালাগাসির ভাষার আত্মীয়তা ঘটল কেন? Alexander Kondratov ও তাই প্রশ্ন তুলেছেন, 'And why does Malagasy, the language of the Present day in habitants of Madagascar, have more kinship with the language of inhabitants of Easter Island than with the language of the African Continent?'

মালাগাসির ভাষার সঙ্গে ইস্টার-দ্বীপের ভাষা, মোহেঞ্জোদড়োর লিপির সঙ্গে ইস্টার-দ্বীপের লিপির এত ঘনিষ্ঠ মিল কি একেবারেই কাকতালীয়?

যাহোক আমরা আবার দেবতা ওয়ানেস এর কথায় ফিরে আসি। দেবতা ওয়ানেস নাকি ব্যাবিলনবাসীদের একখানি জ্ঞানগর্ভ পুঁথি উপহার দিয়েছিলেন। এই পুঁথিতে নাকি নানা ধরণের গুপ্তবিদ্যার কথা লেখা ছিল। বহু পণ্ডিতের ধারণা ইহুদীদের 'কাব্বালা' পুঁথির জন্ম হয়েছে নাকি দেবতা ওয়ানেস এর দেওয়া পুঁথি থেকে। দানিকেন তাঁর 'নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন' গ্রন্থে এই 'কাব্বালা' পুঁথি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। পাঠকরা অনেকেই সম্ভবতঃ সে আলোচনার সঙ্গে পরিচিত তবু আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে এখানে সামান্য কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

'পারীর সরবোন পাঠাগারে বসে সাতখণ্ড কাব্বালায় ডুব দিলুম। কাব্বালা ইহুদী রাবিদের গুহ্যশাস্ত্র। কি পেলুম তা থেকে বলবার আগে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন পুঁথির ভেতর কাব্বালাতেই মেলে সবচেয়ে বেশি, সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর গূঢ় তথ্যের সন্ধান। কাব্বালা লেখা শুরু হয়েছিল সম্ভবতঃ ১২০০ খৃষ্টাব্দ নাগাত। শোনা যায়, তালমুদের বাস্তববাদ এবং জড়বাদের প্রতিক্রিয়ার ফলেই কাব্বালার ব্রহ্মবিদ্যা, অধিবিদ্যা এবং ইন্দ্রজালের জন্ম। ওল্ড টেস্টামেন্টের গূঢ়, গোপন অর্থের ব্যাখ্যা আর ইহুদী অনুশাসন সম্পর্কে টীকা আছে এই কাব্বালায়। কাব্বালীশাস্ত্রীরা বলেন, ঈশ্বরের আদেশেই লেখা হয়েছিল এ পুঁথি। এতে আছে নানা অজ্ঞাত গুহ্য চিহ্ন, কত প্রতীক, আর অঙ্কের সূত্র, আর আছে নানা দেবতার অতীন্দ্রিয় শক্তির সঙ্গে কত গূঢ় তথ্যের সংযোগের কথা। কাব্বালার গুপ্তমন্ত্রে যাঁরা সিদ্ধ, সে সন্ন্যাসীরা নাকি অলৌকিক সব কাণ্ড করতে সমর্থ।'

আমাদের যোগ ও তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষরাও অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে সিদ্ধহস্ত। তাহলে কাব্বালা কি কোন আদি পুঁথি থেকে সৃষ্টি হয়েছিল? সুমেরিয়ান মৎস্য অবতার দেবতা ওয়ানেসের পুঁথি কাব্বালার উৎস একথা বহু পণ্ডিত মনে করেন। 'The once and Future Star' গ্রন্থের লেখক George Michanowksy লিখেছেন, 'From time to time, various scholars have suggested that the Oannes myth, especially the solemn handing over to man of a sacred book of wisdom, could very well have been the origin of gnostic tendencies that have asserted themselves in the western religions, with great emphasis on occult teachings, hermetic Sciences, or emanation doctrines such as Cabala.'

তাই যদি হয় তাহলে দেবতা ওয়ানেসের মূল পুঁথির উৎস কোথায়? আমাদের মতে এ পুঁথির আদি উৎস হচ্ছে ভিনগ্রহে, আমাদের বেদের মত। এই পুঁথি এসেছিল ভিনগ্রহ থেকে লেমুরিয়াতে। তারপর লেমুরিয়া থেকে দেবতা ওয়ানেসের মারফৎ পৌঁছেছিল সুমের বা মেসোপটেমিয়ায়।

আগেই বলেছি যে বাইবেলের নোয়ার কাহিনী এসেছে সুমেরীয় জলপ্লাবনের কাহিনী থেকে। বাইবেলের জলপ্লাবনের সময় ধরা হয় ৩৩০৮ খ্রীঃ পূঃ বা ৫২৮৮ বৎসর পূর্বে। আমাদের জলপ্লাবনের কাহিনীর নায়ক মনু বৈবস্বতের সময় কাল হল ৩৮১৪ খ্রীঃপূঃ বা ৫৭৯৪ বৎসর পূর্বে। মায়াদের পঞ্জিকা শুরু হচ্ছে ৫০৯৩ বৎসর পূর্বে।

মনু কাহিনীতে আমরা সপ্তঋষির উল্লেখ দেখতে পেয়েছি। সুমেরীয় পুরা কথাতেও আছে সপ্তর্ষির উল্লেখ। এই সপ্ত ঋষিরা সুমের দেশে এসেছিলেন দক্ষিণ সমুদ্র থেকে। এই দক্ষিণ সমুদ্র কি লেমুরিয়ার ইঙ্গিত করে না? George Michanowksy তাঁর 'The once and Future Star' গ্রন্থে বলেছেন, 'Legend also told of seven sages who had come from the southern sea. Their sumerian name was AB-GAL, meaning 'master of knowledge." এ সবই কি কাকতালীয় ঘটনা? নাকি এ সবের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক পরম সত্য?

কাব্বালা পুঁথির আদি উৎস ভিন্নগ্রহে এ কথা বলার কি কোন যুক্তি আছে? এই কাব্বালা পুঁথিতে আছে সাতটি অন্য পৃথিবীর কথা, সেখানকার মানুষজনের কথা। এই সাতটি অন্য পৃথিবীর নাম হচ্ছে গেহ, নেসজিয়া, ৎসিয়া, থীবেল, ঈরেজ, আদমা ও আর্কা। কাব্বালার প্রধান পুঁথি 'জোহার', আরামীয়, অর্থাৎ প্রাচীন সীরিয়ার ভাষায় লেখা। দানিকেন লিখেছেন, 'জোহারে একটা ভারি অদ্ভুত জিনিস আছে। সেটা হল, 'আর্কা' থেকে আসা একজন বিপন্ন 'মানুষের' সঙ্গে এক পৃথিবীবাসীর কথা। আলাপচারী থেকে জানা যায়, পৃথিবী আগুনে ধ্বংস হয়ে যাবার পর যারা বেঁচে গিয়েছিল, তাদেরই কয়েকজন রাবি য়োসে-এর সঙ্গে যেতে যেতে হঠাৎ একজন ভিনদেশীকে দেখতে পেলো। লোকটার মুখের চেহারা অন্যরকম, বেরিয়ে আসছে পাহাড়ের একটা ফাটল থেকে গুঁড়ি মেরে। রাবি য়োসে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোথাকার লোক আপনি?

বিদেশী বলল, আমি আর্কার অধিবাসী।

রাবি য়োসে অবাক। বললেন, আপনি বলতে চান, আর্কায় মানুষ আছে?

আছে। আপনাদের আসতে দেখে গুহা থেকে বেরিয়ে এলুম। এ জগতের নাম কি?

তারপর বিদেশী বললেন, তাদের জগতের ঋতু পৃথিবীর ঋতুর মত নয়। তাদের পৃথিবীতে একবার চাষ-আবাদ করার অনেক বছর পরে আবার চাষ-আবাদ শুরু করা যায়। আকাশের তারকামণ্ডলগুলোকেও তাদের জগৎ থেকে ভিন্ন রকম দেখায়।'

অ্যানড্রু টমাস তাঁর 'আমরাই কি প্রথম?' গ্রন্থে লিখেছেন, 'মধ্য এশিয়ার

টাঙ্গাটতো জাতির নগর হারা-হোতা খুঁড়ে বার করা হয়েছে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে। তাদের একটা অদ্ভুত ধারণা ছিল এগারটা উজ্জ্বল নৈসর্গিক বস্তু সূর্য, চাঁদ, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি এবং ৎসি-ৎসি, ওউএবো, রাহু, কেতু সম্বন্ধে। রাহু এবং কেতু নামগুলি ধার করা হয়েছে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা থেকে কিন্তু ৎসি-ৎসি এবং ওউএবো রহস্যময়ই হয়ে আছে।'

কাব্বালা পুঁথিতে যে সাতটি অন্য পৃথিবীর কথা আছে তার একটির নাম ৎসিয়া। ৎসি-ৎসি-র সঙ্গে এই ৎসিয়া গ্রহের কোন মিল খুঁজতে যাওয়া হয়তো অত্যন্ত কষ্টকল্পিত ব্যাপার হবে। তবু কোথায় যেন একটা সন্দেহ থেকেই যায়।

দানিকেন উল্লিখিত 'ধ্যান' পুঁথিতেও যেন প্রচ্ছন্ন ভাবে রয়েছে সপ্তগ্রহের কথা। এই ধ্যান পুঁথিতে যে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে কোথায় যেন বেদের সৃষ্টিতত্ত্বের একটা অদৃশ্য মিল রয়েছে। কৌতূহলী পাঠকদের জন্য দানিকেনের 'নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন' গ্রন্থ থেকে তুলে দিচ্ছি: 'তারপর আছে পবিত্র প্রতীক চিহ্নযুক্ত 'ধ্যান' পুঁথি'। এ পৃথিবীর কেউ জানে না, কত তার ঠিক বয়স। শোনা যায়, আসল পুঁথিটার বয়স নাকি আমাদের পৃথিবীর বয়সের চেয়েও বেশি। আরো শোনা যায়, সেটা এমন প্রচণ্ডভাবে চুম্বকিত করা ছিল যে 'নির্বাচিত' পুরোহিতেরা যেই তা হাতে তুলে নিল, অমনি তাদের চোখের সামনে খেলে যেতে লাগলো ছায়াছবির মতন, পুঁথিতে লিখিত যত বিবরণ। আর, ভাষাজ্ঞান যার উন্নত, সে পুঁথির রহস্যময় ভাষাও তার অধিগত হয়ে গেল, চুম্বক-স্পন্দনের তালে তালে। হাজার হাজার বছর ধরে সে রহস্যময় পুঁথি রক্ষিত হয়েছে তিব্বতের মাটির নিচে, গুহার অন্ধকারে একান্ত গোপনে। বলা হত, 'গোলা' লোকেব হাতে পডলে, পুঁথির সে-জ্ঞান প্রচণ্ডরকম মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে, তাই এ গোপনীয়তা। আসল পুঁথিটি আজো কোথাও আছে কিনা জানি না, তবে তার আক্ষরিক নকল হয়েছে বংশ বংশ ধরে। তাছাডা, 'নির্বাচিত' পুরোহিতকুলের হাতে তাতে যুক্ত হয়েছে নতুন জ্ঞান, নবতর টীকা। 'ধ্যান' পুঁথির জন্ম নাকি হিমালয়ের পারে। জানি না, কোন অজানা পথে সে পুঁথির বাণী পৌঁছেছে ভারতে, চীনে, জাপানে। সে বাণীর ছিটে-ফোঁটা দক্ষিণ আমেরিকার কিম্বদন্তীতেও মেলে। গূঢ় সম্প্রদায়ের যারা পশ্চিম চীনের কুন-লুন পাহাড়ের নির্জন গিরিবর্ত্মে, না হয় একালের লাল-চীনের পশ্চিমে আলটীনটাগের গভীর খাদে লুকিয়ে থাকতো, বিরাট আকারের সব পুঁথিগুলোকে লুকিয়ে রাখতো তারাই। ভাঙা, পোড়ো মন্দিরে তারা থাকতো, আর সেইসব সাহিত্যরত্ন তারা লুকিয়ে রাখতো, মাটির নিচে গর্ভগৃহে, না হয়, গুহার গোপন অন্ধকারে। 'ধ্যান' পুঁথির রক্ষণাবেক্ষণ হত এমনিভাবেই। সেইসব পুঁথির গূঢ় তত্ত্বের কথা যাদের জানা ছিল, প্রথম যুগের খৃস্টান যাজকপুঙ্গবেরা তাদের মন থেকে

সেসব তত্ত্ব, সেসব বিশ্বাস নিঃশেষে নিকিয়ে নিতে চেষ্টার কসুর করেননি। তা সত্ত্বেও সে-পুঁথির বাণী চলে এসেছে মুখে মুখে বংশ বংশ ধরে। 'ধ্যান' পুঁথির কথা দেশে বিদেশে অনেক শুনেছি, কিন্তু এমন একজনকেও পাইনি, যিনি সে-পুঁথির একটা খাঁটি নকলও চোখে দেখেছেন। 'ধ্যানের' যে সব অংশ রক্ষিত হয়েছে, বরং বলা ভালো, জানা গেছে, তাদের সংস্কৃত অনুবাদ হাজার হাজার গ্রন্থ মারফত ছড়িয়ে গেছে সারা পৃথিবীময়। সেসব গূঢ় তত্ত্বের অন্তরে নিহিত রয়েছে আদি কথা, তথা সৃষ্টিতত্ত্বের আদিমতম বাণী আর লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বয়ে আসা মানুষের ক্রমবিকাশের কথা।'

'ধ্যান' পুঁথির আংশিক অনুবাদ দেওয়া আছে দানিকেনের গ্রন্থে; কৌতূহলী পাঠক তা দেখে নিতে পারেন।

এই 'ধ্যান' পুঁথি, বেদ, ওয়ানেসের পুঁথি বা কাব্বালা নিয়ে গভীর গবেষণা হলে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে এসব পুঁথির আদিম উৎস একই—এবং সেই উৎসমুখ এ পৃথিবী নয় তা ভিনগ্রহ।

যাহোক, আমাদের পূর্বকথায় ফিরে আসি। লেমুরিয়া সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হতে শুরু করলে দেবতারা তাদের প্রথম উপনিবেশ ছেড়ে ছড়িয়ে পড়েন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। এ ঘটনা ঘটেছিল ৬০০০ বৎসর পূর্বে। এই মাইগ্রেশানের কাহিনীর খোঁজ পাই আমরা বৈবস্বত মনুর কাহিনীতে, দেবতা ওয়ানেসের কাহিনীতে। এ কাহিনী পাওয়া যায় অন্যান্য আরো বহু দেশের পুরা কাহিনীর মধ্যে। অ্যানড্রু টমাস এর 'আমরাই কি প্রথম?' গ্রন্থ থেকে সেসব কাহিনী কিছু কিছু উল্লেখ করছি।

'সুদূর অতীতে অতিমাণবিক কোন জীব নীলনদের দেশে এসেছিলেন। তিনিই মিশরবাসীদের সভ্য করে তুলেছিলেন শব্দ এবং ধারণা লিপিবদ্ধ করার সংকেত শিখিয়ে, বাজাবার জন্য বীণাযন্ত্র তৈরীর কৌশল শিখিয়ে, নক্ষত্রের তালিকা, গোনবার সংখ্যা, গাছগাছড়ার নাম এবং রোগ নিরাময়ের ওষুধ দিয়ে।'

'পুরাকালে গ্রীসেও ঐতিহ্যবাহী একজন মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিলো। তিনি ছিলেন বিস্ময়কর এক সঙ্গীতশিল্পী। এত গভীর ছিলো তাঁর জ্ঞান যে তিনি যে কোন প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন। তিনি অদ্ভুত এবং দুর্বোধ্য সব জিনিসের কথা বলতেন, যেমন—নক্ষত্রের বুকে জীবনের অস্তিত্বের কথা।'

'সপক্ষ সরীসৃপ (Feathered Serpent) বা কোয়েজালকোটল্ আকাশের একটা ফুটো দিয়ে নেমে এসেছিলেন মেক্সিকোতে। আর একটি বর্ণনায় আছে একটা ডানাওয়ালা উড্ডীনযন্ত্রের বিবরণ, যে যন্ত্রে চড়ে তিনি এসেছিলেন। কোয়েজালকোটল্ মধ্য আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের কৃষিবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, স্থাপত্য

শিল্প সম্বন্ধে মূল্যবান সব নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং দিয়েছিলেন নীতিসংহিতা (code of ethics)।'

আমাদের মনু বৈবস্বতও লিখেছিলেন নীতিসংহিতা যার নাম হচ্ছে মনু-সংহিতা।

ঘটনাগুলিকে অনেকেই হয়তো কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দিতে চাইবেন। কিন্তু প্রাচীন কাহিনী বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এইসব ঘটনার মধ্যে একটা গভীর যোগসূত্র রয়েছে। সে যোগসূত্র হচ্ছে যে ভিনগ্রহী দেব-গন্ধর্বরা প্রথমে লেমুরিয়াতে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে লেমুরিয়া সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হতে শুরু করলে তারা ছড়িয়ে পড়েন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এবং সৃষ্টি করেন নতুন নতুন সভ্যতা। পৃথিবীর অনুন্নত আদিম মানুষদের তারা সভ্য করে তোলেন। এবং সেইসব মানুষদের অংশীদার করে নেন এইসব সভ্যতার। তারা তাদের উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে খুব দ্রুত অদ্ভুত উন্নত সব সভ্যতা সৃষ্টি করেন। আর সেই কারণে সেই সব সভ্যতা আমরা সঠিক বুঝে উঠতে না পেরে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ছি। বিবর্তনবাদীদের দেওয়া পার্থিব মানব-সভ্যতার ধারার সঙ্গে এইসব সভ্যতাগুলিকে কোনমতে খাপ খাওয়াতে পারছি না।

দিলমুন—পার্থিব স্বর্গ?

উবায়েদদের দেবতা এন-কি কে মেসোপোটেমিয়াবাসীরা বলত ইয়া। ইয়া হচ্ছেন আমাদের বরুণদেবতা—তিনি সমুদ্রের অধিপতি। এই বরুণদেবতা প্রথম সভ্যতা স্থাপন করেন ইরিদুতে। ইরিদু হচ্ছে মেসোপোটেমিয়ার সর্বদক্ষিণ দেশ। এই দেবতা এন-কি নাকি বাস করতেন দিলমুন এ। এই দিলমুনে রোগ ও মৃত্যু ছিল না। ঝর্ণা থেকে সুস্বাদু মিষ্টি জল পাওয়া যেত। এখানে মানুষের জীবন ছিল সুখী। সুমেরুদের স্বর্গ ছিল এই দিলমুন। এ যেন বাইবেলের স্বর্গরাজ্যের বর্ণনা। তাই স্বভাবতই মনে হয় দিলমুন হচ্ছে পুরাকথার কল্পলোক। তার কোন অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। কারণ মেসোপোটেমিয়ার প্রাচীন বানিজ্যিক নথিপত্রে 'দিলমুনের জাহাজ' কথাটার উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে আসীরিয়দের সূত্র থেকে জানা যায় যে দিলমুনের রাজা উপেরী (uperi) আসীরিয় রাজা সারগণ-দুইকে ভেট দিয়েছিলেন। অন্য আর একজন আসীরিয় রাজা দিলমুন থেকে যথেষ্ট ধনরত্ন লুঠ করে নিয়ে এসেছিলেন। এইসব লুণ্ঠিতদ্রব্যের মধ্যে ছিল তামা, ব্রোঞ্জ, দামী কাঠ। দিলমুনের সৈন্যরা আসীরিয়ার স্বেচ্ছাচারী রাজা সেন্নাচেরিব (Sennacherib) কে সাহায্য করেছিল শহরের মাতা ব্যাবিলনকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে। অর্থাৎ ইয়ার আদিবাসভূমি এই দিলমুন কল্পিতস্বর্গ নয় বরং তার বাস্তব অস্তিত্ব ছিল বলেই আমাদের বিশ্বাস করতে হয়।

কিন্তু কোথায় ছিল সেই দিলমুন? দিলমুনকে বলা হত 'যেদেশ থেকে সূর্য উদিত হন।' অর্থাৎ টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস উপত্যকার পূর্বদিকে ছিল দিলমুন। যখন প্রত্নতত্ত্ববিদরা পারস্য উপসাগরের বাহেরিন দ্বীপে একটি প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করলেন, যে সভ্যতা মেসোপোটেমিয়া ও ভারতের সিন্ধু-সভ্যতার মধ্যবর্তী যোগসূত্র,—তখন তাঁরা মনে করলেন যে তাঁরা সেই রহস্যময় ভূখণ্ড দিলমুন আবিষ্কার করেছেন। কিছুদিন আগে Kramer বলেছেন যে বাহেরিন দিলমুন হতে পারে না। কারণ বাহেরিনে কোন হাতি নেই। কিন্তু গজদন্ত ছিল দিলমুনের প্রধান রপ্তানীদ্রব্য। তাছাড়া কোন সমুদ্র দেবতার আবাসস্থল খুঁজে পাওয়া যায় নি বাহেরিনে। Kramer মনে করেন যখন মেসোপটেমিয়াবাসীরা দিলমুনের কথা বলে তখন তাদের মনের মধ্যে থাকে ভারত ও সিন্ধুসভ্যতার কথা।

ভবিষ্যতের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা হয়তো একদিন আমাদের সন্ধান দেবে দিলমুনের। Kondratov মনে করেন হয়তো দিলমুনকে স্থাপিত করতে হবে আরো সুদূর দক্ষিণে ভারতমহাসাগরে ও টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস উপত্যকার পূর্বে। যতদিন পর্যন্ত ভারত-মহাসাগরের গভীরে অনুসন্ধান চালানো না হবে ততদিন পর্যন্ত একথার সঠিক জবাব দেওয়া যাবে বলে মনে হয় না। সিন্ধুসভ্যতার ভাষার যতদিন পাঠোদ্ধার না হবে ততদিনও একথার জবাব দেওয়া যাবে না। Kramer মনে করনে যে দিলমুন কথাটি উবায়েদ তথা দ্রাবিড়।

রহস্যময় মিশর সভ্যতা

মিশর সভ্যতার আদিকথা আজো রহস্যাবৃত। কি করে হঠাৎ ৬০০০ বছর আগে আদিম জীবন থেকে সৃষ্টি হল এক বিস্ময়কর সভ্যতার সেকথা আজো জানা যায় নি।

সাহারা মরুভূমিতে যেসব প্রত্নবস্তুর খোঁজ পাওয়া গেছে তা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়েছে যে অতি পুরাকালে সভ্যতার কেন্দ্র মিশর ছিল না। ৬০০০ বছর আগে মিশরে চলছিল প্রস্তর-যুগ। এই সময়ের মিশরের পাথুরে চিত্রাবলীর সঙ্গে সাহারার টাসিলিতে পাওয়া চিত্রগুলির তুলনা করলে দেখা যায় যে মিশরের চিত্রগুলি ছিল আদিম ও স্থানীয় প্রভাবযুক্ত। পরবর্তীকালে উর্বর সাহারা অঞ্চল হঠাৎ পরিবর্তিত হল মরুভূমিতে আর নীলনদের উপত্যকা যেন হঠাৎই ঝলমল করে উঠল সভ্যতার আলোকে। একলাফে মিশর প্রস্তর যুগ থেকে এসে পৌঁছুলো লিপি-ভাষা, রাজতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র ও নগর সভ্যতার যুগে। কিভাবে এঘটনা ঘটল? কারাই বা সৃষ্টি করল এ সভ্যতা? তারা কি স্থানীয় বাসিন্দা, নাকি কোন নবীন আগন্তক? বিজ্ঞানীরা অবশ্য বলেন যে স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রস্তর-যুগ থেকে একলাফে একেবারে ঐতিহাসিক যুগে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু এ কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা যুক্তির

ফাঁক থেকে যায়। অনেকেই এই দুই যুগের মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা খুঁজে পান না।

সভ্যতার বড় অবদান লিখিত ভাষা। প্রস্তরযুগের মানুষের কাছে লিপির খুব একটা প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু রাজতন্ত্র গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লিখিত ভাষার একান্ত প্রয়োজন হয়। রাজকার্য বা ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য প্রয়োজন হয় লিখিত ভাষার। মিশরীয় চিত্রলেখ লিপির পূর্ব ইতিহাস কিন্তু অজানা। নীল উপত্যকায় প্রত্নতত্ত্ববিদরা যেসব পাথুরে-চিত্র আবিষ্কার করেছেন তা থেকে জানা যায় যে প্রাচীন মিশরবাসীরা নক্সা আঁকতে পারত। কিন্তু কিভাবে সেই নক্সা চিত্রলেখ লিপি হয়ে উঠল তা জানা যায় না।

মিশরের প্রাচীন শহরগুলিতে বহু স্লেট পাওয়া গেছে যাতে চিত্র ও নক্সা দুইই আছে। তবু এগুলি চিত্রলিপিই। তবে পরবর্তীকালে আমরা পূর্ণ লিপি দেখতে পাই। এই লিপি এতই উন্নত যে মিশরীয়রা এই লিপির বিশেষ কোন পরিবর্তন না ঘটিয়েই ৩০০০ বছর ধরে সেই একই লিপি ব্যবহার করে এসেছে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাজবংশের পিরামিডের দেওয়ালে চিত্রিত লেখাই হচ্ছে মিশরের প্রাচীন সাহিত্য। এগুলো প্রায় ৫০০০ বছরের পুরানো। বিখ্যাত রুশ মিশরতত্ত্ববিদ Academician Turayev এর ভাষায় এগুলি হচ্ছে 'probably man's earliest religious literature' ও 'among the most important monuments of the human race.'

এই লিপির মধ্যে আমরা এমন কিছু লক্ষ করি না যাতে মনে হয় যে এই লিপি ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়ে আদিম রূপ থেকে উন্নত রূপ পেয়েছে। এই লিপি এত উন্নত ছিল যে যথেষ্ট উন্নত ভাষা প্রকাশ করার ক্ষমতা এর ছিল। জটিল ধর্মীয় ও দার্শনিক ভাবধারা প্রকাশ করেছে এই লিপি খুব সহজভাবে।

ইতিহাসে দেখা যায় যে বহু দেশ অন্য দেশের উন্নত লিপি নিজেদের মত করে নিয়ে ব্যবহার করে। যেমন নিকট প্রাচ্যের বহুদেশ মেসোপটেমিয়ার কিউনিফর্ম লিপি ব্যবহার করে থাকে। গ্রীক অক্ষর ব্যবহৃত হয় কপ্টিক, স্লাভিক ও Etruscan alphabets এ; জাপানীরা ব্যবহার করে চীনা চিত্রলেখ। তাহলে মিশরবাসীরা কি অন্য কোন দেশ থেকে ধার করেছিল তাদের লিপি? ক্রীটদ্বীপের লিপির সঙ্গে মিশরীয় লিপির কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে; কিন্তু ক্রীট সভ্যতা মিশর সভ্যতার পরে বিস্তারলাভ করেছিল বলেই পণ্ডিতদের বিশ্বাস। মিশরীয়দের লিপি ক্রীট-লিপিকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে, তবে উল্টোটা কখনো নয়।

যদিও টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস উপত্যকায় অর্থাৎ মেসোপটেমিয়ায় লেখার ব্যাপারটা নীল উপত্যকার আগেই ঘটেছিল, তবু আদিম মেসোপটেমিয়ার লিপির

সঙ্গে মিশরীয়দের লিপির কোন সাদৃশ্য নেই। মিশরের লিপি একেবারে যেন মিশরের নিজস্ব। এই মিশরেই তার যেন জন্ম। মিশরীয় লিপি ও চারু-কলার মধ্যে যেন রয়েছে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তারা যেন একই রীতিতে গড়ে উঠেছে। মিশরীয় লিপি মিশর সভ্যতার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু কিভাবে এই উন্নত লিপি সৃষ্টি হল তার কোন ইতিহাস নেই।

মিশরীয় লিপির মতই মিশর সভ্যতার বহুদিকই বিতর্কিত, কাল্পনিক এমনকি অজানা। প্রাচীন প্রস্তর যুগের ভূখণ্ডের উপর পরবর্তীকালের মিশর সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। রুশ পণ্ডিত H. Kink তাঁর 'Egypt Before the Pharaohs' গ্রন্থে বলেছেন যে 'Neolithic era সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা খুবই মুস্কিল।' মিশরের নিওলিথিক যুগের সঙ্গে প্রাচীন সাহারার সভ্যতার একটা ঘনিষ্ঠ মিল আছে। একথাও সত্যি যে নিশ্চয় কোন বিশেষ কারণের জন্যই প্রস্তর যুগের সভ্যতা হঠাৎ লাফ দিয়ে ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতায় পৌঁছে গিয়েছিল। এক আদিম জাতি হঠাৎ পৌঁছে গিয়েছিল এক বিস্ময়কর সভ্যতার শীর্ষদেশে। Kondratov প্রশ্ন করেছেন এমন কি হতে পারে যে পৃথিবীর প্রাচীন চারটে সভ্যতা মিশর, উবায়েদ-সুমের, এলামাইট ও দ্রাবিড়-হরপ্পীয় সবগুলোই এক সাধারণ জায়গায় সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই ভূখণ্ড হচ্ছে লেমুরিয়া। Kondratov আরো বলেছেন যে যদি সমুদ্রবিশারদরা এ বিষয়ে আলোকপাত করেন তাহলে মানব ইতিহাস হয়তো নতুন করে লিখতে হবে। যেমন লিখতে হয়েছে গ্রীকদের ইতিহাস শীলিম্যানের ট্রয় আবিষ্কারের পর। যেমন লিখতে হয়েছে ভারতের ইতিহাস রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহেঞ্জোদড়ো আবিষ্কারের পর।

সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার

আমার প্রথম গ্রন্থের 'মহেঞ্জোদড়ো বাসীরাই কি রামায়ণের গন্ধর্বরা ?' অধ্যায়ে বিস্ময়কর সিন্ধুবাসীদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো এই নগর-সভ্যতা যেন ইতিহাসের এক ধাঁধা। পণ্ডিতদের মত হচ্ছে সিন্ধুবাসী বা হরপ্পীয়রা ভারতের আপন সন্তান নয়। তারা অন্য কোথাও থেকে এখানে এসে সভ্যতা বিস্তার করেছিল। কোথা থেকে তারা এসেছিল তা আজো অজানা। কিন্তু আমার প্রথম গ্রন্থে রামায়ণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে এই হরপ্পীয়দের আদি পুরুষরা বাস করতেন ভারতের দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপে, পরবর্তী কালে তাদেরই বংশধররা সিন্ধুসভ্যতা বিস্তার করেন। ভারত মহাসাগরের এই দ্বীপ লেমুরিয়ার অংশ বলেই আমাদের বিশ্বাস।

যাহোক মহেঞ্জোদড়োবাসীদের লিখিত ভাষা ছিল। চিত্রলেখ লিপিতে এ ভাষা

লেখা হত। এ ভাষার সঠিক পাঠোদ্ধার এখনো হয় নি।

মহেঞ্জোদড়ো ও হরাপ্পা খনন করে বহু শীলমোহর আবিষ্কৃত হয়েছে। অধিকাংশ শীলমোহরই নরম পাথরে তৈরী। এ ছাড়া পোড়ামাটি, তামা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতির শীলমোহরও পাওয়া গেছে। এই শীলমোহরগুলিতে কিছু লিপি (অক্ষর) ও বিভিন্ন পশু, হাঁতি, গণ্ডার, বৃষ, মহিষ, হরিণ, ছাগল, ঘড়িয়াল, কুমীর, ব্যাঘ্র, বৃশ্চিক, সর্প ও কিম্ভূতকিমাকার জীব প্রভৃতির ছবি আছে। কোন কোন শীলমোহরে আছে দেবদেবী ও মানুষের মূর্তি। মহেঞ্জোদড়োর ভাষা বলতে এই সমস্ত শীলমোহরে খোদাই করা লিপি বা অক্ষর। সম্পূর্ণ কোন শিলালিপি বা পুঁথি ইত্যাদি কিছু আবিষ্কার করা যায় নি। কিন্তু এই ছোট ছোট শীলমোহরের অদ্ভুত লিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা চললেও আজো পর্যন্ত সর্ববাদিসম্মত কোন পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

তবে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা কমপিউটারের সাহায্যে গবেষণা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে এই ভাষার সঙ্গে প্রাচীন দ্রাবিড় ভাষার যথেষ্ট মিল আছে।

সম্প্রতি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রী এস, আর, রাও সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার করেছেন বলে দাবী জানিয়েছেন। (The Statesman 3.9.80.)

যাহোক পূর্ববর্তী বিশেষজ্ঞরা কি ধরণের পাঠোদ্ধার করেছেন তা শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামীর 'প্রাগৈতিহাসিক মোহেঞ্জোদড়ো' গ্রন্থটির সাহায্যে এখানে আলোচনা করব।

মধ্যপ্রাচ্য, মিশর ও ভারতের প্রাচীন অক্ষরে (ব্রাহ্মী) লিখিত ভাষার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে কারণ এইসব দুর্বোধ্য লিপিতে লিখিত বিষয়বস্তু অন্য কোন পরিচিত লিপিতে লিখিত ছিল। যেমন অশোকের শিলালিপি পালি অক্ষর ও ভাষায় যেমন উৎকীর্ণ হয়েছিল তেমনি তা আবার কোন কোন জায়গায় উৎকীর্ণ হয়েছিল সংস্কৃত বা দেবনাগরী লিপিতে। আর এই কারণে ব্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছিল। এ কাজ যিনি করেছিলেন তাঁর নাম ছিল প্রিন্সেপ। মিশর লিপির (Hieroglyphics) পাঠোদ্ধার করেন শাঁপোলিঁও (Champolion) এবং মেসোপটেমিয়া ও পারস্যের কীলকাক্ষরের (Cuniform) লিপির পাঠোদ্ধার করেন রলিন্‌সন্ (Rawlinson)।

মহেঞ্জোদড়োর লিপির সঙ্গে পৃথিবীর আর এক রহস্যময় দ্বীপ সভ্যতার (ইস্টারদ্বীপ) প্রাচীন লিপির ঘনিষ্ঠ মিল আছে তা আগেই বলেছি।

স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম প্রথম ব্রাহ্মী লিপির সঙ্গে মহেঞ্জোদড়োর লিপির কোন কোন অক্ষরের সাদৃশ্য দেখান। তিনি 'লছমিয়' শব্দটি পড়তে পেরেছেন বলে দাবী জানান। মিশরীয় ও সুমেরতত্ত্বে পণ্ডিত S. Langdon ও বিশ্বাস করেন যে মহেঞ্জোদড়োর লিপিই হচ্ছে ব্রাহ্মী লিপির আদি জননী।

মিশরীয় ও সুমের তত্ত্বের পণ্ডিত C.F.Gadd, Sidney Smith বলেন যে সিন্ধু-লিপির কিছু নাম ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষার অন্তর্গত।

'মহেঞ্জদড়োর লিপি ও সভ্যতা' গ্রন্থে শ্রীরাজমোহন নাথ বোম্বাই-এর এলফিনস্টোন কলেজের অধ্যাপক রেভারেণ্ড হিরাস এর কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রী কৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামীও রেভারেণ্ড হিরাস এর পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে বলেছেন, 'রেভারেণ্ড হিরাস শীলমোহরের লেখা হইতে মোহেঞ্জোদড়োবাসীদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে লিখিত এক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি ঐ লেখা সমূহ পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে এখানে সকল দেবগণের উপরস্থ প্রধান উপাস্য দেবতাকে আণ, (An) বলা হইত। তিনি বলেন, লেখ-সমূহে আণকে জীবন (life), একত্ব (oneness), মহত্ব (greatness), পালন (protection), সর্ব্বজ্ঞত্ব (omniscience), ঔদার্য্য (benevolence), সংহার (destruction) ও সৃষ্টির (generation) কর্ত্তা বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ দেবতাদের আট প্রকার বিভূতি ছিল। ইঁহাদের মধ্যে আণই সর্ব্বপ্রধান। ইঁহাকে সূর্য্য বলিয়াও কল্পনা করা হইয়াছে। ঐ যুগে আটটি রাশি ছিল ; এইকথা মোহেঞ্জো-দড়ো লেখে এবং প্রবাদ বাক্যেও নাকি আছে। এক আণই বৎসরের বিভিন্ন আটটি মাসে আট প্রকার রূপ পরিগ্রহ করিতেন। শীলমোহরে মেষ (ram) ও মীন (fish) রাশির কথা নাকি বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে। মেষ ও মীন রাশির সম্মিলিত আকৃতি একস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাকে নণ্ডুর (Nandur) এর ঈশ্বর (God of Nandur) বলা হইয়াছে। নণ্ডুর অর্থে নাকি কর্কটের দেশ বুঝায়, এবং মোহেঞ্জোদড়োর নাম 'নণ্ডুর' ছিল বলিয়া তিনি (হেরাস্) মনে করেন।'

হেরাস বলেন যে মহেঞ্জোদড়োর লিপিতে ত্রিনেত্রযুক্ত দেবতার পূজোর উল্লেখ আছে। বর্তমান দক্ষিণভারতে প্রচলিত এণ্‌মৈ (Enamai), বিডুকন্ (Bidukan) পেরাণ্ (Peran)' তাণ্ডবন্ (Tàndavan) প্রভৃতি শিবের নাম নাকি ঐ যুগে 'আণ' এরই নাম ছিল।

হেরাস আরো বলেন যে লিঙ্গপূজা মহেঞ্জোদড়োতে বিশেষ প্রচলিত ছিল না। এখানকার অধিকাংশ লোক 'মে-ই-ন' (Meina) (সংস্কৃত সাহিত্যের মীন বা মৎস্য) সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। (কেন ? বৈবস্বত মনুর বা মৎস্য অবতারের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক ছিল নাকি ? মহেঞ্জোদড়োবাসীদের মেসুরিয়াবাসী গন্ধর্ব বলে আমরা হয়তো খুব ভুল করিনি)। হেরাসের মতে, 'বেশীর ভাগ সম্পত্তিই মন্দিরের দেবতার পূজার জন্য দেবোত্তর থাকিত। এক সময়ে নাকি মৎস্য-কর (Fish Tax) পর্য্যন্ত লিঙ্গপূজায় ব্যয়িত হইত। এই দেশ ভগবানেরই রাজ্য এবং রাজারা তাঁহারই প্রতিনিধি—এই ধারণা লইয়া একাধারে ধর্ম্ম ও রাজ্য এই উভয়ের উপর রাজারা কর্তৃত্ব করিতেন।' শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামী তাঁর গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'যদি তাঁহার

(হেরাস-এর) পাঠ সত্যই নির্ভুল হয় তবে ঐ যুগের মোহেঞ্জোদড়োর ভাষা যে দ্রাবীড় গোষ্ঠিরই ভাষা ছিল, ইহা বলা যাইতে পারে। মোহেঞ্জোদড়োবাসীরা দ্রাবীড় জাতীয় এবং তাহাদের ভাষাও দ্রাবিড়ীয় অন্য কোন কোন পণ্ডিতও এইরূপ অনুমান করেন।'

শ্রীগোস্বামী লিখেছেন, 'কিছুকাল পূর্ব্বে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত কাউয়াই দ্বীপের কালোয়া সহরের 'কেলী ন্যাচারাল হিষ্টরি মিউজিয়াম' এর চেয়ারম্যান মিসেস রুথ হ্যানার হাওয়াই দ্বীপের পাহাড়ে পাথরের উপর ক্ষোদিত কতিপয় চিহ্ন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত করেন। প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতার কোন কোন অক্ষরের সঙ্গে ঐ সকল চিহ্নের কিছু কিছু সাদৃশ্য দৃষ্টি-গোচর হয়। অনুসন্ধানের জন্য ঐ বিভাগ হইতে ডাঃ ছাবরা হাওয়াই দ্বীপে গিয়া সিন্ধুলিপিতে ব্যবহৃত প্রায় ৪০টি চিহ্ন উহাদের মধ্যে আবিষ্কার করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ইহাতে সুপ্রাচীন অতীত ভারতের সঙ্গে হাওয়াই দ্বীপের সভ্যতা ও সংস্কৃতির যোগাযোগের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।'

শ্রীশঙ্কর হাজরা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পত্রিকায় (১ম খণ্ড, নবম সংখ্যা Sept 1920) 'হরপ্পীয়দের সন্ধানে' প্রবন্ধে হরপ্পীয়রা অর্থাৎ সিন্ধু উপত্যকাবাসীরা দ্রাবিড়দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় এ কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, 'হর্ণেল বললেন (Hornell 1920) দক্ষিণভারতের নৌবিষয়ক যন্ত্রগুলির সঙ্গে সুমেরীয় নৌযন্ত্রগুলির সাদৃশতা আছে। বলা যেতে পারে অতি-সুমেরীয় আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে দ্রাবিড়-বিদ্যাবিদরা সুমেরীয়দের সঙ্গে দ্রাবিড়ভাষীদের প্রায় বিনা কারণেই সম্পর্কিত করে দ্রাবিড়ভাষীদের গৌরবমণ্ডিত করার চেষ্টা আরম্ভ করলেন।'

শ্রীহাজরা আরো লিখলেন, 'কোন কোন উৎসাহী দ্রাবিড়বিদ পূর্বেই ঋগ্বেদীয় সংহিতার ধর্মকে দ্রাবিড় ধর্ম, আবার অন্য কেউ ঋগ্বেদীয় আর্যভাষীদের আর্যদ্রাবিড় বলে মন্তব্য কোরতে চেয়েছিলেন। তাই এই অবস্থায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভাষা-বিদরাও এ বিষয়ে আর পিছিয়ে থাকতে চাইলেন না। বিদেশী বিজ্ঞজনদের দীপ্তিতে ডঃ সুনীতি চ্যাটার্জী, ডঃ দে প্রমুখ বিদ্বৎজনেরা ঋগ্বেদীয় সংহিতার ভাষায় অত্যন্ত স্পষ্ট দ্রাবিড় প্রভাব দেখতে আরম্ভ করলেন।'

শ্রীরাজমোহন নাথ 'মহেঞ্জদড়োর লিপি ও সভ্যতা' গ্রন্থে বৈদিক দর্শন ও তন্ত্র-পদ্ধতির মাধ্যমে সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি লিখেছেন, 'লিপি সম্পর্কে একটি প্রাথমিক কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের চিরাচরিত প্রথা মতে বলা হয় বর্ণমালা এবং অক্ষর। অক্ষর শব্দের অর্থ হইল যাহার ক্ষয় হয় না ; অর্থাৎ ইহা প্রাথমিক, basic, elementary অবস্থা। বর্ণ অর্থে রং, রূপ। তাহা হইলে ভারতীয় অক্ষরগুলি

বিভিন্ন বর্ণজ্ঞাপক অবস্থার মালা বা হার। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকারিণী আদ্যাশক্তি বিশ্বের বিভিন্ন পদার্থরূপে সৃষ্ট ও প্রতিভাত হইবার সময় একান্নটি প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করেন; এবং প্রত্যেক স্তরে এক একটি রূপ বা বর্ণ প্রতিভাত হয়। ঐ প্রাথমিক স্তরের রূপের এক একটি চিত্রই হইল বর্ণমালার এক একটি অক্ষর। হিন্দুশাস্ত্রে বলা হয়—বিশ্বসৃষ্টিকারিণী আদ্যাশক্তি (creative energy) একজন নারী, দেবী, প্রকৃতি। তাহার দেহ একান্ন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এবং ঐ এক এক খণ্ড এক একটি অক্ষর স্বরূপ সৃষ্টিক্ষেত্র বা পাঠস্থান হইয়াছে। আবার তিনি যখন বাস্তব পদার্থ সৃষ্টি-ক্রিয়া (কৃ) আরম্ভ করেন, তখন তিনি কালীরূপ ধারণ করেন, এবং ঐ অক্ষর-বর্ণ হইতে উদ্ভূত শব্দের (sound principle) তত্ত্বের বাহকের প্রতীক পঞ্চাশটি নরমুণ্ডের মালা কণ্ঠে ও একটি হস্তে ধারণ করেন। তাহা হইলে বুঝা গেল যে, বর্ণমালার প্রত্যেকটি অক্ষর মূলতঃ সৃষ্টিক্রিয়াকারিকা শক্তির (Energy) বিভিন্ন ক্রিয়াস্তরের (base or plane of force action) এক একটি চিত্র (Hieroglyph) ভিন্ন আর কিছুই নয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও শক্তির ক্রিয়ার সঙ্কেত স্বরূপে বর্ণমালার অক্ষর, সংখ্যা এবং জ্যামিতিক রেখা চিত্র ব্যবহার করেন।'

এই প্রসঙ্গে শ্রীনাথ লিখেছেন, 'আধুনিক বৈজ্ঞানিক ঋষি ডক্টর আইনষ্টাইন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকারিণী প্রকৃতি শক্তির আক্ষরিক বর্ণনায় লিখিয়াছেন $E=mc^2$, $E=$ শক্তি (Energy), $m=$ পদার্থ (man), $C=$ আলো-গতি (velocity of light)। এই বিবৃতির অর্থ হইল এই, যে, আদ্যাশক্তি আলোগতিরূপে বিভিন্ন অনুপাতে প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকেন। প্রত্যেক পদার্থই আদ্যাশক্তির বিভিন্নরূপ। গীতায় একই কথা বলা হইয়াছে—'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ' (১৪।৩)—অংশ, অংশু, স্ফুরজ্জ্যোতিঃ।'

যাহোক আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিন্ধু-লিপি ও তার ভাষার সঙ্গে দ্রাবিড় ও ইন্দো-ইউরোপীয় উভয় ভাষার মিল আছে বলেই পণ্ডিতরা তর্কবিতর্ক করে চলেছেন এবং ওই ভাষার পাঠোদ্ধারের দাবী দুভাবেই করা সম্ভব হয়েছে বলে দাবী করছেন। এ থেকে আমরা মোটামুটি এ সিদ্ধান্তে কি আসতে পারি যে এই দ্রাবিড় ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাবধারার একটি আদি উৎস ছিল। অর্থাৎ আমরা আমাদের পূর্বের বক্তব্যে ফিরে যেতে চাই যে দেবতা বা আর্য আর গন্ধর্ব, অসুর, রাক্ষস বা দ্রাবিড়দের কৃষ্টি ও সভ্যতা ছিল খুব সম্ভবতঃ এক এবং তা হচ্ছে বৈদিক সভ্যতা। যদিও ভাষাগত দিক থেকে এরা ছিলেন ভিন্নগোষ্ঠী। আর হয়তো সেই জন্যেই আজকের বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতমণ্ডলী এই দুই তত্ত্বকে মেলাতে না পেরে বিতর্কের ঝড় তুলেছেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে ভাষা ধর্ম ও কৃষ্টিকে আলাদা করতে পারে না। খৃষ্টান ধর্ম

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতীই তো পালন করে থাকেন। বৌদ্ধ, ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে। ভারতের হিন্দুরা তো আজো দ্রাবিড ও ইন্দোইউরোপীয়ান ভাষায় কথা বলে থাকেন তাতে তাদের ধর্ম ও কৃষ্টি কি পৃথক হয়ে গেছে ?

আসলে আমরা একটি সত্য ঘটনাকে যদি স্বীকার করে নিই তাহলেই সব সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান হয়ে যায়। সে সত্য হচ্ছে পৃথিবীর মানুষের পূর্বপুরুষ দেব-গন্ধর্বরা এসেছিলেন ভিনগ্রহ থেকে এবং তারা ছিলেন একটিমাত্র কৃষ্টি ও সভ্যতার ধারক ও বাহক।

দ্রাবিড় রহস্য

আধুনিক বিজ্ঞানীদের ধারণা উবায়েদ, এলামাইট, ও মহেঞ্জোদড়োর ভাষা বহু প্রাচীনকালে খুব সম্ভবতঃ একটি ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। এই ভাষার তারা নাম দিয়েছেন আদি-দ্রাবিড় ভাষা (proto-Dravidian language)। এখন প্রশ্ন হল কতকাল আগে আদি-দ্রাবিড ভাষার শাখাগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন ভাষার রূপ নিয়েছিল ? আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা গাণিতিক সূত্র প্রয়োগ করে এই সময়ের একটা হিসেব বের করেছেন। তাঁদের মতে এই সময়কাল হচ্ছে ৬000 বছর আগে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে লেমুরিয়া থেকে মাইগ্রেসান শুরু হয় বৈবস্বত মনুর কালে অর্থাৎ ৬০০০ বছর আগে। ঠিক এই একই সময়ে আদি দ্রাবিড় ভাষা থেকে তার শাখাগুলি বেরিয়েছিল ? পৃথিবীর রহস্যময় সভ্যতাগুলির বয়স ৬000 বছরের বেশী প্রাচীন নয় বলেই ঐতিহাসিকদের বিশ্বাস। ৬০০০ বছর আগে এতগুলো বিশেষ ঘটনা একসঙ্গে ঘটল ? একটা কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন তা হচ্ছে যে ভাষার সঙ্গে জাতির প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই। ঐতিহাসিকরা বলেন, 'It is now well recognised that language has no definite relation to race.' দেবতাদের বিভিন্ন গোষ্ঠী (খুব সম্ভবতঃ বিভিন্ন ভাষাভাষীও) পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন একথা আমরা আগেই বলেছি। উপনিবেশ স্থাপন করে তারা মিলেমিশে বাস করলেও পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে শুরু হয় অসদ্ভাব। তারপরই শুরু হয় লেমুরিয়া ছেড়ে পালানো। পণ্ডিতরা বলছেন সুমেরীয় সভ্যতা সৃষ্টিকারী, সিন্ধুসভ্যতা সৃষ্টিকারীরা ছিলেন দ্রাবিড় ভাষাভাষী। লেমুরিয়ার এক ভূখণ্ড রাবণের লঙ্কা। তাহলে আমরা একথা বলতে পারি যে লেমুরিয়াতে যে সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল তাদের মধ্যে দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের এক বিরাট গোষ্ঠী ছিল। এই গোষ্ঠীরাই খুব সম্ভবতঃ গন্ধর্ব রাক্ষস ও অসুর বলে অভিহিত হতেন। এই দ্রাবিড় গোষ্ঠীই পরবর্তীকালে লেমুরিয়া ছেড়ে চলে যান এবং সুমের, সিন্ধু সভ্যতা গড়ে তোলেন।

এদেরই একদল দখল করেন দক্ষিণ ভারত। মিশর সভ্যতার সঙ্গেও খুব সম্ভবতঃ যোগাযোগ ছিল এই দ্রাবিড়ভাষীদের।

ঐতিহাসিকরা বলেন যে আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে এসে অনার্য বা দ্রাবিড় অধ্যুষিত ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেন। আর্যরা ভারতে বহিরাগত। সব থেকে বিস্ময়ের কথা হচ্ছে এই যে এই অনার্য বা দ্রাবিড়ভাষীরাও ভারতের আদিম অধিবাসী নন। তাদের প্রাচীন ইতিহাসও রহস্যে ঢাকা। Kondratov বলেছেন, 'The most surprising thing is that the Dravidian languages are also alien languages, although they appeared in the Indian Sub-continent before the Indo-European languages and possibly before the Munda l..nguages.'

মনে রাখা ভাল যে মুণ্ডারাও ভারতের আদিম অধিবাসী নয়। তারাও ভারতে এসেছিল প্রায় হাজার ছয়েক বছর আগে। ভারতে প্রধানতঃ তিনটি ভাষাভাষী মানুষ আছে—(এক) ইন্দো-ইউরোপীয়ান, (দুই) মুণ্ডা, (তিন) দ্রাবিড়। সব থেকে মজার কথা হচ্ছে এই যে এরা কেউই ভারতের আপন সন্তান নয়। সবাই বহিরাগত।

দাক্ষিণাত্য সাধারণতঃ দ্রাবিড় অধ্যুষিত মনে করলেও নৃতাত্ত্বিক বিচারে সেখানে কয়েকটি বিশিষ্ট জাতি (race) বাস করে। তারা হল :

(ক) নিগ্রোটো টাইপ

(খ) প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড টাইপ—মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের অরণ্যে এদের বাস।

(গ) প্রোটো-মেডিটেরেরিয়ান টাইপ — বর্তমানের দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় ভাষাভাষীরা।

(ঘ) ভূমধ্যসাগরীয়—এরাই ছিল সিন্ধু উপত্যকাবাসী—তেলেগু ব্রাহ্মণ ও কাল্লাররা হচ্ছে এই ভূমধ্যসাগরীয় জাতি।

(ঙ) এ্যালপাইন ও আর্মেনয়েড—সিন্ধু প্রদেশে এই জাতির মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। বর্তমানে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ ও কর্ণাটকে এদের দেখতে পাওয়া যায়।

(চ) নরডিক—চিৎপাবন অথবা কোঙ্কনস্থ ব্রাহ্মণদের মধ্যে এদের দেখা যায়।

(ছ) মোঙ্গল—এদের সংখ্যা খুবই কম। ওড়িষা থেকে মালাবার উপকূল পর্যন্ত এদের দেখতে পাওয়া যায়। এরাও নাকি সমুদ্রপথে ভারতে এসছিল বলে পণ্ডিতরা মনে করেন।

দাক্ষিণাত্যের ভাষাগত বিভাগও ভারতের মতই তিনটি প্রধান ভাগে পড়ে।

(১) ইন্দো-ইউরোপীয়—মারাঠী।

(২) দ্রাবিড়—তামিল, তেলেগু, কানাড়া, মালায়লম ইত্যাদি।

(৩) মুণ্ডা ইত্যাদি।

দ্রাবিড় ভাষা শুধু ভারতের দক্ষিণ অংশেই বিস্তারলাভ করেনি। দ্রাবিড় ভাষা ও সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল আনাতোলিয়া, আর্মেনিয়া এবং ইরাণে। দ্রাবিড় ভাষা উত্তর পশ্চিম ভারতে বিশেষ করে বালুচিস্থানে প্রচলিত ছিল, এই ভাষার নাম ব্রাহুই (Brahui)। শুধু তাই নয় মায়াদের স্টেপ-পিরামিডের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের গোপুরমের যে যথেষ্ট মিল আছে তাও অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন।

এশিয়া মাইনরের লাইসিয়ানরা নিজেদের বলে 'ত্রিম্মিলাই'। এর সঙ্গে দ্রামিলা (তামিল) কথার নিকট সাদৃশ্য আছে বলেও ঐতিহাসিকরা মনে করেন।

আফগানিস্থান, ইরাণ, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসের উপত্যকা, মেসোপটেমিয়ার বহু প্রাচীন জায়গার নামের সঙ্গে দ্রাবিড় নামের মিল আছে। এবং এইসব জায়গার প্রাচীন মানুষেরা দ্রাবিড ভাষাভাষী ছিল। হুরিয়ান ও কেসিটি ভাষার সঙ্গেও দ্রাবিড় ভাষার যথেষ্ট মিল। এলামাইট ও ব্রাহুই ভাষার কথা আগেই বলা হয়েছে। নীলকান্ত শাস্ত্রী তাঁর 'A History of South India' গ্রন্থে বলেছেন, 'The conclusion seems unavoidable that there is some genetic connexion between all these languages.'

দক্ষিণ ভারতে এখনো মেয়েরা সম্পত্তির অধিকারীনি হয়। এই প্রথা প্রাচীন কাস্পিয়ান এলামাইটদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। নীলকান্ত শাস্ত্রী বলেছেন যে মেসোপটেমিয়ার মাতৃকা দেবীর (Lady of the Mountain) পূজা ও উর এর চন্দ্র দেবতার সঙ্গে তাঁর বিবাহ উৎসব দেবী পার্বতার পূজার সঙ্গে ও দক্ষিণভারতের শিব মন্দিরে বাৎসরিক 'তিরুকল্যানম' (divine marriage) উৎসবের সঙ্গে প্রচণ্ড মিল আছে।

শাস্ত্রীজী আরো বলেছেন যে প্রাচীন সুমেরীয়াতে যে ভাবে মন্দিরে দেবদেবীর পূজা করা হত, এবং মন্দিরের স্থাপত্য ইত্যাদির সঙ্গে দক্ষিণভারতের মন্দির ও পূজার যথেষ্ট মিল আছে।

দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে যেমন দেবদাসী প্রথা আছে প্রাচীন সুমেরীয়াতেও নাকি তেমনি প্রথার প্রচলন ছিল।

দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস কিন্তু অন্ধকারে ঢাকা। ৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেকার ঘটনা সামান্যই জানা গেছে। অথচ ঐতিহাসিকরা বলে থাকেন যে, 'The Deccan is one of the oldest inhabited regions of the world and its pre-historic archaeology and contacts with neighbouring lands, so far as they are traceable constitutes an important Chapter in the history of the world's civilization'.

ঐতিহাসিকরা বলেন যে সবথেকে প্রাচীন তামিল সাহিত্য (সংঘ) উত্তর ভারতীয় সংস্কৃত প্রথা ও ভাবধারায় পূর্ণ। তাঁরা বলেন উত্তর ভারতীয় আর্য সভ্যতা দক্ষিণ ভারতের উপর প্রভাব বিস্তার শুরু করে এবং তার ফলেই এরকম ঘটনা ঘটেছে। ঐতিহাসিকরা বলেন, 'The literature (of the Sangam Age) was the result of the meeting and fusion of two originally seperate cultures, the Tamil and the Aryan'. দুটি মূল সভ্যতা যতই একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করুক একে অন্যকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করতে পারে কি? কিন্তু আমরা দেখি দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন সাহিত্য সম্পূর্ণ উত্তর ভারতীয় আর্য সভ্যতা ও ভাবধারায় পূর্ণ। স্বভাবতই আমাদের সন্দিগ্ধ মনে সন্দেহ জাগে। দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় সভ্যতা ও উত্তরের আর্য্য সভ্যতা আসলে আদি একটি সভ্যতা থেকে জন্ম নেয় নি তো? আর তাই হয়তো দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন তামিল সাহিত্যে সেই আদি সভ্যতার (আমরা যাকে বৈদিক সভ্যতা বলেছি, এবং অবশ্যই যা ভিনগ্রহের সভ্যতা) ধারাই বহন করে চলেছিল—উত্তর ভারতের আর্যরা প্রভাব বিস্তার করে নিশ্চয় দ্রাবিড়দের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারত না। এ বিষয়ে নতুন করে গবেষণা হওয়ার প্রয়োজন আছে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

Kondratov লিখেছেন আজকের আধুনিক দ্রাবিড়রা আদি দ্রাবিড়দের মত নয়। বহু নৃতত্ত্ববিদ বিশ্বাস করেন যে আদি দ্রাবিড়রা আধুনিক দ্রাবিড়দের থেকে ভিন্ন রকমের ছিলেন। আদি দ্রাবিড়দের গায়ের রঙ ছিল হাল্কা বা শ্যামবর্ণ এবং তারা বেশ লম্বা ছিলেন।
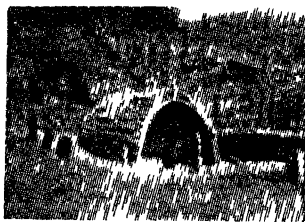
টোডাদের বাড়ি

আদি দ্রাবিড়দের সন্ধান এখন আর পাওয়া সম্ভব নয়। দক্ষিণভারতের কেন্দ্রে নীলগিরি পাহাড়ের উপর (উতকামণ্ডে) টোডা নামে এক রহস্যময় পার্বত্য জাতি বাস করে। এরা বর্তমানে সংখ্যায় খুবই কম। Kondratov লিখেছেন যে এরা আদি-দ্রাবিড়দের অনেক কিছু বহন করে চলেছে। টোডাদের ভাষা দ্রাবিড় ভাষা কিন্তু টোডা পুরোহিতরা পুজোপার্বনে এক অদ্ভুত ভাষা ব্যবহার করে। এই ভাষাকে

তারা বলে Kworjam বা Kworsham। এই ভাষার বহু দেবতার নাম প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার দেবতাদের নামের সঙ্গে মিলে যায়।

টোডা পুরোহিত

ঐতিহাসিকেরা বলে থাকেন যে দ্রাবিড়েদের আদি বাসভূমি নাকি সুমের, এলাম, ইরাণ অথবা ককেশাস পর্বত। বহুদূর অতীতকালে মেসোপটেমিয়া, ইরাণ, ককেশাস পর্বত, বেলুচিস্থান, সিন্ধু উপত্যকা প্রভৃতি স্থানে দ্রাবিড়ভাষীরা বাস করত। এই বিশাল ভূখণ্ডই কি তাহলে দ্রাবিড়দের আদি বাসভূমি? কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে আদি দ্রাবিড়গোষ্ঠী সম্প্রদায় ছিল যাযাবর। তারা সুমের ও এলামের সীমান্তদেশ থেকে শুরু করে আমু-দরিয়া, সির-দরিয়া ও ককেশাস পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতো। তারাই ৬০০০ বছর আগে উত্তর-পশ্চিমের সুবিধেজনক গিরিপথ দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। কারণ পূর্বেই বলেছি দ্রাবিড়রা ভারতের আদিম মানব নয়। ঐতিহাসিকরা বলেন, 'although the Dravidians are an ancient people of India it is an indisputable fact that they come from somewhere else'. দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার, এলাম ও ককেশাসের ভাষার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। তবে তা থেকে নিশ্চয় এ সিদ্ধান্ত টানা যুক্তিসংগত হবে না যে আদি দ্রাবিড়রা ওইসব স্থান থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল। কারণ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন যে দ্রাবিড়ভাষা দাক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রসার লাভ করেছিল, উত্তর থেকে দক্ষিণে নয়। তাহলে দক্ষিণভারতের দ্রাবিড়রা এসেছিল কোথা থেকে? দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণে তো ভারতমহাসাগর। তাহলে কি আদি দ্রাবিড়ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল ভারত-মহাসাগরের বুকে? তারপর তা ছড়িয়ে গিয়েছিল দক্ষিণভারত, সিন্ধু উপত্যকা, বেলুচিস্থান, এলাম, সুমের ইত্যাদি স্থানে? এ তত্ত্ব সত্য বলে মেনে নিতে হলেই

আমাদের লেমুরিয়া তত্ত্বও মেনে নিতে হয়। আমরা আগেই বলেছি যে তামিলদের উপকথা সেই কথাই বলে যে তাদের আদি বাসভূমি ছিল ভারতের দক্ষিণে ভারত-মহাসাগরের বুকে বিষুবরেখার উপরে অবস্থিত এক দ্বীপে। কালক্রমে যা নিমজ্জিত হয়েছে সমুদ্রের গভীরে।

দ্রাবিড়রা যে সমুদ্রপথে যাতায়াতে পটু ছিল তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিকরা বলেন দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন রাজারা 'তিন সমুদ্রের প্রভু' বলে পরিচিত ছিলেন—'the Satavahanas were described as lords of the three oceans and promoted overseas colonization and trade ?

টোডাদের প্রাচীন দ্রাবিড়গোষ্ঠীর লোক বলে ধরা যেতে পারে। এরা পশুপালন করে; কিন্তু এদের একটি প্রাচীন সঙ্গীতে সমুদ্রপথে কি করে তাদের পূর্বপুরুষরা ভারতে এসেছিল তার কথা আছে। প্রাচীনকালের স্মৃতিই বিধৃত হয়ে আছে এই সঙ্গীতে।

মেসোপটেমিয়ার শহর খননকালে পুরাতত্ত্ববিদরা বহু দ্রাবিড়দেশের জিনিস খুঁজে পেয়েছেন। রাজা সলোমনের দরবারে যেসব বিরল বস্তু নিয়ে আসা হয়েছিল তার মধ্যে আছে চন্দনকাঠ যা পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র দক্ষিণভারতের মালাবার উপকূলে জন্মায়। প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল যে সুমেরীয় বণিকরাই হয়তো এইসব বানিজ্য-দ্রব্য মেসোপটেমিয়ায় নিয়ে এসেছিল দক্ষিণভারত থেকে; কিন্তু আরো গভীর অনুসন্ধানের ফলে সম্প্রতি জানা গেছে যে ব্যাপারটা তা নয়, দাক্ষিণাত্যবাসী বণিকরাই প্রথম সাগর পাড়ি দিয়ে মেসোপটেমিয়ায় পৌঁছেছিল।

সিন্ধু উপত্যকা খননকালে মাস্তুলওয়ালা জাহাজের ছবি পাওয়া গেছে। বৃটিশ পুরাতত্ত্ববিদ Ernest Mackay বিশ্বাস করেন যে সিন্ধুবাসীরা সুমেরীয়দের সঙ্গে সমুদ্রপথে ব্যবসাবানিজ্য করত।

পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার Mackayর বিশ্বাসকে সম্মান জানিয়েছে। গুজরাতের লোথাল নামক জায়গায় ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিদরা একটি বন্দরের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করেছেন। ২১৮ মিঃ লম্বা ও ৩৭ মিঃ চওড়া ইটের তৈরী এই বন্দরটি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। আরব সাগরে পড়েছে এমন একটি নদীর সঙ্গে ৭ মিঃ চওড়া একটি খালের সাহায্যে এই বন্দরের যোগাযোগ ঘটানো হয়েছে। লোথাল হরপ্পীয়দের তৈরী এবং তা মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার সমসাময়িক।

৪০০০-৪৫০০ বছর আগেকার সুমেরীয় পুঁথি ইত্যাদিতে মাগান ও মেলুখার কথা উল্লিখিত আছে। মাগান দামী জিনিসপত্র নিয়ে আসত এবং মেলুখা ভারত-মহাসাগরের দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। স্বর্ণরেনু, মুক্তো ও Lapis Lazuli রপ্তানী করত। একে 'কালো দেশ' বলা হত, সম্ভবতঃ বাসিন্দাদের গায়ের রঙের জন্য

দেশের এমন নামকরণ হয়েছিল। সুমেরীয়রা মেলুখায় যেত না; বরং মেলুখা-বাসীরাই বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে আসত মেসোপটেমিয়ায়।

মেলুখার জাহাজ 'magulim' এর কথাও সুমেরীয় পুঁথিতে উল্লেখ আছে। দ্রাবিড় মাঞ্চির সঙ্গে এই 'magulim' এর মিল দেখতে পেয়েছেন অনেক বিশেষজ্ঞ। মাঞ্চি হচ্ছে খুব বড় মালবাহী জাহাজ—১০ থেকে ৪০ টনের। কানাড়া, মালয়লাম, তামিল ভাষায় এখনো 'মাঞ্চি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তাই একথা হয়তো বলা চলে যে সুমেরীয়দের মেলুখা হচ্ছে দ্রাবিড়ভাষী দক্ষিণভারত।

ভাষা রহস্য

পৃথিবীতে এখন হাজার হাজার ভাষা থাকলেও, কোন এক আদিম অতীতে নাকি একটি মাত্র ভাষা প্রচলিত ছিল। বাইবেলে আছে, 'সমস্ত পৃথিবীতে এক ভাষা ও একরূপ কথা ছিল।, (আদি পুস্তক ১১.১)। পোপোল ভুঃ তে আছে বাইবেলেরই প্রতিধ্বনি, 'তাহারা সূর্যোদয় অবলোকন করিল। তাহাদের ভাষা ছিল এক। তাহারা কাষ্ঠের উপাসনা করে নাই, প্রস্তরেরও উপাসনা করে নাই।' ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর উদ্ভব যে এক আদিম ভাষা থেকে একথা তো প্রমাণিত সত্য।

এইসব ঘটনা একই দিক নির্দেশ করে তা হচ্ছে বহু পুরাকালে দেবতারা পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন, সঙ্গে করে এনেছিলেন একই সংস্কৃতি। ভাষাগত পার্থক্য হয়তো তাদের মধ্যে ছিল; কিন্তু সেই পার্থক্য কোন বাধার সৃষ্টি করেনি ভাবের আদান প্রদানে। সেই স্মৃতিই প্রতিফলিত হয়েছে বাইবেলে, পোপোল ভুঃ তে—যে পৃথিবীতে এক ভাষা ছিল।

তা না হলে এক জায়গার ভাষা আর এক জায়গায় কি করে ঢুকে পড়ে সে এক অদ্ভুত রহস্য।

ভারত মহাসাগরের বুকের মালাগাসীর ভাষার সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপের ভাষার মধ্যে মিল গড়ে ওঠে কিভাবে?

দানিকেন 'বীজ ও মহাবিশ্ব' গ্রন্থে বলেছেন, 'তাতার-ফিন' (Tartaro-Finnish) গোষ্ঠীর চুভাশ জাতের লোকেরা বাস করে রুশিয়ায়, মধ্য ভল্গার উভয় তীরে। তাদের সংখ্যা আজো ১৫,০০,০০০ লাখের মতন। চুভাশদের কথা ভাঙা ভাঙা তুর্কী। ব্রেজিলীয় ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত লুবোমির্ জাফিরোফ্ ইঙ্কাতত্ত্বেও সুপণ্ডিত। তিনি বলেছেন, চুভাশরা আজো প্রায় ১২০টা যৌগিক ইঙ্কা শব্দ ব্যবহার করে। সেগুলোকে প্রায় ১৭০টা সরল চুভাশ শব্দে নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জাফিরোফ্ বলেছেন, এর প্রত্যেকটি শব্দ এসেছে ইঙ্কা-পুরাণ থেকে।'

ঐতিহাসিকরা বলেন, 'লিথুয়ানিয়ার ভাষাই আর্যভাষার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত।' এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় গিরীন্দ্র শেখর বসুর 'পুরাণ প্রবেশ' গ্রন্থে যে কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন তা আগ্রহী পাঠকদের জন্যে তুলে দিচ্ছি।

'লিথুনিয়া নামক (পোলাণ্ডের উত্তরে) প্রদেশে প্রাচীন রীতিনীতি আচার ব্যবহার এখনও বর্তমান। ইউরোপীয় সভ্যতার প্লাবনে এখানে প্রাচীন স্মৃতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় নাই। লিথুনিয়ন ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার অদ্ভুত সাদৃশ্য। A. Paskevicius (পোস্ক) নামক একজন লিথুনিয়াবাসী কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম লিথুনিয়ার নদীর নামের সহিত ভারতীয় নদীর নামের মিল আছে যথা,

লিথুনিয়া	ভারত
নেমুনা	যমুনা
তাপ্তি	তাপ্তি
শ্রোবতি	সরস্বতী
পুরুস্নে	পয়োষ্ণী
পয়ুস্নে	পয়োষ্ণী
নর্বুবে	নর্মদা

লিথুনিয়ায় যে সকল জাতি ছিল বা এখনও আছে তাহাদের নাম যথা কুরু, পুরু, যাদব, সুদব, সেলুস, জাহ্নবীকাই ইত্যাদি। দেবতাদের নাম যথা দিইব, দেবুক, ইন্দ্র, বরুণ, পুরকন্য (পর্জন্য) বেত্র ইত্যাদি। এই সকল সাদৃশ্য এতই অদ্ভুত যে হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না। বিশেষজ্ঞদিগের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। ***পোস্কের নিকট শুনিলাম লিথুনিয়ান প্রত্নতাত্ত্বিক Pulk Tarasenka তাঁহার Priesistoirie Lietuva (Prehistoric Lithunia) গ্রন্থে লিথুনিয়ান জাতিগণের ইতবৃত্ত প্রায় ১২০০০ বৎসর পূর্বে আরম্ভ অনুমান করিয়াছেন। দুই চারি হাজার বৎসরের মধ্যে ভারত ও লিথুনিয়ার কোন সংযোগ ঘটে নাই ইহা নিশ্চিত। ভারতীয় সভ্যতার আরম্ভ পুরাণ মতে প্রায় ৬০০০ খ্রীঃ পূর্বে। তৎপূর্বে প্রায় ৫০০০ বৎসরের দেবগণের কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়।'

লিথুনিয়ার সঙ্গে ভারতের যদি যোগাযোগ নাই থেকে থাকে তাহলে কি করে লিথুনিয়ার ভাষা, নদীর নাম, দেবতার নাম ও জাতির নাম ভারতের সংস্কৃত ভাষা, প্রাচীন জাতি ও নদীর নামের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ মিল হয়? লিথুনিয়াবাসীরা যদি ভারতবাসীদের কাছ থেকে এসব ধার না করে থাকে তাহলে কি ভারতবাসীরা লিথুনিয়াবাসীদের কাছ থেকে ধার করেছে? তা নিশ্চয় নয়—তাহলে এই ধাঁধার উত্তর কি? লিথুনিয়াবাসীরা ও ভারতীয় আর্যরা এক আদিম উৎস থেকে উদ্ভূত-

হয়েছিলেন ও পরবর্তীকালে দুই সুদূর ভূখণ্ডে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। তাই দুই প্রান্তে বসবাসকারী দুই ভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষা, দেবতা, জাতি ও নদীর নামগুলির মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ মিল। এর থেকে আরও একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠছে—তা হচ্ছে ভারতের নদীগুলির নামও আসল বা original নয়। আর্যরা এসে এগুলির নামকরণ করেন তাদের জানা নদীর নামে।

কুয়েঙ্কায় পাওয়া একখানি স্বর্ণফলকের ছবি দিয়েছিলেন দানিকেন তাঁর 'বীজ ও মহাবিশ্ব' গ্রন্থে। ছাপান্নটা খোপে ছাপান্নটা অজানা অক্ষর সেই ফলকে। দানিকেন লিখেছিলেন, 'ধাতু গ্রন্থাগারের স্বর্ণপত্রসমূহেও এমনি অক্ষরের ছাঁচ। এ কি বর্ণমালা? দক্ষিণ আমেরিকায় শুনি, কোন বর্ণমালা ছিল না।'

যাহোক দানিকেন তাঁর 'প্রমাণ' গ্রন্থে ঐ স্বর্ণফলক সম্বন্ধে বলেছেন, 'ইতমধ্যে কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের ডেপুটি ডিরেক্টর অব পাবলিব ইনস্ট্রাকসান) ডঃ দিলীপ কুমার কাঞ্জিলাল সে ফলকের লেখা পড়ে ফেলেছেন। সে লেখা নাকি প্রাচীন ইণ্ডিয়া ভাষায় লেখা নয়, সে লেখা সুপ্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা একটি শ্লোক।'

এ প্রসঙ্গে দানিকেনের বাংলা অনুবাদক শ্রদ্ধেয় অজিত দত্ত মহাশয়ের সংযোজন 'প্রমাণ' গ্রন্থ থেকে তুলে দিচ্ছি। 'সব পাঠকেরই ইচ্ছে করবে, ফলকটিতে কি লেখা আছে জানতে। ভারতবর্ষের বাইরে সাধারণ পাঠকের মনে সে ইচ্ছে কতখানি প্রবল তা বলতে পারব না তবে ইউরোপ-আমেরিকার পণ্ডিত সমাজে যে এ ব্যাপারে হৈচৈ পড়ে গেছে, তা প্রায় প্রতিদিনই বুঝতে পারা যায়। এই সূত্রে গোড়ার কথাটা আর একবার মনে করিয়ে দিই। 'বীজ ও মহাবিশ্ব' গ্রন্থে আপনারা পড়েছেন, অমন ফলকের সংখ্যা কয়েক হাজার, তাও মাত্র একটি ঘরে। আরো কত ঘরে কত ফলক আরো আছে, সে খবর হয়তো শুধু শ্রীহুয়ান্ মরিস্ই দিতে পারেন। যে ফলকের ছবি দানিকেনের বইএ আছে, সে ফলক আছে ফাদার ক্রেস্পির মিউজিয়ামে। কুয়েঙ্কা, তথা পেরু-ইকোয়েডরের গুহার ভিতর থেকিই লুকিয়ে চুরিয়ে আনা সে ফলক। ডঃ কাঞ্জিলালের পাঠোদ্ধার করা ফলকটির বক্তব্য থেকে বুঝতে পারা যায়, সেইসব হাজার হাজার ফলকে বিধৃত রয়েছে হয়তো কোন 'পঞ্চম বেদ' না হয় আর এক 'মহাকাব্য'। যার হদিস হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতল গর্ভীরে। আমার এ অনুমান ফলকটির বক্তব্য পড়ে। আমি সামান্য অনুবাদক, নিজেকে জাহির করতে স্বভাবতই হয়তো খানিক আগড়-বাগড় বকতে চাই, কিন্তু দানিকেনের বাঙালী পাঠকও ওইটুকু পড়েই ভাবতে চেষ্টা করবেন, সাগরপারে পৌঁছে আমাদেরই 'ময়-আসুকরা' হয়তো হয়ে গেছে 'মাইয়া-অ্যাজটেক'। আগামী দিনে কেউ হয়তো আমার অনুমানকেই সত্যি বলে স্বীকৃতি দেবেন, হয়তো হারিয়ে

যাওয়া কোন মহামূল্যবান পুঁথিই চোখ মেলবে ২০০০ সালের কাছাকাছি এক নব সত্যযুগের সূচনায়। আপাতত ফলকটিতে কি লেখা আছে দেখুন,—

স ফ চ মৃ (মা ?)	সবচেয়ে সহজ	spontaneous are oblations and muttering of prayers.
হ ম জ প	হোম জপ।	Prayers alone can lead us
জ প° চৈ ব	কারণ জপ হতেই ঘটে	to Heaven,
দ্ব গু° প্র বা ॥	স্বর্গপ্রাপ্তি,	
যৈ সুদাস	যেমন ঘটেছিল	as Sudasa was
শ্ব ই তে দা ॥	সুদাসের ভাগ্যে।	elevated to Heaven.
•ওঁ খো ভ ন	হে শক্তিমান্,	Oh mighty lord, we
সূ ঁ ত্র যু ম।	স্তোত্রে তোমার স্তুতি	suffer from physical
গি ধী ম রি	করি দেহপীড়ায় কাতর	pains and chant
বৃ পূ খে ড়ং ॥	আমরা তোমার	hymns in the
	ধ্যান করি।	worship.
(ধ্য ?) ধ্রী আ ম চ	সমুদ্রের ওপার	Oh lord almighty,
ত লো দ ধ।	হতে মেঘবাহিত	come hither into
স মে ঘা (?)	হয়ে এসো,	us riding the
	দেখা দাও	clouds across
ভী ব্র ন শা ॥	হে অসীম শক্তিমান।	the seas.

এ প্রার্থনা সম্ভবতঃ ইন্দ্রের কাছে কারণ ঋগ্বেদে ইন্দ্রের স্তুতির ভেতর 'খোভন' এবং 'সুদাস' (রাজা) নামের পদ দুটি একাধিকবার দেখতে পাওয়া যায়।'

প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা হাজার হাজার স্বর্ণফলক পেরু-ইকোয়েডারে কেমন করে এলো এ হয়ত এক বিস্ময়। কিন্তু অনেক পণ্ডিতের ধারণা ব্রাহ্মী লিপির জননী খুব সম্ভবতঃ সিন্ধু লিপি। তাই যদি হয় তাহলে ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা 'পঞ্চম বেদ' কুয়েঙ্কায় পাওয়া মোটেও বিস্ময়কর নয়। আমরা যে কথা বলে আসছি সেই কথার সমর্থন জানাচ্ছে স্বর্ণফলকের পাঠোদ্ধার। প্রাচীন বৈদিক সভ্যতাই ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। তাই এইসব অদ্ভুত অদ্ভুত মিল মাঝে মধ্যে আবির্ভূত হয়ে আমাদের চমকে দিচ্ছে। কিন্তু এগুলো কিন্তু চমকে দেওয়ার মতো ব্যাপার নয়, আমাদের তত্ত্ব অনুযায়ী এগুলো খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।

রাশিচক্র কি বলে ?

প্রাচীন বৈদিক সভ্যতাই যে লেমুরিয়া থেকে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল তার অকাট্য প্রমাণ মেলে বোধহয় রাশিচক্রের নাম করণের মধ্যে।

রাশিচক্রের ভারতীয় নাম ও মিশরীয় নামের মধ্যে কি অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে :

ভারতীয়	মিশরীয়
১। মেষ	১। The ram
২। বৃষ	১। The Bull
৩। মিথুন	৩। The Twins
৪। কর্কট	৪। The Crab
৫। সিংহ	৫। The Lion
৫। কন্যা	৬। The Virgin
৭। তুলা	৭। The balance
৮। বৃশ্চিক	৮। The Scorpion
৯। ধনু	৯। The Archer
১০। মকর	১০। The Goat
১১। কুম্ভ	১১। The water bearer
১২। মীন	১২। The fishes

শুধু তাই নয়, রাশিগুলির নামের একাত্ম আছে ব্যবিলন, ইউরোপ ও ভারতের রাশি নামের সঙ্গে। চীনাদের ও বারোটা রাশি আছে তবে নামের কিছু বৈশাদৃশ্য। ভারতীয় মেষ রাশির চৈনিক নাম The Mouse, অথচ পরবর্তী বৃষ রাশির নাম কিন্তু The Ox। ভারতীয় বৃশ্চিক রাশির চৈনিক নাম আবার The Sheep। ধনুরাশির নাম The Archer। সুতরাং চৈনিক রাশি নামের সঙ্গে ভারতের রাশি নামের বেশ কিছু মিলও আছে। 'The Indian Firmament' প্রবন্ধে R. G. K. লিখেছেন, 'While the rasi names have almost the same meanings in Babylonia in Europe and in India in China they are different.' এই বৈসাদৃশ্য কিন্তু খুব প্রকট নয়। কোন কারণে নামের সামান্য হেরফের হলেও এ কথা পরিষ্কার যে চৈনিক রাশি নামগুলিও একই আদিম উৎস থেকেই উৎসারিত।

সুধাংশু পাত্র 'প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র ও ভারতীয় বিজ্ঞান' গ্রন্থে বলেছেন, 'অনেকে মনে করেন, জ্যোতির্বিদ্যায় প্রথম উন্নতি লাভ করেছিল ব্যবিলনবাসীরা। আবার কেউ কেউ বলেন, ক্রান্তিবৃত্ত এবং নক্ষত্রচক্র গণনার পরিকল্পনা ভারতের। তাঁরাই বলেন, ভারত রবিমার্গের কল্পনা করলেও রাশিচক্রের কল্পনা করেনি। ওটি মিশর ও ব্যবিলনবাসীদের দান। তাঁদের এই মত অনেক ভারতীয় পণ্ডিত গ্রহণযোগ্য মনে করেন না।'

অনেকে মনে করেন ভারতীয়রা নক্ষত্রগণনা শিখেছেন চীনাদের কাছ থেকে। কেউ কেউ বলেন চীনারাই ভারতীয়দের কাছ থেকে নক্ষত্রগণনা ধার করেছেন।

আবার কেউ বলেন চীন ও ভারত স্বতন্ত্রভাবেই নক্ষত্রগণনা শিখেছেন। রাশিচক্র নিয়েও একই বিতর্ক। রাশিচক্র নাকি ভারতের নিজস্ব জিনিস নয়। Weber ও অন্যান্য পণ্ডিতদের মত হচ্ছে ভারতীয়রা রাশিচক্রের বারোটি রাশি নাকি গুণতে শিখেছেন গ্রীকদের কাছ থেকে। কিন্তু ভারতীয় পণ্ডিত P. V. Kane এর তীব্র বিরোধিতা করে বৃহজ্জাতক থেকে দেখিয়েছেন যে সেখানে রাশির উল্লেখ ও তাদের চেহারার বর্ণনা রয়েছে।

সারা পৃথিবী জুড়ে রাশিচক্রের নাম ও চেহারার বর্ণনার মিল হওয়ার কারণ একটিই। জ্যোতিসএর জ্ঞান ছড়িয়ে পড়েছিল একই আদিম উৎস থেকে। দেবতা ও দেবজনেরা নিজেদের গ্রহ থেকে পৃথিবীর লেমুরিয়াতে উপনিবেশ স্থাপন করার পর নতুন করে জ্যোতিবিজ্ঞান চর্চা শুরু করেন। এ সময় পৃথিবীর আকাশের দেখা গ্রহ নক্ষত্রই হয় এই চর্চার বিষয় বস্তু। তারপর লেমুরিয়া ছেড়ে যখন দেবতা ও দেবজনেরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়লেন তখন তাঁরা সেই জ্যোতির্বিজ্ঞান সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। দেশ ও কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামান্য কিছু পরিবর্তন ঘটলেও মূল বিষয়বস্তুগুলি রইল অপরিবর্তিত। অতীতের আসল সত্যকে হারিয়ে ফেলে আমরা তর্ক জুড়ি রাশিচক্র কে আগে আবিষ্কার করেছিল--ভারত, মিশর, ব্যবিলন না চীন? আসলে এগুলো যে এক আদিম উৎস থেকে সৃষ্টি হয়েছিল একথা আমাদের জানা নেই বলেই এত বিভ্রান্তি।

অ্যানড্রু টমাস তাঁর 'আমরাই কি প্রথম?' গ্রন্থে সারা পৃথিবীর জ্যোতির্বিজ্ঞানের বহু বিষয়ের মধ্যে যে সব মিল আছে তা নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। আমরা সংক্ষিপ্তাকারে এখানে একটু তুলে দিচ্ছি।

'এটা কি খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, আজ আমরা বৃশ্চিক রাশিকে যে নামে চিহ্নিত করেছি প্রাচীন মায়াজাতিও ঠিক সেই নামেই ঐ রাশির নামকরণ করেছিলো? ব্যবিলন, মিশর আর গ্রীসে কালপুরুষ বা শিকারী বলে যে রাশির নামকরণ করা হয়েছিলো, চীনেও ঠিক সেই নামেই পরিচিত ছিলো ঐ রাশি। চীনে নাম দেওয়া হয়েছিলো 'শরৎকালের শিকারী'। আমাদের কুম্ভরাশি হলো মেক্সিকোর দেবতা লোলক বা 'বৃষ্টির দেবতা'। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়—নক্ষত্রগুলোকে যে সমস্ত বিভিন্ন রাশিতে ভাগ করা হয়েছে তাতে কল্পনার সাহায্য অনেকখানি নিতে হয়েছে। অবস্থা দেখে মনে হয় প্রাচীন জাতিরা যেন প্রাচীনতর কোন তালিকা থেকে নক্ষত্র-রাশির নামগুলো পেয়েছিলো, অসংখ্য নক্ষত্রের পরিচয় জানবার জন্য। চীনাদের মেষরাশির সংকেতের সঙ্গে ব্যবিলনীয়দের মেষরাশির পুরোপুরি মিল আছে। চীনাদের বলদের সংকেতের প্রতিফলন দেখা যায় পশ্চিমের দেশের বৃষরাশিতে। চীনা জ্যোতির্বিদ্যার অশ্ব এবং ব্যবিলন আর মিশরের ধনুরাশি একই। যদিও রাশিচক্রের

নামগুলো প্রায় একরকমের কিন্তু কখনও কখনও নামের সঙ্গে রাশির মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। মধ্য আমেরিকা এবং চীনে নক্ষত্রমণ্ডলীর নামের মিল আরও লক্ষণীয়। আজটেক দিনপঞ্জীতে দিনগুলোর নামকরণ করা হয়েছিলো কুমীর, সাপ, খরগোস, কুকুর এবং বাঁদরের নাম অনুযায়ী। চীনা তিব্বতী দিনপঞ্জীতে বছরের নামকরণ করা হয়েছে ড্রাগন, সাপ, খরগোস, কুকুর ও বাঁদরের নাম অনুসারে। এই আশ্চর্যজনক মিল পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এ ব্যাপারে বিখ্যাত বিজ্ঞানী জর্জিও দা সেৎলানার মত না মেনে উপায় নেই। তিনি নক্ষত্রমণ্ডলীর নামকরণ সম্বন্ধে তাঁর The Origins of Scientific Thought বইয়ে লিখেছেন: মেক্সিকো থেকে আফ্রিকা এবং পলিনেশিয়া পর্যন্ত নক্ষত্রমণ্ডলীর একই নাম প্রশ্নাতীতভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় এবং আজও আমরা সেই একই নাম ব্যবহার করে আসছি।'

এর পর আর আমাদের কিছুই বলার নেই, বুদ্ধিমান পাঠক নিশ্চয় আমাদের যুক্তিকে প্রাপ্য মর্যাদা দেবেন এই আশা রাখি।

উপসংহার

আমার বর্তমান গ্রন্থের মূল আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ভিনগ্রহবাসী প্রাচীন ভারতীয় দেব-গন্ধর্বদের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করা ও সেই দেবগন্ধর্বদের সঙ্গে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা বিস্ময়কর সভ্যতাগুলির আদিপুরুষদের সঙ্গে কি সম্পর্ক তা খুঁজে বের করা।

আমার প্রথম গ্রন্থ ও বর্তমান গ্রন্থের আলোচনা থেকে নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

(এক) দেবতারা ঈশ্বর নন। তাঁরা আমাদের মতই রক্তমাংসের মানুষ, তবে আমাদের থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-দর্শন, শিল্প-সাহিত্য সব ব্যাপারেই যথেষ্ট উন্নত ছিলেন।

(দুই) এই দেবতাদের আদি বাসভূমি ছিল আমাদের সৌরলোকের বাইরে অন্য কোন সৌরলোকের একটি গ্রহে।

(তিন) এঁরা আট হাজার থেকে দশ হাজার বছর আগে পৃথিবীতে নেমে আসেন বসবাস করবার জন্য। তারও বহুকাল আগে থেকে তাঁরা আমাদের পৃথিবী আবিষ্কার করেছিলেন ও মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর করার জন্য এখানে আসতেন।

(চার) নিজেদের গ্রহে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে দেবরাজ্য অধিকার করেন। দেবতারা তখন স্বর্গ ছেড়ে পৃথিবীতে নেমে আসেন।

(পাঁচ) পৃথিবীর আদি দেব উপনিবেশ হচ্ছে লঙ্কা বা নাওলাহাম বা লেমুরিয়া। লেমুরিয়া কোন কাল্পনিক ভূখণ্ড নয়।

(ছয়) স্বায়ম্ভুব মনু পৃথিবীর প্রথম রাজা। তবে স্বাধীন রাজা নন। স্বর্গের দেব-রাজ ইন্দ্রের প্রতিভূ হিসেবে তিনি পৃথিবীতে রাজত্ব শুরু করেন। এই স্বায়ম্ভুব মনুই দেবতাদের জ্ঞানভাণ্ডার সাংকেতিক ভাষায় সংকলিত করে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। তাই তিনিই হন প্রথম বেদব্যাস।

(সাত) জ্যোতিষীয় গণনার সুবিধার্থে দেবতারা পৃথিবীর আকাশে একটি আপাত নিশ্চল নক্ষত্র আবিষ্কার করে তার নাম দিলেন ধ্রুব নক্ষত্র।

(আট) সাত হাজার বছর আগে রাজা বেণ স্বর্গের ইন্দ্রের অধীনতা অস্বীকার করে নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করলেন ও সঙ্গে সঙ্গে নিহত হলেন।

(নয়) এরপর পৃথিবীর প্রথম রাজচক্রবর্তী সম্রাট হলেন পৃথু। পৃথুর নাম থেকে আমাদের গ্রহের নাম হল পৃথিবী। এই সময় থেকে নতুন করে পৃথিবীতে দেব-সভ্যতার ইতিহাস লেখার কাজ শুরু হল। দেব-সভ্যতা চরম উন্নতি লাভ করল। নগর, রাস্তাঘাট তৈরী হল, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি হল।

(দশ) দেবতাদের উপনিবেশে এরপর শুরু হল প্রজাক্ষয়। রাজত্ব চালাতে হলে প্রজার প্রয়োজন। এবার দেবতারা পার্থিব মানুষদের দিকে নজর দিলেন এবং তাদের উন্নত করে তোলার চেষ্টা করলেন। মৈথুনের সাহায্যে জন্ম নিল একটি সংকর জাতি। সে প্রায় ছ'হাজার বছর আগেকার ঘটনা। এ কাজে যিনি সফল হলেন তাঁর নাম দক্ষ।

(এগার) এরপর দেব-উপনিবেশ লেমুরিয়া ডুবতে শুরু করায় দেবতারা লেমুরিয়া ছেড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়লেন। আমাদের পুরাণ মতে বৈবস্বত মনুর কালে, অর্থাৎ ছ'হাজার বছর আগে।

(বারো) সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা বিস্ময়কর সভ্যতাগুলি বিশ্লেষণ করলেই এই মাইগ্রেশানের কথা মেনে নিতে আমরা বাধ্য হই। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সৃষ্টিতত্ত্ব, জল-প্লাবন কাহিনী, ভাষা, অতীন্দ্রিয়-ধ্যান ধারণা, জ্যোতিষীয়-জ্ঞান, উড়ন্ত-দেবতাদের কাহিনীর মধ্যে এত অদ্ভুত মিল যে এইসব জাতি ও সভ্যতা যে একই উৎস থেকে জন্মলাভ করেছিল তাতে আমাদের কোন সন্দেহই থাকে না।

এতগুলি ঘটনা সবই কি কাকতালীয় হতে পারে? এসবই যে এক গভীর সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। ভারতীয় দেবতাদের ইতিহাসই মানুষের ইতিহাস।

সে ইতিহাস স্বীকার করে নিলে আমরা আর এক নতুন মানব-সভ্যতা শুরু করার গৌরব অর্জন করব। আজ সারা পৃথিবীর ভাষা, ধর্ম্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য—স্বভাবতই মানুষে মানুষে চরম ভেদাভেদ। কিন্তু একবার সংস্কারমুক্ত হয়ে আমরা যদি ভাবতে পারি যে আমরা সবাই ভিনগ্রহবাসী দেবতা ও দেবজনদের বংশধর,—যদি ভাবতে পারি যে একই সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা বয়ে চলেছে আমাদের সবার মধ্যে তাহলে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা সৃষ্টি করতে পারব দারিদ্রহীন, শোষণহীন ও আতঙ্কহীন এক সুখী বিশ্ব পরিবার। সারা পৃথিবীর মানুষ নিজেদের পরিচয় দেবে মনুপুত্র বলে—দেবতা তথা মানুষের লুপ্ত ইতিহাস খোঁজার পরিশ্রম তখনই সার্থক হয়ে উঠবে।

পরিশিষ্ট—১

স্বায়ম্ভুব মনুবংশ

রাজ সংখ্যা ও পর্যায় সংখ্যা	কাল খ্রীঃ পূঃ	প্রিয়ব্রত বংশ	উত্তানপাদ বংশ
১	৫৯৫৮	স্বায়ম্ভুব	
১	৫৯৩৪	প্রিয়ব্রত	
৩	৫৯১০	অগ্নীধ্র	
৪	৫৮৮৬	নাভি	
৫	৫৮৬২	ঋষভ	
৬	৫৮৩৭	ভরত	
৭	৫৮১৩	সুমতি	
৮	৫৭৮৯	তৈজস	
৯	৫৭৬৫	ইন্দ্রদ্যুম্ন	
১০	৫৭৪১	পরমেষ্ঠী	
১১	৫৭১৬	প্রতিহার	
১২	৫৬৯২	প্রতিহর্ত্তা	
১৩	৫৬৬৮	উন্নেতা	
১৪	৫৬৪৪	ভুব	
১৫	৫৬২০	উদ্গীথ	
১৬	৫৫৯৫	প্রস্তাব	
১৭	৫৫৭২	বিভু	
১৮	৫৫৪৮	পৃথু	
১৯	৫৫২৪	নক্ত	
২০	৫৫০০	গয়	
২১	৫৪৭৫	নর	
২২	৫৪৫১	বিরাট	
২৩	৫৪২৭	মহাবীর্য্য	
২৪	৫৪০৩	ধীমান	
২৫	৫৩৭৯	মহান্ত	

রাজ সংখ্যা ও পর্যায় সংখ্যা	কাল খ্রীঃ পূঃ	প্রিয়ব্রত বংশ	উত্তানপাদ বংশ
২৬	৫৩৫৪	মনস্যু	
২৭	৫৩৩০	ত্বষ্টা	
২৮	৫৩০৬	তুষ্টু	
২৯	৫২৮২	বিরজ	
৩০	৫২৫৮	রজ	
৩১	৫২৩৩	শতজিৎ	
৩২	৫২০৯	বিশ্বগজ্যোতি	
৩৩	৫১৮৫		উত্তানপাদ
৩৪	৫১৬১		ধ্রুব
৩৫	৫১৩৭		শিষ্টি
৩৬	৫১১২		প্রাচীনগর্ভ
৩৭	৫০৮৮		উদারধী
৩৮	৫০৬৪		দিব্যঞ্জয়
৩৯	৫০৪০		রিপু
৪০	৫০১৬		চক্ষু
৪১	৪৯৯১		চাক্ষুষ মনু
৪২	৪৯৬৭		উরু
৪৩	৪৯৪৩		অঙ্গ
৪৪	৪৯১৯		বেণ
৪৫	৪৮৯৫		পৃথু
৪৬	৪৮৭০		অন্তর্ধান
৪৭	৪৮৪৬		হবির্ধান
৪৮	৪৮২১		প্রাচীনবর্হি
৪৯	৪৭৯৬		প্রচেতাগণ
৫০/৮৪	৩৮৮৯		দক্ষ
৫১/৮৫	৩৮৬৪		অদিতি
৫২/৮৬	৩৮৩৯		বিবস্বান
৫৩/৮৭	৩৮১৪		বৈবস্বত মনু

পরিশিষ্ট—২

ইক্ষ্বাকুবংশ পরিচয়

কাল খ্রীঃ পূঃ	বিষ্ণুপুরাণ মতে	কাল খ্রীঃ পূঃ	বিষ্ণুপুরাণ মতে
৩৮১৪	বৈবস্বত	৩২০৭	সুমনা
৩৭৯৫	ইক্ষ্বাকু	৩১৭১	ত্রিধন্বা
৩৭৭৭	বিকুক্ষি	৩১৩৫	ত্রয্যারুণ
৩৭৫৮	পরঞ্জয়	৩১০০	সত্যব্রত
৩৭৩৯	অনেনা	৩০৬৪	হরিশচন্দ্র
৩৭২১	পৃথু	৩০২৮	রোহিতাশ্ব
৩৭০২	বিশ্বগশ্ব	২৯৯২	হরিত
৩৬৮৩	আর্দ্র	২৯৫৮	চঞ্চু
৩৬৬৪	যুবনাশ্ব	২৯৩৩	বিজয়
৩৬৪৬	শ্রাবস্ত	২৯০৯	রুরুক
৩৬২৭	বৃহদশ্ব	২৮৮৫	বৃক
৩৬০৮	কুবলয়াশ্ব	২৮৬১	বাহু
৩৫৯০	দৃঢ়াশ্ব	২৮৩৮	সগর
৩৫৭১	বার্য্যশ্ব	২৮১৪	অসমঞ্জস
৩৫৫২	নিকুম্ভ	২৭৯০	অংশুমান
৩৫৩৩	সংহতাশ্ব	২৭৬৬	দিলীপ
৩৫১৫	কৃপাশ্ব	২৭৪২	ভগীরথ
৩৪৯৬	প্রসেনজিৎ	২৭১৯	শ্রুত
৩৪৭৭	যুবনাশ্ব	২৬৯৫	নাভাগ
৩৪৫৮	মান্ধাতা	২৬৭১	অম্বরীষ
৩৪২২	পুরুকুৎস	২৬৪৭	সিন্ধুদ্বীপ
৩৩৮৬	এসদস্যু	২৬২৩	অযুতাশ্ব
৩৩৫০	সম্ভূত	২৬০০	ঋতুপর্ণ
৩৩১৪	অণরণ্য	২৫৭৬	সর্ব্বকাম
৩২৭৯	পৃষদশ্ব	২৫৫২	সুদাস
৩২৪৩	হর্য্যশ্ব	২৫২৮	মিত্রসহ

কাল খ্রীঃ পূঃ	বিষ্ণুপুরাণ মতে	কাল খ্রীঃ পূঃ	বিষ্ণুপুরাণ মতে
২৫০৪	অশ্মক	১৭২৩	বিশ্বসহ
২৪৮১	০	১৬৯৯	হিরণ্যনাভ
২৪৫৮	মূলক	১৬৭৬	পুষ্য
২৪২৫	দশরথ	১৬৫২	ধ্রুবসন্ধি
২৩৯১	ইলিবিলি	১৬২৮	সুদর্শন
২৩৫৮	০	১৬০৫	অগ্নিবর্ণ
২৩২৫	বিশ্বসহ	১৫৮১	শীঘ্র
২২৯২	দিলীপ	১৫৫৮	মরু
২২৫৮	দীর্ঘবাহু	১৫৩৪	প্রসুশ্রুত
২২২৫	রঘু	১৫১০	সুগন্ধি
২১৯২	অজ	১৪৮৭	অমর্ষ
২১৫৮	দশরথ	১৪৬৩	মহস্বান
২১২৪	রাম	১৪৪০	বিশ্রুতবান
২১০০	কুশ	১৪১৬	বৃহদ্বল
২০৭৭	অতিথি	১৪১৬	বৃহৎক্ষণ
২০৫৩	নিষধ	১৩৮৬	গুরুক্ষেপ
২০৩০	নল	১৩৫৬	বৎস
২০০৬	নভ	১৩৩০	বৎসব্যূহ
১৯৮২	পুণ্ডরীক	১৩০৪	প্রতিব্যোম
১৯৫৯	ক্ষেমধন্বা	১২৭৭	দিবাকর
১৯৩৫	দেবানীক	১২৫১	সহদেব
১৯১২	অহীনগু	১২২৫	বৃহদশ্ব
	রূপ	১১৯৮	ভানুরথ
	রুরু	১১৭২	সুপ্রতীক
১৮৮৮	পারিপাত্র	১১৪৬	মরুদেব
১৮৬৪	দল	১১১৯	সুনক্ষত্র
১৮৪১	ছল	১০৯৩	কিন্নর
১৮১৭	উকথ	১০৬৭	অন্তরিক্ষ
১৭৯৪	বজ্রনাভ	১০৪১	সুবর্ণ
১৭৭০	শঙ্খনাভ	১০১৩	অমিত্রজিৎ
১৭৪৬	ব্যুত্থিতাশ্ব	৯৮৬	বৃহদ্রাজ

গ্রন্থপঞ্জী

Alexandar Kondratov— The Riddles of the Three Oceans.

A. L. Basham — The wonder that was India.

Bharatya Vidya Bhaban — The History and Culture of the Indian People the Vedic Age.

George Gamow — A Planet called Earth.

" " — The Creation of the Universe.

George Michanowksy — The Once and Future Star.

Maharshi Bharadwaaja — Vymanik Shaastra.

Nilkanta Sastri — A History of South India.

Richard E. Mooney — Gods of Air & Darkness.

Roy Stemman — Atlantis and other Lost lands.

R. G. K. — The Indian Firmament

V. Komarov — This Fascinating Astronomy.

শ্রীঅরবিন্দ —বেদ রহস্য।

অশোক চট্টোপাধ্যায় (ডক্টর) —পুরাণ পরিচয়।

অরূপরতন ভট্টাচার্য —প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান।

অজিত দত্ত —মানুষের ঠিকানা।

অতুল সুর —ইতিহাস ও মহাকাব্যের সীমানায়। (আনন্দবাজার পত্রিকা বার্ষিক সংখ্যা ১৩৮৬)।

অ্যানড্রু টমাস —আমরাই কি প্রথম ? (অনুবাদ : বিশু দাস)।

এরিখ ফন দানিকেন—দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ। (অনুবাদ : অজিত দত্ত)।

" " " —নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন। " " "।

" " " —বীজ ও মহাবিশ্ব। " " "।

" " " —আমার পৃথিবী। " " "।

" " " —আবির্ভাব। " " "।

" " " —প্রমাণ। " " "।

" " " —প্রাগিতিহাসের ঋষি। " " "।

ঋগ্বেদ সংহিতা (১ম ও ২য় খণ্ড)।

শ্রী কৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামী—প্রাগৈতিহাসিক মোহেঞ্জোদড়ো।

কিরণ চন্দ্র চৌধুরী (ডঃ)—ভারতের ইতিহাস কথা (১ম খণ্ড)।

শ্রীগিরীন্দ্র শেখর বসু—পুরাণ প্রবেশ।

গোপাল হালদার—ভারতের ভাষা।

নারায়ণ চন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ ভট্টাচার্য—হোরাবিজ্ঞান রহস্যম।

নিরঞ্জন সিংহ—রামায়ণ মহাভারতের দেব-গন্ধর্বরা কি ভিনগ্রহবাসী ?

পঞ্চানন তর্করত্ন (অনূদিত)—রামায়ণ।

" " " —বিষ্ণুপুরাণ।

পরিতোষ পাল—ভারতের প্রাচীন মানমন্দির।

(প্রবন্ধ ঃ কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান)

পরমেশ চৌধুরী—মানুষের পূর্বপুরুষ অন্য গ্রহের মানুষ।

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়—বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্ম্ম।

শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় (রাজবৈদ্য ডক্টর)—হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। (১ম ভাগ)।

বর্দ্ধমান রাজসভার পণ্ডিতমণ্ডলী (অনূদিত)—মহাভারত।

বেলাবাসিনী গুহ, অহনা গুহ—ঋগ্বেদ ও নক্ষত্র।

বীরেন্দ্র মিত্র—কুরুক্ষেত্রে দেবশিবির।

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য্য—বেদাঙ্গ পরিচয়।

রাণী চন্দ—হিমাদ্রি।

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র—স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা।

শ্রীরাজমোহন নাথ—মহেঞ্জদড়োর লিপি ও সভ্যতা।

শঙ্কর হাজরা—হরপ্পীয়দের সন্ধানে।

শচীন্দ্র কুমার কর—রুশীয় যোগিনী ম্যাডাম ব্লাভাটাস্ক।

সমরেশ বসু—শাম্ব।

স্বামী অমলানন্দ সরস্বতী—পরলোক প্রসঙ্গ।

সুধাংশু পাত্র—প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র ও ভারতীয় বিজ্ঞান।